চাই প্রিয় ব্যক্তিত্ব
চাই প্রিয় নেতৃত্ব

আবদুস শহীদ নাসিম

চাই প্রিয় ব্যক্তিত্ব
চাই প্রিয় নেতৃত্ব

আবদুস শহীদ নাসিম

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রকাশনী
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০২-৭১৭৫১৮৪

আঃ প্রঃ ২৭২

প্রথম প্রকাশ ঃ অক্টোবর ২০০০ইং
৬ষ্ঠ প্রকাশ

মহররম	১৪৩৭
আশ্বিন	১৪২২
অক্টোবর	২০১৫

বিনিময় ঃ ১৪০.০০ টাকা

মুদ্রণে
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট পরিচালিত
আধুনিক প্রেস
২৫ শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

CHAI PREO BEKTITTO CHAI PREO NETRITTO by Abdus Shaheed Naseem. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Price : Taka 140.00 Only.

এ গ্রন্থ সম্পর্কে ক'টি কথা

সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের মালিক, পরিচালক ও প্রতিপালক মহান আল্লাহর জন্যে। আমি তাঁরই শুকরিয়া আদায় করছি। সালাত ও সালাম পেশ করছি মানবতার মুক্তিদূত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা)-এর প্রতি।

মহান আল্লাহ মানুষকে এ পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন। যথাযথভাবে আল্লাহর দাসত্ব করা ও তাঁর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করার মধ্যেই রয়েছে মানব জীবনের প্রকৃত সাফল্য ও সার্থকতা।

এ দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদনের জন্যে অর্জন করা চাই আদর্শের যথার্থ জ্ঞান, আদর্শ প্রয়োগ ও বাস্তবায়নের উপযুক্ত কৌশল আর আদর্শ ভিত্তিক জননন্দিত পরম সুন্দর চরিত্র। এজন্যে নিজেকে গড়ে তোলা চাই বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব আর সম্মোহনী নেতৃত্ব হিসেবে। ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের সাফল্য অর্জনের মাধ্যমেই অনিবার্য হয়ে ওঠে আদর্শের বিজয়। আল্লাহ পাক কখনো অযোগ্য লোকদের হাতে তাঁর পৃথিবী পরিচালনার দায়িত্ব অর্পণ করেন না।

আমি এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছি, স্নেহভাজন আবদুস শহীদ নাসিম তার এ গ্রন্থে প্রিয় ব্যক্তিত্ব ও প্রিয় নেতৃত্ব হিসেবে আত্মগঠনের কার্যকর কৌশল পেশ করেছেন। কুরআন, হাদীস, সীরাতে রসূল এবং আধুনিক কালের কর্মকৌশলের সমন্বয়ে তিনি এ গ্রন্থে ইসলামী সমাজ বিপ্লবের জন্যে কাংখিত মানের ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্ব সৃষ্টির সুন্দরতম সরঞ্জাম সমূহের সমাহার ঘটিয়েছেন। বিশ্বমানবতার মুক্তিদূত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুপম ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের নমুনাকে উপমা হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। তাই এ বই স্রষ্টার পথে শ্রেষ্ঠ জীবন গড়ার প্রেরণায় পাঠককে এগিয়ে নেবে মানবীয় গুণাবলীর শীর্ষমানে। এ বই বাংলা ভাষার ইসলামী সাহিত্যে একটি অপূর্ব সংযোজন।

পৃথিবী আজ বিধ্বস্ত হয়ে আছে অন্যায়, অশান্তি, হানাহানি, দ্বন্দ্ব সংঘাত, যুদ্ধ-বিগ্রহ, ভেদাভেদ, বিবাদ-বিসম্বাদ, যুলুম, শোষণ, নির্যাতন, নিপীড়নে। এ অবস্থার অবসানের জন্যে প্রয়োজন ইসলামী সমাজ বিপ্লব। আর সেই অনিবার্য বিপ্লবের জন্যে চাই সুদক্ষ ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বের অধিকারী যুব সমাজ। আবদুস শহীদ নাসিমের এ বই সেই কাংখিত যুব সমাজ তৈরিতে সুনিপুণ কারিগরের ভূমিকা পালন করবে।

ইসলামের সুমহান আদর্শের ভিত্তিতে যারা শান্তি ও সুখের সমাজ গড়ার কর্মী, এ বই তাদের অবশ্য পাঠ্য। এ বই তাদেরকে সেরা ব্যক্তিত্ব ও সেরা নেতৃত্বের যোগ্য করে গড়ে তোলার অনবদ্য উপাত্ত যোগাবে।

আল্লাহ পাক ইসলামী সমাজ গড়ার উপযোগী লোক তৈরির কাজে কাংখিত উপাত্ত হিসেবে এ গ্রন্থটি কবুল করুন এবং লেখককে দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ দান করুন। আমীন।

মুহাম্মদ শামছুর রহমান
চেয়ারম্যান
বাংলাদেশ ইসলামিক ইনস্টিটিউট

কেন পড়বেন এই বই ?

আপনি যদি বই পড়ুয়া হন, তবে এ বইটিও আপনার পাঠের অন্তরভুক্ত করুন ! কম পড়ুয়া হলে কম করে হলেও এটি পড়ুন। বই পড়ায় অভ্যস্ত না হলে এটি দিয়ে আরম্ভ করুন !

অনেক বই আছে শুধু আনন্দ দেয়। অনেক বই আছে কেবল জ্ঞান দান করে। অনেক বই আছে তত্ত্ব ও তথ্যের। অনেক বই আছে সমাজ ও সাহিত্যের। অনেক বই পড়লে হয় উন্নতি। অনেক বই পড়লে আসে দুর্গতি। অনেক বই করে সচেতন, আবার অনেক বই ডেকে আনে অধোপতন।

কিন্তু এটি ? কোন্ ধরনের বই এটি ?

আপনি প্রথমেই বইটির সূচিপত্র পড়ে নিন। দেখুন তো, এর সূচিপত্রে সাজানো শিরোনাম বা উপশিরোনাম কি আপনাকে আকর্ষণ করে ? আমাদের বিশ্বাস, শিরোনাম উপশিরোনামের মতো বইয়ের বক্তব্যও আপনার ভালো লাগবে।

আপনি আমাদের সাথে আশা করি একমত হবেন ঃ
এটি জ্ঞানের বই, গুণের বই।
কর্মের বই, কর্তব্যের বই।
এটি আত্মার বই, আত্মচেতনার বই।
এটি দক্ষতা বৃদ্ধি ও আত্মোন্নয়নের বই।
এটি উপলব্ধির বই, এটি উন্নতির বই।
এটি নিজেকে বড় করার ও এগিয়ে নেবার বই।
এটি জীবনকে গড়ার বই। এটি জগতকে জয় করার বই।
এটি স্রষ্টার সান্নিধ্য আর জান্নাতের আতিথ্য লাভের বই।
এটি জেতার বই, এটি উপরে উঠার বই।

এজন্যেই আপনি পড়বেন এ বই। মনে রাখবেন ঃ
এ বই আপনার।
এ বই আপনার স্বামীর।
এ বই আপনার স্ত্রীর।
এ বই আপনার পুত্রের।

এ বই আপনার কন্যার।
এ বই আপনার বন্ধুর।
এ বই আপনার ভাইয়ের।
এ বই আপনার নেতার।
এ বই আপনার সহকর্মীর।
এ বই আপনার কর্তার।
এ বই আপনার কর্মীর।

এ বই আপনার কাছ থেকে নেবে কিছু সময়। কিন্তু বাঁচাবে অনেক সময়। এ বইয়ের দাবি সহজ, দেবে প্রচুর। এ বই আপনি পড়ুন। আপনি উপরে উঠুন। আপনি সবার প্রিয়জন হোন। আপনি সবার প্রিয় নেতা হোন। আপনি সবার প্রিয় কর্মী হোন। আপনি হোন সবার আপনজন। আপনি সুখি হোন। আপনি ভালো থাকুন।

আবদুস শহীদ নাসিম
৭ সেপ্টেম্বর ১৯৯৯ইং

উৎস মূলের নির্দেশিকা

●

তোমাদের যারা ঈমান এনেছে আর যাদের দান করা হয়েছে জ্ঞান, আল্লাহ তাদের দান করবেন সুউচ্চ মর্যাদা।–(আল কুরআন ৫৮ ঃ ১১)

●

আল্লাহ অসীম জ্ঞানী। তিনি যাকে চান জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দান করেন। আর যাকে দান করা হয় জ্ঞান-প্রজ্ঞা-কর্মকৌশল, সে তো হয়ে থাকে বিরাট কল্যাণের অধিকারী।–(আল কুরআন ২ ঃ ২৬৮-২৬৯)

●

সমস্ত জ্ঞানের উৎস আল্লাহ তা'আলা।–(আল কুরআন ৪৬ ঃ ২৩)

●

বলো ঃ হে প্রভু ! আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দাও।–(আল কুরআন ২০ ঃ ১১৪)

●

আল্লাহকে ভয় করে তাঁর জ্ঞানী দাসেরা।–(আল কুরআন ৩৫ ঃ ২৮)

●

একইভাবে আমি তোমাদের থেকেই তোমাদের মাঝে একজন রসূল পাঠিয়েছি, তিনি তোমাদের পড়ে শুনান আমার আয়াত, তোমাদের পরিশুদ্ধ করেন, তোমাদের শিক্ষা দেন এই মহাগ্রন্থ এবং তোমাদের প্রশিক্ষণ দেন জ্ঞান, প্রজ্ঞা, কর্মকৌশল আর সেইসব জিনিস যা তোমরা জানো না।–(আল কুরআন ২ ঃ ১৫১)

●

দু'টি জিনিসের অধিকারী ছাড়া অন্য কেউ ঈর্ষার পাত্র নয়। তাদের একজন হলো ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ তা'আলা প্রচুর অর্থ-সম্পদ দান করেছেন, অথচ সে তা সত্য পথে বিলিয়ে দেয়। অপরজন হলো ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ পাক 'হিকমাহ' (অর্থাৎ জ্ঞান, প্রজ্ঞা ও কর্মকৌশল) দান করেছেন এবং সে তার ভিত্তিতেই সব ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয় আর মানুষকেও তা শিক্ষা দেয়।-(সূত্র ঃ সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম)

●

যার দুইদিন একই রকম গেলো (আগের দিনের চাইতে পরের দিন কিছুটা উন্নত হলো না), সে ক্ষতিগ্রস্ত হলো।-(সূত্র ঃ সুনানে দায়লমী)

●

মানুষের অবস্থা হচ্ছে উটের মতো। শত উটের মধ্যেও একটি যুৎসই বাহন খুঁজে পাওয়া দুষ্কর।-(সূত্র ঃ সহীহ মুসলিম)

সূচিপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিষয় | পৃষ্ঠা

বিষয়	পৃষ্ঠা

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

চাই প্রিয় ব্যক্তিত্ব চাই প্রিয় নেতৃত্ব

যারা শুধু নিজেকে নিয়ে ভাবেন, আত্ম চিন্তায় বিভোর থাকেন, আপনি কি তাদেরই একজন ? তবে হাত গুটিয়ে বসে থাকুন। নিজের চরকায় নিজে তেল দিন। তেল দিতে দিতে কবরে পা দিন। আপনার নিঃসঙ্গ কবর যাত্রা আর বন্ধুহীন হাশর নিয়ে আমাদের এ রচনায় কোনো কথা নেই।

কিন্তু আপনি যদি নিজের মতোই অন্যদের নিয়েও ভাবেন, যদি নিজের ভালোর মতো অন্যদের ভালোও চান, যদি নিজের উন্নতি, কল্যাণ ও সাফল্যের মতো অন্যদের উন্নতি কল্যাণ এবং সাফল্যও আপনি চান, তবে আপনার জন্যে আমাদের কিছু পরামর্শ আছে। আপনি যদি মানব দরদী হয়ে থাকেন, মানুষের ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণ চিন্তায় যদি আপনি ব্যাকুল হয়ে থাকেন এবং সে উদ্দেশ্যে যদি আপনি কল্যাণমুখী আদর্শ সমাজ গড়ার উদ্যোগী হয়ে থাকেন, আপনি যদি মানুষের সেবা করতে চান, তবে আপনার ব্যাপারে কিছু কথা আছে আমাদের। কথা খুব ছোট্ট। তাহলো আপনার উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে আপনি মানুষের প্রিয় ব্যক্তিত্ব হোন, প্রিয় নেতৃত্ব হোন। কিন্তু কিভাবে হবেন ?

১. চাই অদম্য সাহস আর দুর্নিবার ইচ্ছাশক্তি

পয়লা কথা হলো, এ উদ্দেশ্যে সামনে অগ্রসর হয়ে যাবার জন্যে আপনার মধ্যে থাকা চাই অসীম সাহস আর দুর্নিবার ইচ্ছাশক্তি (will force)। কিভাবে নিজেকে এ সাহস ও ইচ্ছাশক্তিতে উজ্জীবিত করবেন ? এ ব্যাপারে বিশেষজ্ঞরা চারটি টেকনিক অবলম্বনের পরামর্শ দিয়েছেন। সেগুলো হলো ঃ

১. নিজের মনকে এমনভাবে তৈরি করুন এবং নিজের জন্যে এমন সব সুযোগ সৃষ্টি করুন যার ফলে আপনার জ্ঞান ও বিবেক-বুদ্ধি বিকশিত হয়, আপনি কিছু শিখতে পারেন, আপনার ভুল ধ্যান-ধারণা শুধরাতে পারেন এবং মন-মস্তিষ্ককে আকাশের মতো প্রসারিত করতে পারেন।

২. নিজের আদর্শ ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে আপনার নিজের মধ্যে থাকতে হবে সুদৃঢ় অংগীকার। এ অংগীকার প্রতিনিয়ত প্রকাশ করে যান বক্তব্য কিংবা লেখনীর মাধ্যমে। এর ফলে আপনার নিজের মধ্যে এবং সাথে সাথে

আপনার সহকর্মীদের মাঝে সৃষ্টি হবে প্রবল উদ্দীপনা, উদ্যম ও এগিয়ে যাবার বাসনা।

৩. মনের মধ্যে কোনো দুর্বল ও নেগেটিভ ধারণা-কল্পনা এবং চিন্তা-ভাবনা উদয় হলে সাথে সাথে সেটাকে প্রবল বিশ্বাস ও প্রত্যয়ের পরাক্রম আঘাতে প্রতিহত ও ধরাশায়ী করে দিন। নিজের ব্যাপারে, নিজেদের অবস্থা ও অবস্থানের ব্যাপারে এবং নিজ সাথিদের ব্যাপারে কোনো দুর্বল ও নেগেটিভ চিন্তা মনের মধ্যে দেখা দেয়ার সাথে সাথে পজেটিভ চিন্তার প্রচণ্ড আঘাতে সেগুলোকে কুপোকাত করে দিন। মনে রাখবেন, কোনো নেগেটিভ চিন্তা, দুর্বল সংকল্প এবং অপর কারো অবস্থা যেনো আপনার চলার গতিকে স্তব্ধ বা দুর্বল করে না দেয়।

৪. নিজের সামগ্রিক কর্মতৎপরতার প্রগ্রেস রিপোর্ট তৈরি করুন। এ প্রক্রিয়ায় নিয়মিত নিজের অগ্রগতি মূল্যায়ন (evalute) করতে থাকুন। এভাবে নিজেকে উন্নতির অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রার পথে এগিয়ে দিন।

দলীয় ও প্রাতিষ্ঠানিক পরিমণ্ডলে এমন পরিবেশ তৈরি করুন এবং এমন ধরনের প্রোগ্রাম নিন যাতে করে নিজেদের মধ্যে নেতৃত্বের কাঙ্ক্ষিত যোগ্যতা ও গুণাবলী বিষয়ে কথাবার্তা হতে পারে।

দক্ষতা উন্নয়ন মূলক প্রশিক্ষণ প্রোগ্রাম চালু করুন। উদ্দেশ্যহীন, নির্জীব এবং ধরা বাঁধা প্রোগ্রাম ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতি পরিবর্তন করুন। গতিশীল হোন।

২. চাই সম্মোহনী ব্যক্তিত্ব

যে অবস্থাতেই আপনি থাকুন না কেন, ইসলামের আহ্বায়ক, সংস্কারক ও জনগণের সেবক হিসেবে আপনি একজন দায়িত্বশীল, একজন নেতা বা নেত্রী।

মনে রাখবেন, নেতৃত্বের পয়লা উপাদান হলো ব্যক্তিত্ব। ব্যক্তিত্বই এগিয়ে দেয় নেতৃত্বের দিকে। ইসলামী বিপ্লবের আন্দোলন ব্যক্তিত্বের বন্ধাত্ব নয়, বিকাশ চায়। তাই এ আন্দোলনের পতাকাবাহীদের সতর্ক থাকতে হবে, তারা যেনো নিজেদের ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে গাফিল না হয়ে পড়েন। তাদের কর্তব্য হলো, সুনিপুণ কারিগরের মতো নিজেদের ব্যক্তিত্বের নির্মাণ কাজ চালিয়ে যাওয়া এবং সেটাকে বিকশিত করে উন্নতির শিখরে অধিষ্ঠিত করে দেয়া। কিন্তু কিভাবে নির্মাণ করা যায় ব্যক্তিত্ব ? কিভাবে করা যায় তাকে বিকশিত ? হ্যাঁ ব্যক্তিত্ব নির্মাণ ও বিকশিত করবার জন্যে কতগুলো কাজ ও নিয়ম আপনাকে বলে দিচ্ছি ঃ

ক. জীবনোদ্দেশ্য ও কর্মসূচি নির্ধারণ করুন

এ ক্ষেত্রে পয়লা কাজ হলো, আপনি আপনার জীবনের উদ্দেশ্য ঠিক করে নিন এবং সে উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্যে কর্মসূচি তৈরি করে ফেলুন। ইসলামী আন্দোলনের সহযাত্রী হিসেবে আপনি এগুলো নিশ্চয়ই ঠিক করে নিয়েছেন। তারপর আরো কিছু কাজ করুন ঃ

১. জীবনের কতগুলো টারগেট ঠিক করে নিন। ক্রমিক সংখ্যা বসিয়ে সেগুলো সাজিয়ে নিন।

২. নিজের জীবনকে এসব নির্ধারিত টারগেটে পৌঁছাবার জন্যে সে অনুযায়ী কর্মসূচি তৈরি করে নিন।

৩. আপনার মধ্যে পরিত্যাগ করতে হবে এমন যেসব অনাকাংখিত বদ অভ্যাস আছে, সেগুলো কি কি চিন্তা করে দেখুন এবং সেগুলোর তালিকা তৈরি করে নিন। অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে তালিকা তৈরি করুন।

৪. আপনার মধ্যে কি কি কাংখিত আদত-অভ্যাসের ঘাটতি আছে সেগুলো চিন্তা করে দেখুন এবং তালিকা তৈরি করে নিন।

৫. আপনার ব্যক্তিত্বকে বিকশিত ও পরিগঠিত করবার জন্যে কি কি হাতিয়ার, কি কি সামগ্রী, কি কি উপায়-উপকরণ এবং কি কি পন্থা-পদ্ধতি সংগ্রহ করা আপনার প্রয়োজন, তা ভেবে নিন এবং তালিকা তৈরি করে নিন।

খ. আগাছা পরিষ্কার করুন

আপনার ব্যক্তিত্বকে বিকশিত করবার জন্যে আপনার জীবন থেকে কিছু জিনিস পরিত্যাগ করতে হবে। সেই পরিত্যাজ্য জিনিসগুলো হলো ঃ

১. সংশয় ঃ আপনাকে সবসময় সব বিষয়ে সংশয়মুক্ত থাকতে হবে। কারণ, সংশয় মানুষের ইচ্ছাশক্তিকে দুর্বল করে দেয়।

২. বাজে ও নিষ্প্রয়োজনীয় চিন্তা কল্পনা ঃ এটা মানুষকে নেগেটিভ চিন্তায় নিমজ্জিত করে। এতে ব্যক্তিত্ব বিকাশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়।

৩. ভয়-ভীতি ঃ ভয়-ভীতি মানুষকে না উন্নত হতে দেয় আর না আত্মগঠনের সহায়তা করে। আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থাশীল হবার মাধ্যমে ভয়-ভীতি থেকে মুক্ত হয়ে যান।

৪. আলস্য ঃ আলস্য একটি সক্রীয় সত্তা। সে নিজের কাজে খুব দক্ষ। সে মানুষকে আজকের কাজ করার জন্যে কালকের পথ দেখায়।

গ. আত্মীয় করুন

আপনার ব্যক্তিত্বের ভিত নির্মাণের জন্যে আপনার ব্যক্তি সত্তার সাথে কয়েকটি জিনিস একাকার করে নিন। সেগুলো হলো ঃ

১. আত্মবিশ্বাস ঃ আপনার ব্যক্তিত্ব এবং সমস্ত কাজ ও কর্মতৎপরতার কেন্দ্র বিন্দু হলো এই আত্মবিশ্বাস। তাই, আত্মবিশ্বাসকে মজবুত, সুদৃঢ় ও আত্মীয় করুন।

২. বিশ্বস্ততা ঃ আপনি সকলের বিশ্বাসযোগ্য ও নির্ভরযোগ্য হোন।

৩. নির্ভীকতা ঃ আপনি সাহসী হোন, বীরত্বের প্রতীক হোন।

ঘ. সমাবেশ ঘটান

আপনার ব্যক্তিত্বের মধ্যে কার্যকর হাতিয়ার হিসাবে নিম্নোক্ত জিনিসগুলোর প্রাচুর্য ও সৌন্দর্য সৃষ্টি করুন ঃ

১. রীতি-নীতি ২. নতুনত্ব, ৩. পর্যবেক্ষণ, ৪. মনোযোগ, ৫. পূর্ণতা, ৬. সৃষ্টিধর্মী চিন্তা, ৭. সিদ্ধান্ত শক্তি, ৮. পরিবেশের সাথে সামঞ্জস্যশীলতা, ৯. সাংগঠনিক ও প্রশাসনিক দক্ষতা, ১০. মত প্রকাশের যোগ্যতা, ১১. বিজ্ঞতা, ১২. বিচক্ষণতা, ১৩. কর্মকৌশল।

ঙ. দূর করুন

আপনার ভিতর থেকে নিম্নোক্ত আদত ও অভ্যাসগুলো ঝেড়ে মুছে দূরে নিক্ষেপ করুন ঃ

১. আত্মোপহাস, ২. শুচিগ্রস্ততা, ৩. স্বার্থপরতা, ৪. বদমেজাজি, ৫. দুর্বল চিন্তা, ৬. ঘৃণা, ৭. অসন্তোষ, ৮. অনাগ্রহ, ৯. মনোকষ্ট, ১০. গোস্বা, ১১. হিংসা-বিদ্বেষ।

৩. চাই প্রিয় নেতৃত্ব

ব্যক্তিত্বের সাথে সাথে আপনার মধ্যে চাই জনপ্রিয় নেতৃত্ব। এজন্যে আপনি অন্যদেরকে, জনগণকে আপনার আপন ভাবুন, তাদেরকে আপন করে নিন, তাদেরকে আপনার হৃদয়ে জায়গা দিন।

আপনাকে জনগণের প্রিয় হওয়া চাই। মানুষ যেনো আপনাকে দেখার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। আপনাকে দেখলে মানুষ যেনো আনন্দিত হয়। তারা যেনো মনে করে একজন ভালো মানুষকে দেখলাম, একজন শ্রেষ্ঠ মানুষকে দেখলাম।

আপনাকে এমন হওয়া চাই, যেনো মানুষ আপনাকে ভালোবাসে, আপনার সাথে কথা বলাকে সৌভাগ্য মনে করে। মানুষ যেনো আপনাকে নিজেদের মধ্যে পাবার জন্যে উদগ্রীব থাকে, আপনার কথা শুনার জন্যে ব্যাকুল থাকে।

আপনাকে এমন হওয়া চাই, যেনো মানুষ আপনার জন্যে কষ্ট স্বীকার করতে সদা প্রস্তুত থাকে। আপনার জন্যে কষ্ট স্বীকার করাকে সৌভাগ্য মনে

করে। আপনাকে মেহমানদারি করতে পারলে নিজেকে ভাগ্যবান মনে করে। আপনাকে নিজেদের মধ্যে পাওয়াকে খোশ নসীব মনে করে।

আপনি যেনো মানুষের হৃদয়ে এমন গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে পারেন, সেই চেষ্টা করুন। আপনি যেনো জনগণের প্রিয়, কাঙ্ক্ষিত ও মনের মানুষ হতে পারেন সেই চেষ্টা করুন। যার সদগুণাবলীর জন্যে মানুষ তাকে ভালোবাসে, আল্লাহও তাকে ভালোবাসেন। তবে মানুষের এ ভালোবাসা পাবার জন্যে প্রথমে আপনারই ব্যাকুল হয়ে মানুষকে ভালোবাসতে হবে। নির্বিশেষে সকল মানুষকে আপনার হৃদয়ে স্থান দিতে হবে। আপনার হৃদয়-মনকে আকাশের মতো প্রশস্ত ও প্রসারিত করে নিতে হবে। প্রতিটি মানুষের জন্যে সেখানে জায়গা করে দিতে হবে। এজন্যে চরম সাধনা আপনাকে করতে হবে। করতে হবে কঠিন মেহনত, কুরবানি ও ত্যাগ স্বীকার। এবার বলুনতো অন্যদের ব্যাপারে আপনার কেমন হওয়া উচিত ? হ্যাঁ, আপনাকে এমনটি হওয়া উচিত ঃ

১. খোলা মনের মানুষ হোন ঃ হ্যাঁ, আপনাকে খোলা মনের মানুষ হতে হবে। এক সমীক্ষায় বিরাট সংখ্যক লোককে প্রশ্ন করা হয়েছিলো ঃ 'নিজের ব্যাপারে আপনি অন্যকে কেমন দেখতে চান ?' এ প্রশ্নের যে উত্তর লোকেরা দিয়েছে, তাতে চারটি কথা সর্বাধিক উচ্চারিত হয়েছে। সেগুলো হলো ঃ

ক. মননশীল, ভদ্র, সুরুচিবান।

খ. খোলা মনের অধিকারী, হাসি-খুশি।

গ. বন্ধু সুলভ।

ঘ. সুহৃদ।

জী, আপনাকেও এমনটি হওয়া চাই। মানুষকে হৃদয়ে জায়গা দিন।

২. ঐকান্তিক ও নিষ্ঠাবান হোন ঃ মানুষের কল্যাণ কামনা করা, মানুষের উপকার করা, মানুষকে ভালোবাসা, মানুষের জন্যে কষ্ট স্বীকার করা, ত্যাগ ও কুরবানী করা—এসবই আপনি করবেন সততার সাথে, নিঃস্বার্থভাবে। এসবই আপনি করবেন কেবল আল্লাহর ভালোবাসা ও তাঁর সন্তুষ্টিলাভের প্রেরণায়। সত্যবাদিতা ও সত্যপন্থাকে আপনার সাথি বানিয়ে নিন। প্রদর্শনেচ্ছাকে যবাই করে দিন। বিনয় ও ব্যক্তিত্বকে আপন করে নিন। দেখবেন, আপনার প্রতি মানুষের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা বৃদ্ধি পাবে।

৩. আদর্শের উপর অটল থাকুন ঃ আপনার জীবনোদ্দেশ্য, জীবনাদর্শ ও জীবনের মূল দৃষ্টিভংগির রাজপথে আপনি চলুন। এই সোজা পথ থেকে আপনি কখনো বিচ্যুত হবেন না। কোনো কিছুই যেনো আপনাকে আপনার জীবনাদর্শ

থেকে টলাতে না পারে। আপনি আপনার এ সিরাতুল মুস্তাকীমের উপর অটল থাকুন। আপনি আপনার আদর্শ ও দৃষ্টিভংগির সাক্ষী ও দৃষ্টান্ত হয়ে যান। দৃঢ়তার সাথে সঠিক পথে চলার জন্যে মানুষ আপনাকে ভালোবাসবে, আপনার প্রতি হবে আকৃষ্ট।

৪. মানুষের ভালো গুণগুলো দেখুন ঃ আপনার সহকর্মীদের মাঝে কি কি ভালো গুণাবলী আছে, সেগুলো সন্ধান করুন। কারো খারাপ গুণ খুঁড়ে বের করে আপনার লাভ কি ? কেবল পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝে একান্ত আপনজনের মতো কাউকে সংশোধন করার চেষ্টা করা ভিন্ন কথা। কিন্তু আসল কাজ হলো মানুষের ভালো গুণ দেখা, সেগুলোকে বিকশিত করার চেষ্টা করা। ফুল বাগানের মালি বাগান সাজাবার ও ফুল ফুটাবার ব্যাপারে যে ভূমিকা গ্রহণ করে, আপনিও আপনার সহকর্মী এবং অন্য সকলের ব্যাপারে সেই ভূমিকা গ্রহণ করুন। এভাবে মানুষ আপনাকে ভালোবাসবে।

৫. নিঃস্বার্থপর হোন ঃ মানুষের সাথে সম্পর্ক গড়া ও সম্পর্ক রাখার ক্ষেত্রে সবসময় নিঃস্বার্থ হোন। সম্পর্কের ক্ষেত্রে যখনই আপনার বন্ধু টের পাবে যে, আপনার মধ্যে কোনো স্বার্থ কাজ করছে, তখন তিনি আপনাকে ত্যাগ করবেন, অথবা তিনিও নিজের স্বার্থ হাসিলের জন্যেই আপনার সাথে সম্পর্ক রাখবেন। নিঃস্বার্থ লোকদেরকে মানুষ হৃদয়ের গভীরে স্থান দেয়। নিঃস্বার্থ লোকদের প্রতি এমনকি শত্রুও নিজের হৃদয়ে শ্রদ্ধা পোষণ করে।

৬. হাসি মুখে থাকুন ঃ সবসময় হাসি খুশি থাকুন। মানুষের সাথে কথা বলার সময় আপনার মুখে হাসি লেগেই থাকুক। মুচকি হাসুন, অট্টহাসি হাসবেন না। মুচকি হাসিই মিষ্টি হাসি। হাসি মুখে কথা বললে মানুষ খুশি হয়। মনে করে, আপনি তাদের পেয়ে খুশি হয়েছেন। আমাদের প্রিয় নবী (স) বলেছেন ঃ "তোমার ভাইয়ের প্রতি তোমার মুচকি হাসি একটি দান সমতুল্য"। তিনি নিজে সবসময় হাসি মুখে কথা বলতেন। তাঁর মুখে মুচকি হাসি লেগেই থাকতো। মনে রাখবেন, হাসির মূল্য অনেক, বরং হাসি অমূল্য রত্ন।

৭. আবেগ নিয়ন্ত্রণে রাখুন ঃ আপনি আপনার আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখুন। খুশি, দুঃখ, রাগ—এ তিনটি অবস্থায় আপনার নিজেকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। খুশিতে বাগ বাগ হয়ে অট্টহাসি হাসবেন না। দুঃখে, দুশ্চিন্তায় ভেংগে পড়বেন না। রাগে গোস্বায় ফেটে পড়বেন না। তাহলে আপনার ব্যক্তিত্ব বিলীন হয়ে যাবে। নেতা আত্ম নিয়ন্ত্রণহীন হয় না। নেতাকে হতে হয় ধীর স্থির সুস্থ মস্তিষ্কের অধিকারী, ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন ও Balanced.

৮. আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত রাখুন ঃ আত্মসম্মানবোধ যে কোনো পর্যায়ের নেতার একটি মৌলিক গুণ। আপনি যা বলবেন, যা করবেন, অবশ্যি আপনার বয়স, দায়িত্ব এবং পরিবেশের প্রতি লক্ষ্য রেখে যথোপযুক্ত কথাটি বলবেন এবং যথোপযুক্ত কাজটি করবেন। যেমন, শিশু কিশোরদের সাথে বড়দের মতো কথা বলবেন না। আবার বড়দের সাথে শিশুদের মতো কথা বলবেন না। দায়িত্বশীল ব্যক্তির সাথে, সহকর্মীর সাথে, সাধারণ জনগণের সাথে কথা বলার সময় অবশ্যি তাদের স্ব স্ব অবস্থা ও অবস্থানের প্রেক্ষিতে কথা বলবেন। আপনি যখন কোনো কাজ করবেন, কাঁচা কাজ করবেন না। আপনার কথা ও কাজ হওয়া উচিত পাকা, চমৎকার, সামঞ্জস্যপূর্ণ ও আকর্ষণীয়। এটাই আপনার আত্মসম্মানবোধের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

৯. বহিরাংগিক শুদ্ধতা অর্জন করুন ঃ আপনার বাহ্যিক ব্যক্তিত্বকেও শুদ্ধ করুন। বাহ্যিক ত্রুটিগুলো সংশোধন করে নিন। হালকা, অশোভন ও দৃষ্টি কটু অংগভংগি করবেন না। অন্যদের সামনে নাকে কানে আংগুল ঢুকাবেন না, অন্য কিছুও নয়। অপরের সম্মুখে দাঁত পরিষ্কার করবেন না। দাঁত খিলাল করবেন না। তবে সবসময় কান, নাক ও দাঁত পরিষ্কার রাখুন। চুল আঁচড়ে রাখুন, দাড়ি সজ্জিত করে রাখুন, শরীর সুস্থ রাখুন। মানানসই কাপড়-চোপড় পরুন। অধিক দামিও নয়, অধিক কম দামিও নয়। সর্বদা শরীর পরিষ্কার পবিত্র রাখুন। পোশাক পরিচ্ছন্ন রাখুন। আপনি যদি পুরুষ হয়ে থাকুন, তবে সামর্থে কুলালে মজলিসে যেতে সুগন্ধি ব্যবহার করুন। আপনি যদি মহিলা হয়ে থাকুন হাতের তালুতে মেহেন্দি ব্যবহার করুন, বাইরে যেতে শুদ্ধ, শালীন ও অনিন্দনীয় পোশাকে বের হোন, অলংকারের ঝনঝনানি থেকে বিরত থাকুন। উদ্ধত চলাফেরা করবেন না। কর্কশ স্বরে কথা বলবেন না। কথায়, বসায়, হাটায়, আশাকে-পোশাকে ও ভংগিমায় শুদ্ধতা ও শুচিতা অর্জন করুন।

১০. ভাষা শুদ্ধ করুন ঃ মানুষের সাথে তো আপনাকে কথা বলতেই হবে। অন্যদের চাইতে আপনাকেই বেশি লোকের সাথে কথা বলতে হয়। আপনি মানুষের সাথে শুদ্ধ ভাষায় কথা বলুন। ভাষায় আঞ্চলিক দুষ্টতা পরিহার করুন, মাতৃভাষায় কথা বলুন। শংকর ভাষা ত্যাগ করুন।

১১. শিষ্টতা চর্চা করুন ঃ প্রচলিত ভদ্রতা, শিষ্টতা, আদব-কায়দা ও রসম রেওয়াজকে আপনার আদর্শিক মানদণ্ডে বিচার করে গ্রহণ করুন এবং চর্চা করুন। এগুলোর মাধ্যমে আপনার আদর্শিক কালচারকে বিকশিত করুন।

১২. পারদর্শিতা অর্জন করুন ঃ অন্তত কোনো একটি বিষয়ে আপনি নিজেকে বিশেষজ্ঞ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করুন। সে বিষয়ে পূর্ণতা ও দক্ষতা অর্জন করুন। শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার পারদর্শিতা অর্জন করুন।

১৩. তীক্ষ্ণ অনুভব শক্তি অর্জন করুন ঃ নিজের মধ্যে ধারালো অন্তরদৃষ্টি ও দূরদৃষ্টি সৃষ্টি করুন। প্রজ্ঞাবান হোন। বাস্তব প্রেক্ষিত ও যথার্থ প্রয়োজন উপলব্ধি করুন। কি পরিস্থিতি আসছে, কি পদক্ষেপ নেয়া উচিত—তা উপলব্ধি করার যোগ্যতা অর্জন করুন। সব ব্যাপারে নিজের মধ্যে তীক্ষ্ণ অনুভব শক্তি অর্জন করুন। আপনার তীক্ষ্ণ অনুভব শক্তি দিয়ে অতীতকে যথার্থ মূল্যায়ন করুন, বর্তমানকে নখদর্পণে রাখুন আর ভবিষ্যতের চ্যালেঞ্জকে উপলব্ধি করুন।

১৪. অন্যদের মর্যাদা দিন ঃ সব মানুষেরই আত্মসম্মানবোধ আছে। মানুষ মর্যাদা সচেতন। আপনি সবসময় অপরকে সম্মান দিন, ইজ্জত দিন এবং মর্যাদা প্রদান করুন। অন্যদের অবদানের প্রতি স্বীকৃতি ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করুন। কারো পিছে তার বদনাম করবেন না, প্রশংসা করবেন। যে মানুষকে সম্মান দেয় আল্লাহ্ তাকে সম্মান প্রদান করেন।

১৫. নিরস নয় সরস হোন ঃ কোথাও পারস্পরিক কথাবার্তায় অংশ নিলে আপনার কথা যেনো সরস হয়। নিরস কথা বলা এড়িয়ে চলুন। সত্য কথায় রস থাকলে তা খুবই উপভোগ্য হয়। অন্যদের জন্যে তা শিক্ষণীয় হয়। এতে আপনি শ্রোতাদের দৃষ্টি কেড়ে নিতে সক্ষম হবেন। তবে এমন কথা কখনো বলবেন না, যা আপনার ব্যক্তিত্বকে হালকা করবে।

১৬. নিজের সম্পর্কে কম বলুন ঃ অন্যদের সাথে কথা বলার সময় নিজের সম্পর্কে খুব কম বলুন। অন্যদের প্রশংসা শুনে নিজের প্রশংসা নিজে করবেন না। জিজ্ঞাসিত না হলে, কিংবা মোক্ষম প্রয়োজন না হলে নিজের সম্পর্কে বলা থেকে বিরত থাকুন। মনে রাখবেন, আত্ম প্রচারকের নেতৃত্ব ব্যক্তিত্বহীন হয়ে থাকে।

১৭. সহকর্মীদের সাথে পরামর্শ করুন ঃ জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সহকর্মীদের সাথে পরামর্শ করুন। নির্দিষ্ট পরিষদ বা কমিটির সাথে তো পরামর্শ করবেনই। তাছাড়া অন্যান্য সহকর্মীদের সাথেও কোনো কোনো বিষয়ে পরামর্শ করুন। ব্যক্তিগতভাবে পরামর্শ গ্রহণ করুন। ব্যক্তিগতভাবে যতোবেশি লোক থেকে পরামর্শ নিতে পারেন ততোবেশি লোকের হৃদয়ে আপনি জায়গা পাবেন। এভাবে আপনারও হৃদয় প্রসারিত হবে, দৃষ্টিভংগি প্রশস্ত হবে, অভিজ্ঞতার সম্ভার বৃদ্ধি পাবে এবং সিদ্ধান্ত নেয়া আপনার পক্ষে সহজ হবে। আপনার সিদ্ধান্ত পপুলার হবে। আদর্শিক গণ্ডিতে থেকে যতো পপুলার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন, ততো আপনার জন্যে মঙ্গল। তাই পরামর্শের পরিধি বাড়ান এবং বিতর্কের পরিধি কমান।

১৮. নাম মনে রাখুন ঃ বেশি বেশি মানুষের নাম মনে রাখুন। আপনার আদর্শিক ও আন্দোলনের সহকর্মীদের নাম তো অবশ্যি আপনার বেশি বেশি স্মরণ থাকা উচিত। তাছাড়া সাধারণ ও অসাধারণ সব ধরনের মানুষের নাম মনে রাখার চেষ্টা করুন। পুনরায় দেখা হলে নাম ধরে ডাকুন। সুন্দর নামে ডাকুন। নামের সাথে 'ভাই' যোগ করে ডাকুন। নাম মনে রাখার জন্যে স্মৃতির প্রখরতা বৃদ্ধি করুন। স্মৃতির পাতায় নামের তালিকা বৃদ্ধি করুন। যাদের নাম মনে রাখবেন তাদের খোঁজ-খবর নিন, তাদের সাথে সাক্ষাত হলে আগ্রহের সাথে খোঁজ-খবর নিন। অন্যদের কথা স্মরণ করুন এবং তাদের জন্যে কল্যাণের দু'আ করুন। তাদের নাম ধরে ধরে আল্লাহর কাছে তাদের কল্যাণের জন্যে সাহায্য চান। দেখবেন, তাদের হৃদয়ে আপনার আসন প্রতিষ্ঠিত হবে।

১৯. মানুষের সাহায্যে প্রস্তুত থাকুন ঃ বিপদে আপদে, বিবাদে বিসম্বাদে, দুঃখে দারিদ্রে, সমস্যায় সংকটে আপনি মানুষের পাশে দাঁড়ান। বুদ্ধি দিন, পরামর্শ দিন, সাহস দিন, উৎসাহ দিন, সান্ত্বনা দিন, সহযোগিতা দিন, সাধ্যানুযায়ী সাহায্য করুন। অন্তর দিয়ে তাদের কল্যাণ কামনা করুন। করুণাময়ের দরবারে তাদের জন্যে দু'আ করুন। একা করুন, তাদেরকে নিয়ে করুন। এভাবে আপনি তাদের হৃদয়ের মানুষ হোন।

২০. আবেগ ও বিবেক দীপ্ত হোন ঃ আপনার মধ্যে আবেগ থাকা চাই, উদ্দীপনা থাকা চাই, জজবা থাকা চাই। এগুলো জ্যান্ত, সজীব ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের গুণাবলী। নিরস যুক্তিবাদী নেতৃত্ব দ্বারা সংস্কার ও বিপ্লব সাধিত হয় না। আল্লাহর ভালোবাসা ও জান্নাত লাভের জজবায় উদ্বেলিত হোন। তাতে আপনার সহকর্মীরাও উদ্বেলিত হবে। তবে আপনাকে অবশ্যি সচেতন থাকতে হবে, কখনো আপনার আবেগ যেনো বিবেককে পরাজিত না করে। আপনার জজবা যেনো যুক্তিকে ধূলিস্যাত না করে। আপনার উদ্দীপনা যেনো উসূলকে পদদলিত না করে। আবেগ আর বিবেকের সমন্বিত তেজস্বিতায় তাড়িত হোন। মানুষ আপনার সাথে থাকবে।

২১. দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলুন ঃ কিছু দুর্বলতা এমন আছে, সেগুলো যদি আপনার মধ্যে থাকে, তবে মানুষ আপনার ব্যাপারে অনাগ্রহী হবে, আপনার থেকে দূরে সরে যাবে। আপনি নিজের নিম্নোক্ত দুর্বলতাগুলোকে ঝেড়ে ফেলুন ঃ

ক. নিজের স্বার্থ চিন্তা, আত্ম চিন্তা।

খ. নিজেই নিজেকে উত্তম মনে করা।

গ. নিজের পসন্দকে অগ্রাধিকার দেয়া।

ঘ. নিজের বহিরাংগের অসৌন্দর্য।

ঙ. হতাশা, নিরাশা, দুশ্চিন্তা, ভেংগে পড়া।

চ. সহকর্মীও জনগণ থেকে দূরত্ব।

ছ. অকৃতজ্ঞতা।

জ. অহংকার।

ঝ. অধৈর্য।

ঞ. ঔদ্ধ্যত্য।

ট. সেচ্চাচারিতা।

ঠ. প্রতারণা, কুটকৌশল, মিথ্যা।

ড. অবিশ্বস্ততা।

ঢ. বদমেজাজী।

ণ. অতুষ্টি।

ত. আলস্য, গাফলতি।

থ. অপরিচ্ছন্নতা, বিশৃংখলা।

দ. কাঁচা কাজ।

ধ. কর্মভীতি।

ন. অসচেতনতা, বে-খবরী।

প. অসৌজন্যতা, অশিষ্টতা।

ফ. যে কোনো প্রকার বদ অভ্যাস।

২২. আল্লাহর কাছে ধরণা দিন ঃ আপনি যেনো ভালো গুণগুলো অর্জন করতে পারেন, সে জন্যে দয়াময় প্রতিপালকের কাছে হৃদয় খুলে প্রার্থনা করুন, তাঁর কাছে চান, তাঁর সাহায্যের মুখাপেক্ষী হোন। আপনার দুর্বলতা যেনো তিনি দূর করে দেন, সে ব্যাপারে তাঁর সাহায্য চান, তাঁর কাছে ধরণা দিন। তাঁর কাছে কান্নাকাটি করুন। তিনি অবশ্যি আপনাকে সাহায্য করবেন। তিনি অবশ্যি তাঁর দাসদের রোনাজারি কবুল করেন।

৪. চাই নেতৃত্বের শ্রেষ্ঠত্ব

আপনি রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের কোনো পদমর্যাদায় থাকুন, দলীয় নেতৃত্বে থাকুন, কোনো সংস্থার নেতৃত্বে থাকুন, কিংবা থাকুন কোনো প্রতিষ্ঠানের কর্তৃত্বে, সর্বক্ষেত্রেই নেতৃত্ব ও কর্তৃত্বের সাথে সাথে জ্ঞানে, গুণে, যোগ্যতায়, দক্ষতায়, বিচক্ষণতায়, সখ্যতায়, অদম্যতায়, অটলতায় ও পারদর্শীতায় আপনাকে শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে হবে। এসব ক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকলে পদমর্যাদা আপনাকে এগিয়ে দেবে না। আপনার সাফল্যের চাবিকাঠি আপনার হাতে। 'আল্লাহ ততোক্ষণ কোনো ব্যক্তির অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতোক্ষণ না সে নিজেই নিজের অবস্থার পরিবর্তন করে।'

তাই শুধু নেতৃত্বের পদমর্যাদায় নয়, বরং নিজের মহত গুণাবলীর মহিমায় শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করুন। এভাবে করুন ঃ

১. সঠিক সিদ্ধান্ত নিন ঃ যে কোনো বিষয় আপনার সামনে আসবে, আপনি চিন্তা-ভাবনা না করেই সে বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন না। প্রথমে বিষয়টি নিয়ে ভাবুন, চিন্তা করুন। এর সাথে যুক্ত করুন যুক্তি। অবশ্যম্ভাবী পরিণতি কী তা খতিয়ে দেখুন। প্রয়োজনীয় পরামর্শ নিন। আর অবশ্যি সঠিক সিদ্ধান্ত নিন। জরুরি বিষয়ে তড়িৎ সিদ্ধান্ত নিন। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সর্ববিবেচনা সম্পন্ন করে সিদ্ধান্ত নিন। যথার্থ সিদ্ধান্ত নিন।

২. চিন্তা-ভাবনায় স্বাধীনচেতা হোন ঃ যে কোনো বিষয়ে আপনাকে মত প্রকাশ করতে হলে, নিজের বিবেক-বিবেচনা অনুযায়ী স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করুন। অন্যের চিন্তায় প্রভাবিত হবেন না। অপরের মতের কাছে বন্দী হবেন না। স্বাধীন চিন্তা করুন। স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করুন। হতে পারে আপনার মত অপর কারো মতের সাথে মিলবে না। হতে পারে আপনার মত অপর ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের মতের অনুরূপ হবে। তাতে কিছু যায় আসে না। আপনি আপনার মতের পক্ষে ক্ষুরধার যুক্তি আর অকাট্য প্রমাণ পেশ করুন। যুক্তি নির্ভর স্বাধীন চিন্তা শ্রেষ্ঠত্বের প্রতীক।

৩. সঠিক মতের উপর অটল থাকুন ঃ ভালোভাবে চিন্তা-ভাবনা করে যুক্তি-প্রমাণের ভিত্তিতে যে মত প্রতিষ্ঠা করবেন তার উপর অটল থাকুন।

৪. সদা সক্রীয় থাকুন ঃ আপনি যে মহান উদ্দেশ্য অর্জনের প্রচেষ্টায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন, সে প্রচেষ্টায় সদা সক্রীয় থাকুন। অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যান, নিরবধি চালিয়ে যান চেষ্টা সংগ্রাম। আপনার জীবনাভিধান থেকে 'শিথিলতা' শব্দটি মুছে ফেলুন।

৫. ব্যর্থতায় ভগ্ন মনোরথ হবেন না ঃ প্রচেষ্টার পথিমধ্যে কোনো ব্যর্থতায় ভেংগে পড়বেন না। চিন্তিত হবেন না। মনভাংগা হবেন না। মাথায় হাত দিয়ে বসবেন না। কোনো ব্যর্থতাকে কিছু মাত্র গুরুত্ব দেবেন না। বরং ব্যর্থতা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে সঠিক পথে আরো সতেজ হোন।

৬. জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কাজ করুন ঃ যেহেতু আপনি সমাজ পরিবর্তনের কাজ করছেন, যেহেতু সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব আপনার প্রয়োজন, সে জন্যে জনগণকে আপনার প্রভাবিত করা চাই। তাই এমন সব কর্মসূচি গ্রহণ করুন, যে গুলোতে জনগণ দ্রুত প্রভাবিত হবে। জনস্বার্থ ও জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে কাজ করুন।

৭. প্রভাবশালীদের সহযোগিতা পাবার চেষ্টা করুন ঃ যারা জাতির অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে বিভিন্ন পর্যায়ে নেতৃত্ব দিচ্ছেন এবং প্রভাব বিস্তার করে আছেন, তাদের প্রতি মনোযোগ দিন। তাদেরকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করুন। তাদেরকে আপনার সহযাত্রী বানাবার চেষ্টা করুন। অন্তত তাদের সহযোগিতা লাভের চেষ্টা করুন।

৮. ঝুঁকি নিন ঃ যে কোনো বড় লক্ষ্য অর্জনের জন্যে আপনাকে অবশ্যি বড় বড় ঝুঁকি নিতে হবে। বদর যুদ্ধের এতো বড় ঝুঁকি না নিলে ইসলামী সমাজ গড়ার প্রচেষ্টা অংকুরেই বিনাশ হয়ে যাবার আশংকা ছিলো। ঝুঁকি নিন। বিপদের পরোয়া করবেন না। ভীরু কাপুরষরা পৃথিবীতে কখনো সাফল্যের মুখ দেখে না। সাফল্য কেবল বীর পুরুষদেরই পদচুম্বন করে। ভীরুরা না মরেও মৃত। শত শৃগালের পলায়নমুখী সমাবেশের চেয়ে এক সিংহের বিজয়ী অভিযাত্রা অনেক উত্তম।

৯. সহকর্মীদের অবদানকে পুরস্কৃত করুন ঃ আপনার সহকর্মীরা জ্ঞান দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে, বীরত্ব দিয়ে, ধন-শ্রম দিয়ে, আপনার যে সহযোগিতা করছে, অন্তত প্রশংসা করে হলেও, কিংবা ফুল দিয়ে হলেও তাদের অবদানকে স্বীকৃতি দিন। আপনার সহকর্মীরা নিঃসন্দেহে আপনার জন্যে নয়, বরং, আল্লাহর জন্যে, তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্যে কাজ করছে। কিন্তু আপনি তাদের নেতা, তাদের দায়িত্বশীল, আপনার নির্দেশেই তারা কাজ করছে, তাই তাদের কাজকে স্বীকৃতি দিন, শোকরিয়া আদায় করুন।

১০. সহকর্মীদের পরামর্শ দিন ঃ আপনার সহকর্মীদের পরামর্শ দিন। তাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ব্যাপারে পরামর্শ দিন। দলীয় ও আন্দোলনের কাজে পরামর্শ দিন। ক্ষমতা উন্নয়নের কাজে পরামর্শ দিন। দক্ষতা কাজে লাগাবার পরামর্শ দিন। তারা আপনার পরামর্শ পেলে খুশি হবে। তাদের ব্যক্তিগত বিষয়ে খোঁজ খবর নিন। তাদের নিজস্ব ব্যাপারে আগ্রহ রাখুন, তবে গোপন বিষয়ে নয়। তাদের জন্যে দু'আ করুন। পরামর্শের সাথে দু'আও করবেন।

১১. অনন্যতা অর্জন করুন ঃ আপনি নিশ্চয়ই অন্যদের মতোই একজন মানুষ। তা সত্ত্বেও আপনি নিজেকে অন্যদের চেয়ে উন্নত ও শ্রেষ্ঠ বানাতে পারেন। আপনি অন্যদের চেয়ে সুন্দর করে কথা বলুন। অন্যদের চেয়ে সুন্দর করে বক্তব্য রাখুন। অন্যদের চেয়ে সুন্দর করে কাজ করুন। অন্যদের চেয়ে উত্তম ও যুক্তি সংগত মত প্রকাশ করুন। অন্যদের চেয়ে উত্তম আদব কায়দা ও আচার ব্যবহারের অধিকারী হোন। আপনার সকল কাজে বুদ্ধিমত্তা, উপযুক্ততা,

নতুনত্ব, নিপুণতা, নিজস্বতা এবং আগ্রহ ও অদম্যতাই আপনাকে অনন্যতা দান করবে। আপনি আপনার লোকদের একজন হয়েও অনন্য হোন। আপনার অনন্যতা আপনার জন্যে বয়ে আনবে শ্রেষ্ঠত্ব।

আল্লামা মাওয়ারদী ইসলামী নেতৃত্বের জন্যে প্রয়োজনীয় গুণাবলীর কথা উল্লেখ করে বলেন, ইসলামী নেতৃত্বের মধ্যে এ গুণগুলো থাকতে হবে ঃ

১. সত্যপ্রিয়তা ২. জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ৩. ইজতিহাদ তথা উদ্ভাবনী যোগ্যতা ৪. সুস্বাস্থ্য ৫. উচ্চাশা ৬. প্রভাবশালী বক্তব্য রাখার দক্ষতা ৭. কৌশল ও বুদ্ধিমত্তা ৮. তীক্ষ্ণ বিবেক ৯. বীরত্ব বাহাদুরি ও নির্ভীকতা ১০. উত্তম স্মরণ শক্তি ১১. দ্রুত উপলব্ধি শক্তি ১২. মনোভাব প্রকাশের দক্ষতা ১৩. বাহুল্য বর্জন শক্তি ১৪. লোভহীনতা ১৫. বিলাসীতা থেকে দূরত্ব ১৬. মিথ্যার প্রতি ঘৃণা ১৭. উদারতা ১৮. সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতা ১৯. যুল্‌মের প্রতি ঘৃণা ২০. কর্তব্য পালনে সক্রীয়তা ও নির্ভীকতা।

ইসলামের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর রাদিয়াল্লাহ আনহু বলেছেন, নেতৃত্বের জন্যে এ চারটি গুণ অপরিহার্য ঃ

১. কোমলতা, তবে দুর্বলতা নয়।

২. দৃঢ়তা, তবে কঠোরতা নয়।

৩. স্বল্প ব্যয়িতা, তবে কৃপণতা নয়।

৪. দানশীলতা, তবে অপব্যয় নয়।

(রচনাকাল ঃ জানুয়ারি ১৯৯৭ইং)

২

মন্দ কথা ছাড়ুন
সুন্দর কথা বলুন

১. একটি ভালো কথা একটি ভালো গাছের মতো !

"A Goodly word like a goodly tree, whose root is firmly fixed and branches (reach) to sky. It brings forth its fruit at all times."-(Al Quran : 14 : 24-25)

"একটি ভালো কথা একটি ভালো গাছের মতো, মাটিতে যার বদ্ধমূল শিকড়, আকাশে যার বিস্তৃত শাখা, সবসময় সে দিয়ে যায় ফল আর ফল।"-(আল কুরআন ১৪ ঃ ২৪-২৫)

কী অনুপম উপমা ! এমন উপমা কি আপনার মনকে নাড়া দেয়না ? আপনার হৃদয়াবেগ জাগ্রত করে না ? একটি ভালো কথা একটি ভালো গাছের মতো। সেই ভালো গাছটির মতো, মাটির গভীরে যার শিকড়, হালকা বাতাসে তো দূরের কথা, তুফানেও সে টলেনা। শাখা বিস্তার করে দিয়ে সে মানুষের জন্য ছায়া ঘেরা নিসর্গ তৈরি করে রেখেছে। বারো মাস সে সরবরাহ্ করে যায় ফল আর ফল।

আপনার একটি সুন্দর কথা, একটি ভালো কথা ঐ গাছটির মতোই কল্যাণময়। আপনার একটি সুন্দর কথা ঐ গাছটির মতোই হতে পারে শান্তির বাহক, কল্যাণের কাসিদা, আনন্দের দূত আর অফুরন্ত সুফল দায়ক।

২. সুন্দর কথা মানে কি ?

'কথা' বলতে কী বুঝায় ? আপনার মুখের ভাষা, উক্তি এবং বক্তব্যই আপনার কথা। কথা বুঝাবার জন্যে আমরা অনেকগুলো প্রতিশব্দ ব্যবহার করি। যেমন ঃ বচন, বাণী, বাক্য, বয়ান, বিবৃতি, বিবরণ, বাক, ভাষণ, ভাষ, ভাষা, ভনিতি, বক্তব্য, বোল, বুলি, উক্তি, নিরুক্তি, উচ্চারণ, যবান, লব্জ, প্রবচন, প্রবাদ, সম্ভাষ, সম্ভাষণ, সম্বোধন, সংলাপ ইত্যাদি।

কথার প্রধানত দু'টি দিক আছে ঃ সুন্দর কথা, অসুন্দর কথা। ভালো কথা মন্দ কথা। এ সুন্দর কথা বা ভালো কথা বলতে কী বুঝায়, তা আমরা সবাই জানি, বুঝি।

সুন্দর কথা মানে সুবচন, সুকথা, সুভাস, সুভাষণ, সুবাক্য, সদালাপ, সদুক্তি, মিষ্টি কথা, মিষ্টি বাক্য, মিষ্টি ভাষণ, প্রিয়বচন, প্রিয়বাক্য, হিতবাক্য,

হিতকথা, হিতোপদেশ, উপদেশ বাণী, কাজের কথা, মুখে মধু ঝরা, কানে মধু ঢালা, শ্রুতিমধুর কথা, শ্রুতিমাধুর্য, ধ্বনি মাধুর্য, মধুর বাণী, পূত কথা, মঞ্জুভাষ, স্বচ্ছকথা, স্পষ্ট ভাষা, অর্থবহ কথা ইত্যাদি।

আর যিনি সুন্দর কথা বলেন, আমরা তাকে বলি সুভাষী, মধুভাষী, মিষ্টভাষী, প্রিয়ভাষী, সুবচনী, সুবক্তা, সুকথক, মৃদুভাষী, অমৃতভাষী, হিতভাষী, সুভাস, মঞ্জুভাষ, কোমলভাষী, স্বচ্ছভাষী, স্পষ্টভাষী, মিতভাষী, স্বল্পভাষী, সংযতবাক।

শ্রেষ্ঠ মনীষীরা সুভাষী। তাঁরা সুন্দর কথা বলেন, সুন্দর করে বলেন। তাঁদের সুবচনে, সদালাপে, সুকথার শ্রুতি মাধুর্যে শ্রোতারা সদা সম্মোহিত। কার না ইচ্ছা হয় সুন্দর কথা বলতে? সুবচন শুনতে?

৩. অসুন্দর কথা তবু আছে

তবু অসুন্দর কথা আছে। মন্দ কথা আছে। মানুষ অসুন্দর কথা বলে। মন্দ কথা শুনে। আপনি কি জানেন অসুন্দর কথা কি? হ্যাঁ জেনে রাখুন, অসুন্দর কথার সমার্থ শব্দগুলো বলে দিচ্ছি।

অসুন্দর কথা মানে–কটু কথা, কটূক্তি, কটুবাক্য, কটুভাষা, কটুভাষণ, দুরুক্তি, দুর্বচন, কড়া কথা, চড়া কথা, মুখ ছোটামি, দুর্মুখ, দুর্বাক, নিন্দাবাণী, নিন্দাবাদ, খোঁটা, পরচর্চা, মন্দকথা, মন্দবাক, কুকথা, বাজে কথা, গালি, অভিশাপ, অপকথা, অশ্লীল কথা, বাঁকা কথা, কটাক্ষ, ঠাট্টা, বিদ্রুপ, শ্লেষ, উপহাস, তিরস্কার, ব্যাঙ্গোক্তি, অবজ্ঞা, ধিক্কার, বকা, বকাবকি, বকুনি, ধাতানি, ধমক, ধমকানি, বকাঝকা, দাবড়ি, ভর্ৎসনা, ভেটকি, খ্যাকখ্যাক, গর্জন, তর্জন গর্জন, হম্বি তম্বি, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য, চোটপাট, অতিকথা, অমিতভাষণ, বাগাড়ম্বর, বকবক, বকবকানি, ভ্যাদর ভ্যাদর, বকর বকর, কথার শ্রাদ্ধ, কথার তুবড়ি ছুটানো, কথার খই ফুটানো, প্রগলভতা, প্রলাপ, বাকসর্বস্বতা, আগড়বাগড়, আবোল তাবোল, আগড়ম বাগড়ম, ধানাইপানাই, প্যানপ্যান, ঘ্যান ঘ্যান, ঘ্যানর ঘ্যানর, তেগর তেগর, ঘ্যান ঘ্যানানি, প্যান প্যানানি, চর্বিত চর্বন, গ্যাক গ্যাক, চেঁচানি, চেঁচামেচি, চেল্লাচেল্লি, কোলাহল, গণ্ডগোল, হৈ হুল্লুড়, শোরগোল, হৈ হল্লা, হৈ হট্টগোল, হৈ হররা, অট্টরোল, অট্টরব, হাঁকডাক, হাঁকাহাঁকি, হুংকার, ভীমনাদ, জিগির, কলোরব, গলা ফাটানো, অকথা, আকথা, কুবাদ, কুবাক্য, কুবচন, নিরর্থক কথা, অকথ্য কথা, অশালীন কথা, অপবাদ, অপশব্দ, ইতর ভাষা, অপভাষা, অশিষ্ট বাক্য, কটুক্তি, অশ্রাব্য কথা, দুরুচ্চার্য, অভাষ্য ইত্যাদি।

এসব হলো অসুন্দর কথা, মন্দ কথার বৈশিষ্ট্য। এগুলো কথার কালিমা। তবু কি আপনি এসব অসুন্দর কথা বলবেন? না–

৩—

৪. মন্দ কথা ছাড়ুন

না, মন্দ কথা বলবেন না। মন্দ কথা ছাড়ুন। মন্দ কথায় কোনো লাভ নেই। উপকার নেই। এতে ক্ষতি আছে। এতে পাপ আছে। মন্দ কথা আপনার যবান নষ্ট করে, আপনার ব্যক্তিত্ব বিলীন করে, আপনার মন ও চরিত্রকে কলুষিত করে। মন্দ কথা বন্ধুতা নষ্ট করে, সখ্যতা ছিন্ন করে, মানুষের সাথে সম্পর্কহানি করে। যে মন্দ কথা বলে, মানুষ তাকে ঘৃণা করে, তাকে তুচ্ছজ্ঞান করে, তার থেকে দূরে অবস্থান করে, এমনকি মানুষ তার শত্রু হয়ে যায়। জানেন, মহান আল্লাহ্ মন্দ কথার উপমা কিভাবে দিয়েছেন ? দেখুন তাঁর বাণী ঃ

"And the parable of an evil word is that of an evil tree, it torn up by the root from the surface of the earth, it has no stability."-(Al Quran : 14 : 26)

"আর একটি মন্দ কথা একটি বাজে গাছের মতোই, সে গাছের মতো যাকে ভূমি থেকে উপড়ে ফেলা হয়, যার কোনো স্থায়িত্ব নেই।"-(আল কুরআন ১৪ ঃ ২৬)

প্রিয় রসূল (সা) বলেছেন ঃ মন্দ কথা মানুষকে জাহান্নামে উপুড় করে নিক্ষেপ করবে।-(তিরমিযি)

তিনি আরো বলেছেন ঃ মুসলিম সে, যার ভাষা ও কর্ম থেকে মুসলমানরা নিরাপদ থাকে।-(সহীহ বুখারি)

প্রিয় নবী (সা) আরো বলেছেন ঃ মুসলমানের সুন্দর বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে রয়েছে অর্থহীন কথা ও কাজ ত্যাগ করা।"-(তিরমিযি)

৫. মন্দ কথা বলতে মানা

মন্দ কথা অনেক অনেক অনিষ্টের মূল। মন্দকথা ব্যক্তিকে ছিন্নমূল করে, সমাজ থেকে উপড়ে ফেলে। মন্দ কথা সমাজে অস্থিরতা ও বিশৃংখলা সৃষ্টি করে। মন্দ কথা মনোকষ্ট, ঘৃণা, বিদ্বেষ, শত্রুতা ও হানাহানি সৃষ্টি করে। তাই মহান আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল মানুষকে মন্দ কথা বলতে মানা করেছেন। দেখুন, মহান আল্লাহ্ আল কুরআনে মন্দ কথার ব্যাপারে কী বলেছেন ঃ

১. তোমরা কেউ কারো গীবত (নিন্দা) করোনা। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পসন্দ করবে ? (৪৯ ঃ ১২)

২. পরস্পরের বদনাম করোনা, বিকৃত উপাধিতে ডেকোনা। (৪৯ ঃ ১১)

৩. হে ঈমানদাররা ! তোমাদের পুরুষরা অপর পুরুষদের এবং নারীরা অপর নারীদের উপহাস করো না। কারণ, তারা উত্তম হতে পারে। (৪৯ ঃ ১১)

৪. যারা নিরপরাধ মুসলিম নারী ও পুরুষের ঘাড়ে মিথ্যা অপবাদ চাপিয়ে তাদের কষ্ট দেয়, তারা আসলে নিজেদের ঘাড়েই চাপিয়ে নেয় বিরাট বুহতান (Slander) ও পাপের বোঝা। (৩৩ ঃ ৫৮)

৫. দান করার পর খোঁটা দিয়ে কষ্ট দেয়ার চাইতে কোমল কথা বলে ক্ষমা চেয়ে বিদায় দেয়া উত্তম। (২ ঃ ২৬৩)

৬. মানুষ মন্দ কথা বলে বেড়াক, তা আল্লাহ্ পসন্দ করেন না।–(৪ ঃ ১৪৮)

৭. তাদেরকে 'উহ' পর্যন্ত বলোনা এবং ধমক দিয়ে কথা বলোনা।(১৭ ঃ ২৩)

৮. হে ঈমানদারেরা ! তোমরা এমন কথা কেন বলো, যা করোনা। (৬১ ঃ ২)

৯. মিথ্যা কথা বলা থেকে আত্মরক্ষা করো। (২২ ঃ ৩০)

১০. এমন একটি কথাও নেই, যা (বিচারার্থে) সংরক্ষণ করার জন্যে একজন সদা প্রস্তুত রক্ষক উপস্থিত থাকে না। (৫০ ঃ ১৮)

১১. হে নবী ! তুমি মিথ্যাবাদীদের কাছে নত হয়ো না। (৬৮ ঃ ৮)

১২. হে নবী ! তুমি নত হয়ো না তাদের কাছে, যারা কথায় কথায় শপথ করে, যারা মর্যাদাহীন, যারা গীবত করে, যারা পরনিন্দা ও চোগলখুরী করে বেড়ায়, ভালো কাজে বাধা দেয়, ---- যারা চরম ঝগড়াটে ও হিংস্র। (৬৮ ঃ ১০-১৩)

১৩. ধ্বংস এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্যে, যে মানুষকে ধিক্কার দেয় এবং মানুষের নিন্দা করে বেড়ায়। (১০৪ ঃ ১)

এইতো শুনলেন মহান আল্লাহর সতর্কবাণী। এবার আসুন দেখি মহানবী (সা) মন্দ কথা সম্পর্কে কী বলেন ? হ্যাঁ, তিনি বলেছেন ঃ

১. মুমিন সে নয়, যে উপহাস করে, অভিশাপ দেয়, অশ্লীল ভাষায় কথা বলে এবং যে বাচাল।–(তিরমিযি)

২. কোনো কটুভাষী জান্নাতে প্রবেশ করবে না।–(আবু দাউদ)

৩. মুসলমানকে গালি দেয়া ফাসেকী।–(বুখারি ও মুসলিম)

৪. মুসলমান ভাইকে হেয় করাই পাপী হবার জন্যে যথেষ্ট।–সহীহ মুসলিম

৫. তোমরা অনুমান করে কথা বলো না। কারণ, অনুমান হচ্ছে জঘন্যতম মিথ্যা কথা।–(বুখারি ও মুসলিম)

৬. মুসলমান মুসলমানের ভাই। সে তার (দীনি) ভাইকে অপমানিত করে না।–(মুসলিম)

৭. তোমার ভাইয়ের বিপদে আনন্দ প্রকাশ করো না।–(তিরমিযি)

৮. মিথ্যা বলা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া কবীরা গুনাহ।-(বুখারি ও মুসলিম)

৯. যার মধ্যে চারটি স্বভাব আছে সে মুনাফিক ঃ আমানত রাখলে খেয়ানত করে, কথা বললে মিথ্যা বলে, অঙ্গীকার করলে ভঙ্গ করে এবং বিবাদ লাগলে গালাগাল করে।-(সহীহ বুখারি)

এছাড়াও আরো অনেক হাদীস আছে। সেগুলোতে বিভিন্ন রকম মন্দ কথার উল্লেখ করে সেগুলো উচ্চারণ করতে বারণ করা হয়েছে। তাই যারা আল্লাহ ও রসূলের প্রতি ঈমান রাখেন, মন্দ কথা থেকে বিরত থাকা তাদের কর্তব্য, তাদের ঈমানী দায়িত্ব। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা এবং তাঁর রসূল (সা) মন্দ কথা বলতে মানা করেছেন।

৬. কুবচনের কদর্যতা

কুবচন খুবই কদাকার। কুবচন বা মন্দ কথার হাত-পা আছে। জীবন আছে। মন্দ কথা রোগ জীবাণুর মতো। ওরা রোগ ছড়ায়। সমাজকে ধ্বংস করে। আমাদের সমাজে নারী পুরুষ অনেকেই মন্দ কথা বলে। কুবচনের অভ্যাস অনেকেরই আছে। অনেকেই অসুন্দর কথা বলে। কিন্তু মন্দকথা যে কতটা কদর্য, তা কি ভেবে দেখেছেন ? যে সমাজে বিভিন্ন রকম রোগ জীবাণু কিলবিল করে, সেখানে যেমন মানুষ শত রকম রোগগ্রস্ত হয়, ঠিক তেমনি যে সমাজের মানুষ মন্দ কথা বলে, সেখানেও শত রকম সামাজিক অনাচার সৃষ্টি হয়। মন্দ কথায়-

১. মানুষ অসন্তুষ্ট হয়, বেজার হয়, মনোকষ্ট পায়।
২. পারস্পরিক ঘৃণা-বিদ্বেষ সৃষ্টি হয়।
৩. সম্পর্ক বিনষ্ট হয়।
৪. আত্মীয়তা ছিন্ন হয়।
৫. বন্ধুতা বিনষ্ট হয়।
৬. শত্রুতা সৃষ্টি হয়।
৭. কলহ বিবাদ সৃষ্টি হয়।
৮. রাগারাগি, হানাহানি ও মারামারির সূত্রপাত হয়।
৯. মান ইজ্জত নষ্ট হয়।
১০. অশান্তি ও অস্থিরতা সৃষ্টি হয়।

দেখলেন তো, মন্দ কথা কতো অনিষ্ট ঘটায়। মন্দ কথা থেকে সাহাবায়ে কিরাম কঠোরভাবে আত্মরক্ষা করতেন। উমর (রা) বলেন, আমি একবার আবু বকরের (রা) বাড়ি গেলাম। গিয়ে দেখি তিনি নিজের জিহ্বা ধরে টানাটানি করছেন। আমি বললাম, আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন, আপনার কী হয়েছে ?

আবু বকর বললেন ঃ এ জিহ্বা আমাকে ডুবিয়েছে।' আবু বকর (রা) হয়তো কাউকেই কোনো অসুন্দর কথা বলে ফেলেছিলেন। আর তারই জন্যে এতোটা কঠোর আত্মসমালোচনা তিনি করলেন। আসুন আমরাও সবাই কুবচনের কদর্যতা থেকে আত্মরক্ষা করি।

৭. সুন্দর কথা বলার আসমানি তাকিদ

হ্যাঁ, মন্দ কথা ছাড়তে হবে, সুন্দর কথাই বলতে হবে। সুন্দর কথা, ভালো কথা ও সুবচন সকলের প্রিয়। আল কুরআনে বিভিন্নভাবে সুবচনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আসুন এবার দেখা যাক, সুন্দর কথা বলার তাকিদ আল্লাহ সুবহানাহু কিভাবে করেছেন ? দেখুন মহান আল্লাহর বাণী ঃ

১. হে ঈমানদার লোকেরা ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং সঠিক কথা বলো।-(৩৩ ঃ ৭০)
২. মানুষের সাথে ভালো কথা বলো, সুন্দর কথা বলো।-(২ ঃ ৮৩)
৩. তাদের সাথে দয়া, সহানুভূতি ও নম্রভাবে কথা বলো।-(১৭ ঃ ২৮)
৪. তাদের সংগে সম্মানের সাথে কথা বলো।-(১৭ ঃ ২৩)
৫. স্পষ্ট, সোজাসুজি ও সম্মানজনক কথা বলো।-(৩৩ ঃ ৩২)
৬. তাদের সাথে বিতর্কে লিপ্ত হয়ো না। তাদের উপদেশ দাও এবং তাদের সাথে হৃদয়স্পর্শী কথা বলো।-(৪ ঃ ৬৩)
৭. কেউ যখন তোমাকে সৌজন্যমূলক সম্ভাষণ (সালাম) জানাবে, প্রতি উত্তরে তুমি তাকে তার চাইতে উত্তম ধরনের সম্ভাষণ জানাও, কিংবা অন্তত ততোটুকু জানাও।-(৪ ঃ ৮৬)
৮. আমি দাউদের রাষ্ট্র ক্ষমতাকে পাকাপোক্ত করে দিয়েছিলাম এবং তাকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা আর স্পষ্ট ও অকাট্য কথা বলার যোগ্যতা।-(৩৮ ঃ ২০)
৯. তাদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে পূত-পরিচ্ছন্ন কথা বলবার।-(২২ ঃ ২৪)
১০. তখন আল্লাহ তাঁর রসূল ও মুমিনদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদের জন্যে ন্যায় ও বিবেক সম্মত কথা বলা কর্তব্য করে দিলেন, আর তারাই এ ধরনের কথা বলার অধিক উপযুক্ত।-(৪৮ ঃ ২৬)
১১. তোমরা দু'জন যাও ফেরাউনের কাছে, সে বিদ্রোহী হয়ে গেছে। আর তার সাথে কোমলভাবে কথা বলবে, যাতে করে সে উপদেশ গ্রহণ করে, কিংবা ভীত হয়ে যায়।-(২০ ঃ ৪৩-৪৪)

এগুলো তো সরাসরি আল কুরআনের বাণী। মহান আল্লাহর অমৃতবাণী। দেখলেন তো, মহান আল্লাহ সুন্দর, উত্তম ও পূত-পরিচ্ছন্ন কথা এবং সুবচনের

প্রতি কতোটা গুরুত্বারোপ করেছেন। করবেন-ইতো, কারণ, তিনি যে সুন্দর। প্রিয় নবী (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ সুন্দর, তিনি সৌন্দর্যকে ভালোবাসেন–Allah is beautiful and He loves beauty.

তিনি সুন্দর কথাকেই পসন্দ করেন আর অসুন্দর কথাকে করেন ঘৃণা। আসুন, আমরাও আল্লাহর রঙ ধারণ করি ! সুন্দর কথা বলি ! সুভাষী হই !

৮. সুবচন শ্রেষ্ঠ মানবিক গুণ

মানুষের যতো সেরা গুণ আছে, তন্মধ্যে অন্যতম হলো সুন্দর করে কথা বলার গুণ। শ্রেষ্ঠ মনীষীরা সুভাষী। তাঁরা সুন্দর করে কথা বলেন। তাঁরা সুবচনে সুভাষী। তাঁরা যেখানেই কথা বলেন, সেখানেই ফুটে উঠে রাশি রাশি ফুলের হাসি, স্নিগ্ধময় পরিবেশ। আমাদের প্রিয় নবী (স) ছিলেন শ্রেষ্ঠতম সুভাষী। তিনি সুন্দর করে কথা বলতেন। হৃদয় স্পর্শী কথা বলতেন। তাঁর কথা শুনলে শ্রোতার মনের কষ্ট দূর হয়ে যেতো, মুখে হাসি ফুটতো। তিনি কখনো মন্দের জবাবে মন্দ বলেননি। তিনি সবসময় মন্দ কথার জবাবে সুন্দর কথা বলতেন। তিনি ছিলেন সত্যভাষী, পূতভাষী, স্পষ্টভাষী, হিতভাষী, স্নিগ্ধভাষী, দৃঢ়ভাষী, শুদ্ধভাষী, সুভাষী। তাই তিনি ছিলেন সব মানুষের সেরা মানুষ।

সাহাবায়ে কিরাম সুভাষী ছিলেন। সুন্দর কথা দিয়ে তাঁরা বিশ্বজয় করেছিলেন। যেসব মনীষী বিশ্বজোড়া জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন, তাঁরা সবাই সুভাষী, কিংবা সুলেখক। তাঁরা সুন্দর ভাষায় কথা বলেন, কিংবা সুন্দর ভাষার কথা লিখেন।

৯. সুবচনের সুফল

পৃথিবীতে যতো আদর্শই প্রচারিত হয়েছে, তা হয়েছে সুন্দর কথা দিয়ে, সুবচন দিয়ে। অসুন্দর কথা ও কুবচন দিয়ে কখনো কোনো আদর্শ প্রচারিত হয়নি, প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বিশ্বের সব ভালো কাজই মানুষের মন জয় করে করতে হয়। আর সুন্দর কথার চেয়ে মানুষের মন জয় করার মোক্ষম কোনো উপায় নেই। সুন্দর কথার হাত পা আছে। জীবন আছে। সুন্দর কথায় শর্করার শক্তি আছে। ভিটামিনের মৃতসঞ্জীবনী আছে। আমিষের পুষ্টি গুণ আছে। সুন্দর কথায় রোগ জীবাণু ধ্বংসের ঔষধ আছে, এন্টিবায়োটিকের কার্যকরিতা আছে। একটি ভালো কথা একটি ভালো গাছের মতো যে গাছ অফুরন্ত ফল বিলিয়ে যায়। সুন্দর কথায়–

১. মানুষের মনোকষ্ট দূর হয়।

২. হতাশা, নিরাশা, দুশ্চিন্তা দূর হয়।

৩. মন খুশি হয়, সন্তুষ্ট হয়, তৃপ্ত হয়।
৪. মন সচেতন হয়, বিবেক জাগ্রত হয়।
৫. আবেগ, উৎসাহ, উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়।
৬. রাগ নিভে যায়, গোস্বা দমে যায়।
৭. শত্রুতা কেটে যায়, জিঘাংসা দূর হয়।
৮. বন্ধুতা গড়ে ওঠে, শত্রু বন্ধু হয়ে যায়।
৯. সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে, সৌহার্দ্য গড়ে উঠে।
১০. প্রভাব ও আকর্ষণ সৃষ্টি হয়।
১১. ভক্তি, শ্রদ্ধা বিনয় ভাব সৃষ্টি হয়।
১২. স্নেহ, ভালোবাসার সৃষ্টি হয়।
১৩. ঐক্য ও একতার বন্ধন গড়ে ওঠে।
১৪. রাগারাগি, হানাহানি মিটে যায়।
১৫. ইজ্জত আবরু নিরাপদ হয়, শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় থাকে।

১০. সুভাষী হোন

যারা সুভাষী, তারা সুভাষী হন তাদের ভাষা শৈলীতে, বাকশক্তিতে, বাচন ক্ষমতায়, বাক বৈদগ্ধে, বাচনভঙ্গী, বাকরীতিতে, শব্দ চয়নের দক্ষতায়, উচ্চারণ ভংগির বিশুদ্ধতায়, কথার সহজতায়, ভাষার সরলতায়, যবানের স্বচ্ছতায় এবং মঞ্জুভাষের মধুরতায়। আপনিও কি সুভাষী হতে চান? হতে চান কি প্রিয় ভাষী? তবে ঃ

১. সোজা কথা বলুন। বাঁকা কথা বলবেন না। পেঁচালো কথা বলবেন না।
২. সহজ করে কথা বলুন। ভাষার ও কথার জটিলতা পরিহার করুন।
৩. সুন্দর করে কথা বলুন। সব রকমের অসুন্দর ও মন্দকথা পরিহার করুন।
৪. হাসি মুখে কথা বলুন। প্রিয় নবী বলেছেন ঃ তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে কথা বলা একটি দান।”
৫. কোমল ভাষায় কথা বলুন। আল্লাহ তা'আলা তাঁর প্রিয় নবীকে বলেন ঃ এটা আল্লাহরই দয়া যে, তুমি তাদের (তোমার সাথিদের) প্রতি কোমল। তা না হয়ে তুমি যদি তাদের প্রতি কঠোর হতে, তাহলে তারা তোমার কাছ থেকে সিটকে পড়তো।-(আল কুরআন ৩ ঃ ১৫৯)
৬. সুন্দর সুন্দর শব্দ চয়ন করুন। মাতৃভাষাকে ভালোভাবে জানুন। শব্দ ভাণ্ডারে সমৃদ্ধ হোন। কথার মাঝে সুন্দর সুন্দর শব্দ প্রয়োগ করুন।
৭. হিত কথা বলুন। শ্রোতার কল্যাণের কথা বলুন, তার উপকারের কথা বলুন।

৮. স্পষ্টভাবে কথা বলুন। কথার জড়তা পরিহার করুন। মূসা (আ) আল্লাহর কাছে দু'আ করেছিলেন ঃ প্রভু ! আমার ভাষার জড়তা দূর করে দাও, যাতে তারা আমার কথা সুন্দরভাবে বুঝতে পারে।"-(কুরআন ২০ ঃ ২৫-২৮)

৯. বিশুদ্ধ কথা বলুন। অশুদ্ধ ভাষা ও শব্দ প্রয়োগ করবেন না। ভাষার আঞ্চলিকতা পরিহার করুন।

১০. প্রশংসা করুন। লোকদের কৃতিত্ব ও অবদানের জন্যে তাদের প্রশংসা করুন। তোয়াজ ও চাটুকারিতা করবেন না।

১১. কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। যে আপনার উপকার করেছে, তাকে কৃতজ্ঞতা জানান। প্রিয় নবী (স) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না, সে আল্লাহরও কৃতজ্ঞ হয় না।"-(আবু দাউদ)

১২. উপদেশ দিন। পরামর্শ দিন।

১৩. পরামর্শ নিন। আপনার ব্যাপারে শ্রোতার কোনো কথা, কোনো পরামর্শ আছে কিনা, তা জানতে চান। পরামর্শ দানের জন্যে কৃতজ্ঞতা জানান।

১৪. শ্রোতার জন্যে দু'আ করুন। আপনার শুভ কামনার কথা তাকে বলুন।

১৫. সদালাপী ও মিষ্টভাষী হোন।

১৬. বিতর্ক পরিহার করুন। যুক্তি সংগত কথা বলুন।

১৭. বলুন কম, শুনুন বেশি।

১৮. অর্থবহ কথা বলুন, অর্থহীন বাজে কথা বলবেন না।

১৯. একজনের কাছে আরেকজনের নিন্দা করবেন না। পেছনে কেবল প্রশংসাই করবেন, নিন্দা নয়।

২০. শ্রোতাকে কখনো বিদ্রূপ, উপহাস, ঠাট্টা ও তিরস্কার করবেন না।

২১. কথার মাঝে কখনো কখনো বৈধ রসিকতা করবেন।

২২. কখনো কটুকথা বলবেন না।

২৩. বেশি কথা, অনর্গল কথা বলা ও কথার খৈ ফুটানো বর্জন করুন।

২৪. গালি দেবেন না, অশ্লীল কথা বলবেন না। ভাষার পবিত্রতা রক্ষা করুন।

২৫. পজেটিভ কথা বলুন। নেগেটিভ কথা পরিহার করুন।'

২৬. রুক্ষ, কর্কশ ও কড়া কথা পরিহার করুন।

২৭. মিথ্যা বলবেন না, অপবাদ দেবেন না, বেশি বেশি শপথ করবেন না।

২৮. ছিদ্রান্বেষণ করবেন না, কারো দোষ খুঁজে বের করবেন না।

২৯. চেঁচামেচি, তর্জন গর্জন ও গলা ফাটানী বর্জন করুন।

৩০. ঘ্যান ঘ্যান, প্যান প্যান পরিত্যাগ করুন।

৩১. আপনি পুরুষ হয়ে থাকলে মেয়েলি ধরনের কথাবার্তা বর্জন করুন। আর মহিলা হয়ে থাকলে পুরুষালি কথাবার্তা বলবেন না।

১১. ও রকম নয়, এ রকম বলুন

আসুন, আমরা কথার ধরন পাল্টে ফেলি। কথাকে শুদ্ধ, সংস্কৃত ও মানানসই করি। কথাকে সুন্দর, চমৎকার ও আকর্ষণীয় করি। ওভাবে নয়, এভাবে বলি ঃ

এভাবে নয়	এভাবে বলি
১. আপনি কিছুই জানেন না।	১. আপনি অনেক কিছু জানেন।
২. আমি সবার চেয়ে বেশি জানি।	২. তিনি আমার চেয়ে বেশি জানেন।
৩. আপনি মিথ্যা বলছেন।	৩. আপনার কথা ঠিক নয়।
৪. আপনি বাজে কথা বলছেন।	৪. আপনার কথা যুক্তিসংগত নয়।
৫. আপনি কিছুই করেননি।	৫. প্রতিভা দিয়ে আপনি আরো অনেক কিছু করতে পারতেন।
৬. এখন কথা বলার সময় নেই।	৬. আপনার সাথে পরে কথা বলবো।
৭. আমাকে জায়গা দিন।	৭. দয়া করে আমাকে একটু জায়গা দেবেন কি ?
৮. তার কথা মিথ্যা।	৮. তিনি ঠিক বলেননি।
৯. আসুন/আসবেন।	৯. দয়া করে আসবেন কি ?
১০. আমি ভুল করিনি।	১০. আমার ভুল হতে পারে।
১১. আমাকে ছাড়া এ কাজ হতো না।	১১. এ কাজে আমরা চেষ্টা করেছি।
১২. এই যে কয়টা বাজে ?	১২. দয়া করে সময়টা বলবেন কি ?
১৩. আমার সাথে দেখা করুন।	১৩. দয়া করে একটু আসবেন কি ?
১৪. কাজটা খারাপ হয়েছে।	১৪. কাজটা আরো ভালো করা যেতো।
১৫. আমি যা বলছি, সেটাই ঠিক।	১৫. আপনার মত/পরামর্শ কি ?
১৬. তোমার কাজ ভালো।	১৬. আমরা তোমাকে নিয়ে গর্বিত।
১৭. তোমার কাজটা মন্দ নয়।	১৭. তোমার কাজটি প্রশংসনীয়।
১৮. এ কাজ তুমি পারবে না।	১৮. তোমার পক্ষে এ কাজ করা সম্ভব।
১৯. তোমার নাম ?	১৯. তোমার সুন্দর নামটি কি ?
২০. ভালো তো !	২০. আপনি ভালো আছেন ?

২১. সেলাম !	২১. আস্সালামু আলাইকুম।
২২. ওয়ালেকুম সালাম।	২২. ওয়ালাইকুম সালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।
২৩. হ্যালো !	২৩. আসসালামু আলাইকুম।
২৪. আমি অন্যদের চেয়ে খারাপ নই।	২৪. আমাকে আরো ভালো হতে হবে।
২৫. কেউই জানে না।	২৫. আসুন আমরা জানার চেষ্টা করি।
২৬. আপনার বাড়ি কোথায় ?	২৬. আপনার পরিচয় জানতে পারি কি?
২৭. এ-তো কিছুই হয়নি।	২৭. আরো সুন্দর হতে পারতো।
২৮. আমার সাথে এসো।	২৮. আমার সাথে যাবে কি ?
২৯. আমি করবো।	২৯. ইনশাআল্লাহ্ আমি করবো।
৩০. ব্যাপারটা ঝুঁকিপূর্ণ।	৩০. এটা একটা সুযোগ।
৩১. এতে অনেক সমস্যা আছে।	৩১. এটা একটা চ্যালেঞ্জ।
৩২. আমি এ ব্যাপারে নিশ্চিত।	৩২. আমি এ ব্যাপারে আগ্রহী।
৩৩. আমার কাজ এ রকমই।	৩৩. আমি আরো ভালো করার চেষ্টা করছি।
৩৪. আমি কোনো সহানুভূতি পাইনি।	৩৪. আমি আপনার সহানুভূতি কামনা করি।
৩৫. এ রকম ভুলচুক হয়ই।	৩৫. এ ভুলের জন্য আমি দুঃখিত।

১২. সম্মান দিন স্বীকৃতি দিন

যখনই কারো সাথে কথা বলবেন, তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে কথা বলুন। তাঁর গুণাবলী ও কৃতিত্বের স্বীকৃতি দিন। আপনার উপকার করার জন্যে, সহযোগিতা করার জন্যে এবং আপনার কথা শুনার জন্যে তাকে ধন্যবাদ দিন, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। এভাবে বলুন ঃ

১. আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ।	1. Thank you a lot.
২. দয়া করে বলবেন কি !	2. would you please tell me?
৩. আমি আপনার কাছে কৃতজ্ঞ।	3. Iam grateful to you.
৪. আমি দুঃখিত।	4. I am sorry.
৫. আমাকে একটু সাহায্য করবেন কি ?	5. Would you please help me ?

৬. আমি আপনার কাছে ঋণী।	6. I am grateful to you.
৭. আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ।	7. I am highly obliged.
৮. আপনার মত কি ?	8. What is your opinion ?
৯. আমি তোমার জন্য গর্বিত।	9. I am proud of you.
১০. আমি আপনার প্রচেষ্টার প্রশংসা করি।	10. I appreciate your effort.
১১. আপনি খুব ভাল/সুন্দর।	11. You are so fine.
১২. আমি খুবই সন্তুষ্ট হয়েছি।	12. I am highly pleased.
১৩. আপনার সাহায্য আমার প্রয়োজন।	13. I need your help.
১৪. তুমি খুব ভালো ছেলে !	14. You are a nice boy.
১৫. তুমি খুব সুন্দর করেছো !	15. Well done !
১৬. আপনার সাফল্যের জন্যে অভিনন্দন !	16. Congratulations on your success.
১৭. আপনি চমৎকার রান্না করেছেন।	17. You have cooked excellent !
১৮. আপনার পসন্দ চমৎকার !	18. Your choice is excellent.
১৯. আপনি অনেক অবদান রাখতে পারেন।	19. You can contribute a lot.
২০. আপনি খুবই দয়ালু !	20. So kind/nice of you.
২১. আপনি দীর্ঘজীবি হোন !	21. May you live long.
২২. তিনি সত্যি ভালো।	22. Really he is good/nice.
২৩. আল্লাহ্ আপনার মঙ্গল করুন !	23. May Allah bless you.

১৩. সুন্দর কথা বলার জন্যে চাই সুন্দর মন

পরিশেষে মন সম্পর্কে ক'টি কথা বলি। ব্যাপারটা হলো, সুন্দর কথা এমনি এমনি বলা যায় না। সুন্দর কথা বলার জন্যে চাই সুন্দর মন। অসুন্দর মন থেকে সুন্দর কথা বেরোয় না। কারণ, কথা তো মনোভাবেরই প্রকাশ।

অনেকে তাদের বহিরাঙ্গকে সাজাতে সচেষ্ট থাকে, কিন্তু অন্তরঙ্গের সৌন্দর্যের কথা ভুলে থাকে। ফলে তাদের বাহ্যিক চাকচিক্যে মানুষ চকিত হয় বটে, কিন্তু তাদের অসুন্দর মন থেকে প্রকাশিত কদর্য কথার ক্রিয়ায় কোকিলও কপাল কুঞ্চিত করতে কুণ্ঠিত হয় না।

তাই মনকে সুন্দর করতে হবে আগে। আর মনকে সুন্দর করতে হলে, প্রথমেই তাকে অসুন্দর থেকে মুক্ত করতে হবে। মন থেকে বহিষ্কার করতে হবে সমস্ত অসুন্দরের বীজ। গোছা ধরে টেনে উপড়ে ফেলে দিতে হবে অসুন্দরের সমস্ত চারা। অসুন্দরের বীজ আর চারা আপনি চেনেন কি? এই যে চিনে নিন ঃ

অজ্ঞতা, অন্ধতা, অচৈতন্য, গোঁড়ামি, গোঁয়ার্তুমি, হিংসা, বিদ্বেষ, অহংকার, ঘৃণা, লোভ, লালসা, কৃপণতা, নির্দয়তা, নির্মমতা, নিষ্ঠুরতা, পাষণ্ডতা, কাঠিন্য, হতাশা, কুসংস্কার, কুচিন্তা, স্বার্থপরতা, ক্রোধ, কুরুচি, বক্রতা, নির্লজ্জতা, সংকীর্ণতা, নির্বুদ্ধিতা, অসভ্যতা, অশিষ্টতা, অভদ্রতা, অশ্রদ্ধাবোধ, আত্মকেন্দ্রিকতা, লাগামহীনতা, অসংযম, অসততা, মিথ্যা প্রিয়তা, কুটিলতা, কুধারণা ইত্যাদি।

এগুলো মনকে কলুষিত করে রাখে। যার মনের মধ্যে এগুলো দানা বেঁধে থাকে, তার মন হয়ে যায় অসুন্দর। ফলে তার পক্ষে সুন্দর কথা বলা সহজ হয় না। তাই আপনি আপনার মন থেকে এগুলো বের করে দূরে নিক্ষেপ করুন। এগুলো থেকে মনকে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র করে ফেলুন।

এভাবে মনকে সুন্দর করুন। মনের মধ্যে সবরকম সুন্দরের বীজ বপন করুন। সহজেই পাবেন সুন্দরের বীজ। কিনতে পয়সা লাগে না। শুধু সংকল্প করলেই পেয়ে যাবেন সুন্দরের বীজ, সুন্দর কথার বীজ। এই যে এখানে দিয়ে দিচ্ছি আপনাকে কিছু সুন্দর কথার বীজ।

জ্ঞান, বুঝ, বুদ্ধি, বিবেক, বিবেচনা, আদব, লেহায, মনন, মনীষা, মাধুর্য, মহত্ত্ব, মনোযোগ, মনোচক্ষু, মহববত, মমত্ব, অনুভূতি, ঔদার্য, আশা, অভিলাষ, অভিপ্রায়, অমায়িকতা, অভিরুচি, অন্তরংগতা, প্রসন্নতা, প্রাণাবেগ, প্রাণবন্ততা, সৌজন্য, সুরুচি, সুধারণা, সুবাসনা, শিষ্টতা, শালীনতা, সদিচ্ছা, সংযম, সহানুভূতি, শ্রদ্ধাবোধ, সহজতা, সজীবতা, সরলতা, সচেতনতা, সমঝোতা, সহমর্মিতা, সত্যপ্রিয়তা, সংবেদনশীলতা, সহৃদয়তা, স্বতঃস্ফূর্ততা, সততা, সভ্যতা, স্বকীয়তা, সক্রীয়তা, শুভেচ্ছা, শ্লীলতাবোধ, দয়া, মায়া, মানবিকতা, বদান্যতা, মহানুভবতা, উদারতা, বন্ধু সুলভতা, হৃদ্যতা, মনোজ্ঞতা, মংগলাকাংখা, তুষ্টি, কৃতজ্ঞতা, সহনশীলতা, স্নেহপরায়ণতা, ভদ্রতা, নম্রতা, কল্যাণ কামিতা, হিতাকাংখা ইত্যাদি।

এগুলো সুন্দর কথার বীজ। এগুলো যদি আপনার মনের মধ্যে বপন করতে পারেন, আপনার মন হয়ে উঠবে সুন্দর, স্বচ্ছ, তরতাজা, অনাবিল। তখন

সহজেই আপনি বলতে পারবেন সুন্দর কথা। শুধু তাই নয়, আপনার মনের মধ্যে এ বীজগুলো শিকড় গেড়ে গজিয়ে উঠলে আপনার মুখ দিয়ে আর মন্দ কথা বেরুবেই না। এগুলো সুন্দর কথার চাবিকাঠি। হয়তো বা জাদু কাঠি।

এ যাবত আমরা সুন্দর কথা সম্পর্কে বেশ কিছু কথা বলার চেষ্টা করেছি। অবশ্য সব কথাই বলা হয়নি। তবে যে কথাগুলো বলা হলো, সেগুলোকে ভিত্তি করে আপনি নিজেই সুন্দর কথার বাগানে আরো অনেক ফুলের চাষ করতে পারেন।

এতোক্ষণ যা কিছু বলা হলো, এগুলোই সুভাষীর জন্যে নির্দেশিকা। এগুলো অনুশীলন করুন, অচিরেই আপনি সুভাষী হয়ে উঠবেন। আপনার শ্রোতাদের কাছে আপনি হয়ে উঠবেন প্রিয়ভাষী। আপনার কথার আকর্ষণ, আপনার আহ্বানের প্রভাব শ্রোতাদের মন-মগজকে সম্মোহিত করে তুলবে। আপনার আদর্শকে প্রচার, প্রসার ও বিজয়ী করার জন্যে আপনাকে অবশ্যি সুভাষী হতে হবে। প্রিয় ভাষী হতে হবে। আসুন আমরা সবাই সুভাষী হই।
(রচনাকাল ঃ ১৯৯৭)

৩

নিজেকে জাগান সময় কাজে লাগান

১. কিভাবে ধরা দেয় সময় ?

মহান আল্লাহর সৃষ্টি এই মহাবিশ্ব (The Universe)। তাতে রয়েছে কতো ছায়াপথ আর কতো যে নক্ষত্র রাজি ! আমাদের মাথার উপরের এই সূর্য একটি নক্ষত্র। মহান প্রভুর নির্দেশে সে চলছে নিরবধি নিজ কক্ষপথে। গ্রহ, উপগ্রহ, ধুমকেতু, উলকা ইত্যাদি নিয়ে তার আছে একটি পরিবার। সূর্যের এ পরিবারকে আমরা বলি সৌর পরিবার। পৃথিবী, শুক্র, শনি, মংগল, বুধ, বিষ্যুদ, ইউরেনাস, নেপচুন, প্লুটো ইত্যাদি হলো সূর্যের গ্রহ। এরা সূর্যের চারদিকে ঘুরছে। কারো ঘুরবার কক্ষপথ সূর্যের কাছাকাছি। আবার কারো কক্ষপথ দূরে বহুদূরে। সূর্যের চারদিকে চক্কর দিয়ে আসতে ওদের সময় লাগে। কক্ষপথ কারো দূরে দিয়ে এবং কারো কাছে দিয়ে হবার কারণে কারো বেশি কারো কম সময় লাগে। আবার গতিও কারো বেশি কারো কম। এ কারণে সূর্যকে চক্কর দিয়ে আসতে ওদের বিভিন্ন জনের বিভিন্ন রকম সময় লাগে।

আমরা পৃথিবীর অধিবাসী। ও আমাদের গ্রহ। আমাদের বুকে পিঠে নিয়ে সে চলছে আর চলছে। ৩৬৫ দিন ৬ ঘন্টায় সে সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করে। সূর্য থেকে ওর গড় দূরত্ব ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল। একবার নিজ অক্ষপথ অতিক্রম করতে ওর সময় লাগে ২৩ ঘন্টা ৫৬ মিনিট ৪.০৯ সেকেণ্ড। ওর নিজ অক্ষপথের এক ঘুর্তিকে আমরা এক কথায় ২৪ ঘন্টা বলে থাকি। এই ২৪ ঘন্টার ঘুর্তিতে ওর বুকে পিঠের লোকেরা কেউ সূর্যের আড়ালে আবার কেউ সূর্যের মুখোমুখি হয়ে পড়ে। সূর্যের আড়ালে থাকাকে আমরা রাত আর মুখোমুখি থাকাকে বলি দিন।

সূর্য চলছে তার কক্ষ পথে আর পৃথিবী চলছে তার অক্ষপথে। ফলে আমরা পাচ্ছি দিনরাত, বছর। আমাদের কাছে ধরা দিচ্ছে সময়। এভাবেই আমরা দেখছি সময়, পাচ্ছি সময়। সময় আমাদের থেকে চলে যাচ্ছে দূরে বহু দূরে, পিছে অনেক পিছে, সুদূর অতীতে। সময় আমাদের জীবনে আসছে শুধু আসছে, অবিরাম সে আসছে। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

"তিনি সূর্যকে আলোক আর চাঁদকে আলোকময় করেছেন এবং তার কক্ষপথও নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, যাতে করে তোমরা বছর ও তারিখ গণনা

করতে পারো। আল্লাহ সবকিছু সঠিকভাবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি জ্ঞানীদের জন্যে নিজের নিদর্শন বিশদভাবে বর্ণনা করেন। রাতদিনের আবর্তন আর মহাবিশ্ব ও পৃথিবীতে যা কিছু সৃষ্টি করেছেন, তাতে বিবেকবানদের জন্যে রয়েছে নিদর্শন।"-(সূরা ইউনুস ঃ ৫-৬)

সূর্য চলছে, পৃথিবী চলছে আর আমাদের আয়ু যাচ্ছে ফুরিয়ে। আমাদের জীবন থেকে চলে যাচ্ছে সময়। সময় আমাদের নিয়ে যাচ্ছে মৃত্যুর দিকে, নিয়ে যাচ্ছে কিয়ামতের দিকে।

২. সময় আমাদের বড় চেনা

আমি, আপনি, তিনি-আমরা সবাই সময়কে খুব ভালো করে চিনি। সময় বুঝাবার জন্যে আমাদের সমাজে এবং আমাদের দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বেশ কিছু শব্দ প্রচলিত আছে। যেমন ঃ সময়, কাল, অক্ত (ওয়াক্ত), মুহূর্ত, ক্ষণ, সময়কাল, ক্ষণকাল, টাইম, দণ্ড, আমল, লগ্ন, বেলা, মেয়াদ, ইদ্দত, মুদ্দত, সেকেণ্ড, মিনিট, ঘন্টা, দিন, রাত, মাস, বছর, যুগ, শতাব্দী, নিমেষ, লহমা, পলক, ক্ষণিক, ঝলক, তিথি, ঘড়ি প্রহর প্রভৃতি।

সময়ের আবার অতীত বর্তমান ভবিষ্যত আছে। আদি অন্ত আছে। আউয়াল আখের আছে। শুরু আছে শেষ আছে। ধীর আর দ্রুত গতি আছে। স্বল্পকাল চিরকাল আছে। সমকাল মহাকাল আছে। বিলম্ব অবিলম্ব আছে। বিরাম অবিরাম আছে। দীর্ঘকাল হ্রস্বকাল আছে। আগ পর আছে। সেকাল একাল আছে। পূর্ব অপূর্ব আছে। বিগত আছে, আগত আছে। সকাল আছে, বিকাল আছে।

এভাবে সময়ের যতোকাল আছে সবই কালে কালে মহাকালের গর্ভে সেকাল হয়ে যায়। মানুষের জীবনটাও আসলে কাল। দিবাকাল, নিশিকাল চিরকাল মানব জীবনে বয়ে আনে বাল্যকাল যৌবনকাল বৃদ্ধকাল। এ কালই হয় মানুষের কাল। এ কালই নিয়ে যায় মানুষকে ইহকাল থেকে পরকাল। তাই এ সময় এ কাল আমাদের বড় চেনা, আমাদের একান্ত জানা।

৩. সময়ই জীবন

আসলে সময়ই জীবন। এতোক্ষণ আমরা যা কিছু আলোচনা করলাম, তা আমাদের পরিষ্কার বলে দিচ্ছে, সময়ই জীবন। একবার এক ছোট্ট পিচ্চিকে আমি শিখাচ্ছিলাম ঃ পানির অপর নাম জীবন। সাথে সাথে সে আমাকে পাল্টা প্রশ্ন করলো, তাহলে জীবনের অপর নাম কি ? ওর আকস্মিক প্রশ্নে আমি প্রথমটায় ভড়কে গেলেও ব্রেইন কম্পিউটারটা ঠিকমতোই নির্দেশনা দিলো। তাই অবিলম্বে বলে দিলাম ঃ জীবনের অপর নাম সময়।

কারো মরণ লক্ষণ দেখা দিলে আমরা বলি অমুকের 'সময়' শেষ। অমুকের সময় ফুরিয়ে গেছে। অমুকের আর সময় নেই। এভাবে 'সময়' বলতে আমরা জীবন বুঝাই।

সময় অসীম অন্তহীন। সময় কবে শুরু হয়েছে, কবে শেষ হবে তা আমরা জানি না। কিন্তু জীবন সীমিত। সময় জীবন সূচিত করে। সময় জীবন বিলীন করে। সময়ের গর্ভে মানুষের জন্ম। সময়ের গর্ভে মানুষের মৃত্যু। আর এ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময়টাই মানুষের জীবন। মূলত, সময় আর জীবন একাকার হয়ে আছে।

জীবন বুঝাবার জন্যে আমরা সময় উল্লেখ করি। আমরা বয়সের কথা বলি। আমরা বলি, অমুকের বয়স এতো ঘন্টা, অমুকের বয়স এতো মাস, অমুকের বয়স এতো বছর। অর্থাৎ জীবন বুঝাবার জন্যে আমরা সময় নির্দেশ করছি। যার জীবনের কোনো সময় উল্লেখ করা যায় না, তার মৃত্যু হয়েছে জন্মের আগেই। তাই সময়ই জীবন।

৪. জীবন খুব ছোট

মানুষের জীবনকাল সীমাবদ্ধ। মানুষ বেশি দিন জীবন ধরে রাখতে পারে না। আমাদের জীবন সম্পর্কে দু'টি অমোঘ সত্য হলো ঃ

১. মানুষের আয়ুষ্কাল খুবই সীমিত। বেশির পক্ষে সত্তর-আশি-এক শ' বছর। অতপর তার মৃত্যু অবধারিত।

২. কোনো মানুষই জানে না তার মৃত্যু কতো বয়সে হবে, কতো দিন সে বেঁচে থাকবে?

হ্যাঁ, মানুষের জীবন দীর্ঘ নয়, হ্রস্ব। সে মরণশীল। তাকে মরতেই হবে ঃ

"প্রত্যেক ব্যক্তিকেই মরতে হবে।–(সূরা আল আনকাবূত ঃ ৫৭)

"তুমি মরবে, তারাও মরবে।"–(সূরা যুমার ঃ ৩০)

কিন্তু কে কবে কখন কোথায় মরবে তা কেউ জানে না। আল্লাহ প্রত্যেকেরই মৃত্যুর সময় নির্দিষ্ট করে রেখেছেন। তার আগেও সে মরবে না পরেও নয়। মহান আল্লাহ বলেন ঃ

"আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ মরতে পারবে না। প্রত্যেকের মৃত্যুর সময়টি সুনির্দিষ্ট রয়েছে।"–(সূরা আলে ইমরান ঃ ১৪৫)

"কেউই জানে না তার মরণ কোথায় হবে।"–(সূরা লুকমান ঃ ৩৪)

পরিষ্কার বুঝা গেলো, আমরা মরণকে সাথে নিয়েই চলছি। যে কোনো সময় যে কোনো স্থানে আমাদের জীবনের অবসান ঘটতে পারে। অল্প বয়সেও মৃত্যু হতে পারে। মধ্যম বয়সেও মৃত্যু হতে পারে। কারো মৃত্যু আবার বৃদ্ধ বয়সেও হতে পারে।

তবে বৃদ্ধ বয়সে উপনীত হলে মানুষ আবার শিশু বয়েসের মতোই অথর্ব অকর্মণ্য হয়ে পড়ে। মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

"আমরা যাকে বৃদ্ধ বয়সে নিয়ে যাই, তার দেহ কাঠামোকে একেবারে বদলে দিই।"–(সূরা ইয়াসীন ঃ ৬৮)

"আল্লাহ তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনিই তোমাদের মৃত্যু দেন। আর তোমাদের কাউকে কাউকেও নিকৃষ্টতম বৃদ্ধ বয়সে পৌঁছে দেয়া হয়, তখন সবকিছু জানার পরও যেনো কিছুই জানে না।"–(আন নাহল ঃ ৭০)

তাই আমাদের জীবন খুব ছোট। জীবনকে কাজে লাগাবার সময় খুব কম। যারা পঞ্চাশের বেশি বয়স পান, তাদের জীবনকে কাজে লাগাবার সর্বোত্তম সময় কুড়ি বছর। অর্থাৎ ত্রিশ থেকে পঞ্চাশ বছর বয়স পর্যন্ত। ত্রিশের আগ পর্যন্ত বয়সটা থাকে আসলে নিজেকে দক্ষতার সাথে কাজে লাগাবার মতো করে গড়ে তুলবার প্রস্তুতিকাল। আর পঞ্চাশ থেকে ষাট পর্যন্ত বয়সে জীবনকে কাজে লাগানো গেলেও পঞ্চাশ পূর্ব বয়েসের মতো এনার্জি থাকে না। আবার উত্তম কুড়ি বছরকেও জ্ঞানীরা দু' ভাগে ভাগ করেছেন। ত্রিশ থেকে চল্লিশ এই প্রথম দশ বছরের কাজ থাকে কিছুটা কাঁচা আর পরবর্তী দশ বছরের কাজই হয় মূলত পাকা ও মজবুত। ত্রিশ পর্যন্ত বয়সটা প্রবল উদ্যমী থাকে। এ সময় অভিজ্ঞদের গাইডে চললে এ সময়ও অনেক অবদান রাখা যায়।

মোটকথা, জীবন আমাদের ছোট। কাজ করবার এবং অবদান রাখবার সময় আমাদের কম। কাজ, কর্তব্য এবং দায়িত্ব অনেক বেশি। অর্থাৎ জীবন ছোট, সময় কম, কাজ অনেক।

৫. সময় নষ্ট করবেন না

সময় চলে যায়। সময়কে ধরে রাখা যায় না। সে কারো জন্যে অপেক্ষা করে না। ইংরেজীতে একটা কথা আছে ঃ Time and tide wait for none. চলে যাওয়া সময় আর কখনো ফিরে আসে না। আর সময় যেহেতু জীবন, তাই কথাটা এভাবে বলা যায়, চলে যাওয়া জীবন আর ফিরে আসে না। জীবনের শৈশব, কৈশোর, তারুণ্য, যৌবন চলে যাবার পর আর কখনো ফিরে আসে না।

তাই সময় অকারণে হারাবেন না। সময় নষ্ট করবেন না। সময়ের কাজ সময়ে করুন। সময় চলে যাবার পর কেবল আফসোস করা যায়, হারানো সময়কে ফিরে পাওয়া যায় না। সময় সম্পর্কে ইংরেজিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আছে ঃ

> "What is the longest, yet the shortest ; the swiftst, yet the slowest ; all of us neglect it, and then we all regret it. Nothing can be done without it, it swallows up all that is small and it builds up all that is great ?"

এর জবাব হলো ঃ It is time. সুতরাং হেলায় সময় হারাবেন না। সময় হারালে পরে পস্তাতে হয়। সময়ের মূল্য অনেক, বরং সময় অমূল্য ধন। যে সময়কে মূল্য দিতে জানে না, সে মূল্যহীন। আর যে সময়ের মূল্য দিতে জানে, সেই মূল্যবান।

৬. এমনি এমনি আমাদের সৃষ্টি করা হয়নি।

মহান সৃষ্টিকর্তা আমাদেরকে অকারণে সৃষ্টি করেননি। এমনি এমনি এ সুন্দর জীবন আমাদের দান করেননি। তিনি বলেন ঃ

> "তোমরা কি মনে করেছো, আমি তোমাদের অকারণে সৃষ্টি করেছি, আর কখনো আমার কাছে তোমাদের ফিরে আসতে হবে না ?"−(সূরা আল মুমিনুন ঃ ১১৫)

না, মহান আল্লাহ অকারণে আমাদের সৃষ্টি করেননি। তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, তাঁর হুকুম পালন করার জন্যে এবং তাঁরই ইচ্ছে মতো এ পৃথিবীটাকে সাজাবার ও পরিচালনা করার জন্যে। প্রথম কাজটির নাম ইবাদত আর দ্বিতীয় কাজটির নাম খিলাফত। অর্থাৎ আল্লাহর ইবাদত এবং তাঁর খিলাফত বা প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করবার জন্যেই তিনি আমাদের সৃষ্টি করেছেন, আমাদের জীবন দান করেছেন এবং এ পৃথিবীতে আমাদের পাঠিয়েছেন। তাঁর অর্পিত এ দায়িত্ব পালন করে, তাঁকে আমাদের সন্তুষ্ট করতে হবে। তাঁকে সন্তুষ্ট করাই হবে জীবনের লক্ষ্য। অতপর যখন আমরা তাঁর কাছে ফিরে যাবো, তখন যেনো দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে তিনি আমাদের উপর খুশি থাকেন।

মহাপরাক্রমশালী মহান আল্লাহর দাসত্ব করা এবং এ পৃথিবীতে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করা যে কতো বড় দায়িত্ব, তা কি আমরা ভেবে দেখেছি ? তাছাড়া এটা যে আমাদের জন্যে কি বিরাট মর্যাদার ব্যাপার তাও কি আমরা উপলব্ধি করছি ?

তাই বলছি, আমাদের কর্তব্য অনেক বড়, দায়িত্ব অনেক বিরাট। করণীয় কতো যে কাজ ! এ দুটো দায়িত্ব ও কর্তব্য সঠিকভাবে বুঝে নেয়া এবং যথাযথভাবে পালন করা যা তা কাজ নয়।

৭. সময় কাজে লাগান

জীবনকে লক্ষ্যে পৌছাবার জন্যে সময়কে কাজে লাগান। জীবনে যারা সাফল্য লাভ করেন তারা কাজ করে সময় কাটান। সময়কে তারা কাজের সাথে adjust করে নেন। অলস লোকেরা সময়কে কাজে লাগাবার কষ্ট স্বীকার করে না। ফলে তাদের জীবনে তেমন কিছু অর্জিত হয় না। তাদের জীবন ব্যর্থ হয়ে যায়।

যারা জীবনকে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য পথে পরিচালিত করেন, তাদের পক্ষেই সময়কে যথাযথ কাজে লাগানো সম্ভব। আর যাদের জীবন লক্ষ্যহীন, বিভ্রান্ত, সময়ের সদ্ব্যবহার তাদের পক্ষে অসম্ভব।

প্রথম দলের লোকেরা তাদের করণীয় অবিলম্বে করতে শুরু করে। তাদের কাজের সময় হলো 'আজ' 'এখন' 'অবিলম্বে'। তাদের দৃষ্টিতে Killing time is not just a crime, it's a murder. 'আমার সময় নেই'–একথাটা তারা কখনো উচ্চারণ করেন না। তাঁরা এভাবে বলেন ঃ এ কাজের চাইতে আমার ঐ কাজটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

দ্বিতীয় দলের লোকেরা তাদের কাজ এবং তাদের করণীয় সময় মতো করে না। সাধারণত তাদের কাজের সময় হলো ঃ কাল, এখন নয়, পরে দেখা যাবে, অন্য সময়।

প্রিয় রসূল (স) বলেছেন ঃ

"প্রতিদিন প্রত্যুসে দু'জন ফেরেশতা ডেকে বলে ঃ হে আদম সন্তান ! আমি একটি নতুন দিন। তোমাদের কর্মের আমি সাক্ষী। তাই আমাকে কাজে লাগাও, আমার থেকে উপকৃত হও। কিয়ামত পর্যন্ত আমি আর ফিরে আসবো না।"

তাই, সময় থাকতে সময় কাজে লাগান।

৮. সময় কাজে লাগাবার আসমানি তাকিদ

অথচ সময় যারা কাজে লাগায় না, তাদের চাইতে বড় ক্ষতিগ্রস্ত কেউ নেই। আমাদের দেশে অনেক লোক আছেন যারা সময়কে কি কাজে লাগাবেন, তা খুঁজে পান না। আসলে সময়কে কাজে লাগাবার কোনো প্রোগ্রাম পরিকল্পনা তাদের নেই। জীবনকে তারা কোথায় নিয়ে যেতে চান, সে গন্তব্য তারা

স্থির করেননি। মহান আল্লাহ সময়কে কাজে লাগাবার কড়া তাকিদ করেছেন। তিনি বলেন ঃ

"সময়ের শপথ ! মানুষ বড় ক্ষতির মধ্যে আছে। তবে (এ ক্ষতি থেকে তারাই বাঁচবে) যারা ঈমান আনে, সংস্কার সংশোধনের কাজ করে, পরস্পরকে সত্য গ্রহণের উপদেশ এবং ধৈর্যধারণের পরামর্শ দেয়।"-(সূরা আল আসর)

এখানে আল্লাহ সময়কে চারটি মৌলিক কাজে লাগাবার কথা বলেছেন। চারটির প্রতিটি দফাই ব্যাপক অর্থবহ। এসব কাজে আত্মনিয়োগ করে যারা সময়কে কাজে লাগাবে না, তারা নিশ্চিত ক্ষতি ও ধ্বংসের পথে অগ্রসর হয়।

একবার রসূলুল্লাহর (স) সাহাবী আবু যর (রা) তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিলেন, ইবরাহীম আলাইহিস সালামের প্রতি অবতীর্ণ গ্রন্থাবলীতে কী শিক্ষা ছিলো ? জবাবে রসূল (স) যেসব শিক্ষার কথা উল্লেখ করেন, তার একটি অংশ হলো ঃ

"বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্তব্য হলো তার সময়কে ভাগ করে নেয়া। কিছু সময় সে ব্যয় করবে তার প্রভুর কাছে প্রার্থনায়। কিছু সময় ব্যয় করবে আল্লাহর সৃষ্টি কৌশল বিষয়ে চিন্তা করে। কিছু সময় রাখবে আত্মসমীক্ষার জন্যে। আর কিছু সময় ব্যয় করবে জীবিকার প্রয়োজনে।"-[ইবনে হিব্বান]

এ হাদীসটিতেও সময় কাজে লাগাবার ক্ষেত্রে চারটি নির্দেশনা রয়েছে। প্রতিটিই গুরত্বপূর্ণ এবং অর্থবহ।

৯. সময় কী কাজে লাগাবেন ?

সময় কি কাজে লাগাবেন ? উপরের দু'টি উদ্ধৃতি থেকে এ প্রশ্নের জবাব অনেকটা পরিষ্কার হয়েছে। আসলে একজন প্রকৃত মানুষের কাজ ও কর্তব্য মূলত তিন প্রকারের। সেগুলো হলো ঃ

১. নিজের প্রতি কর্তব্য,

২. স্রষ্টার প্রতি কর্তব্য,

৩. সৃষ্টির প্রতি কর্তব্য।

সময়কে কাজে লাগাতে হবে এ তিনটি কর্তব্যে। প্রতিটির প্রতি দিতে হবে যথাযথ গুরুত্ব। এ তিনটি কর্তব্য পালনের জন্যেই পৃথিবীতে আমাদের আগমন। আল্লাহর নির্দেশিত নিয়মে এই কর্তব্যগুলো পালন করলেই লাভ করা যাবে তার সন্তোষ। এ তিনটি কর্তব্য পালনের জন্যে আমাদের প্রতিদিনকার চব্বিশ ঘন্টা সময়কে ভাগ করে নিতে হবে এভাবে ঃ

১. অধ্যয়ন ও পড়ালেখার জন্যে সময় নিন। কারণ এটাই ঈমান ও জ্ঞানের ভিত্তি। এটাই উপরে উঠার সিঁড়ি।

২. চিন্তাভাবনার জন্যে সময় নিন। কারণ, চিন্তাই শক্তির উৎস।

৩. খেলাধূলা ও ব্যয়ামের জন্যে সময় নিন, এতে যৌবন ও সুস্থতা লাভ করবেন।

৪. বিশ্রামের জন্যে সময় নিন। এতে শরীর সতেজ হয়। লাভ করা যায় উদ্দম।

৫. আল্লাহ্র ইবাদত বন্দেগি ও তাঁর কাছে প্রার্থনা করার সময় নিন। এটাই তাঁর সন্তোষ ও সাহায্য লাভের পথ।

৬. মানুষকে আল্লাহ্র পথে, সত্য ও সুন্দরের পথে ডাকবার জন্যে সময় নিন। মানুষের উপকার করার এর চাইতে বড় কিছু নেই।

৭. বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন ও সকল মানুষের সেবা করার এবং তাঁদেরকে ভালোবাসার জন্যে সময় নিন। এতে স্রষ্টার রহ্মত এবং সৃষ্টির শুভ কামনা লাভ করবেন।

৮. সত্যের প্রতিষ্ঠা ও বাতিলের অপসৃতির চেষ্টা সংগ্রামের জন্যে সময় নিন। কারণ সত্য প্রতিষ্ঠার মধ্যেই আছে সমাজের কল্যাণ আর বাতিলের অবস্থানে রয়েছে অশান্তি আর অকল্যাণ।

৯. সময় নিন কাজ করার জন্যে, দক্ষতা বিনিয়োগের জন্যে, উপার্জনের জন্যে। কারণ এটাই স্বচ্ছল জীবন যাপনের পথ।

১০. But, never take time to waste.

১০. সময় কিভাবে কাজে লাগাবেন ?

সময়কে কি কি কাজে লাগানো উচিত তার একটা তালিকা আমরা দিলাম। কিন্তু কিভাবে সময়কে কাজে লাগাবেন ? কিভাবে আপনার এতোগুলো কাজকে চব্বিশ ঘন্টা সময়ের সাথে খাপ খাওয়াবেন ? তাহ্লে এবার আসুন সে সম্পর্কে কিছু বলা যাক। আপনার কাজ ও সময়ের চমৎকার ও সুন্দর সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে এখানে কয়েকটি পরামর্শ দিচ্ছি ঃ

১. লক্ষ্য স্থির করুন ঃ জীবনের লক্ষ্য স্থির করুন। নিজেকে কি বানাতে চান ? কোন্ লক্ষ্যে পৌছাতে চান ? কতটা উচ্চে উঠাতে চান ? কতটা অবদান রাখতে চান ? নিজেকে স্রষ্টার কতটা সান্নিধ্যে নিয়ে যেতে চান ? এ ক্ষেত্রে অলংঘনীয় সিদ্ধান্ত নিন। প্রবল ইচ্ছা শক্তি সৃষ্টি করুন। আর এ লক্ষ্যের উপর মন স্থির করে জমিয়ে রাখুন। এতে আপনার মধ্যে লক্ষ্যে পৌছার জন্যে

সময়কে কাজে লাগাবার এক দুর্বার শক্তি সৃষ্টি হবে। এ শক্তি হলো মানসিক শক্তি, ইচ্ছা শক্তি। এতে আপনার মধ্যে লক্ষ্যে পৌছার জন্যে সৃষ্টি হবে Great mind. তখন আপনার Mind আপনাকে কোনো তুচ্ছ ব্যাপারে সময় নষ্ট করতে দেবে না। সে সর্বশক্তি দিয়ে আপনার Idea কে achieve করার জন্যে আপনাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে দুর্বার গতিতে।

২. পরিকল্পনা তৈরি করুন ঃ পরিকল্পনার তিনটি প্রধান অংশ থাকে ঃ ক, কি কাজ করা হবে ? খ. কিভাবে করা হবে ? গ. কত সময়ে করা হবে ?

আপনিও আপনার জীবন লক্ষ্যে পৌছার জন্যে কি কি করতে চান ? কিভাবে করতে চান ? কোন্ কাজ কতো সময়ে করতে চান ?—এগুলো ঠিক করে নিন। আমরা তো সময়কে হিসেব করি বছর, মাস, পক্ষ, সপ্তাহ, ঘন্টা, মিনিট, সেকেণ্ড ইত্যাদিতে। আপনিও আপনার কাজকে সময়ের এসব ধাপের সাথে সমন্বিত করে নিন।

এক বছরে কোন্ লক্ষ্যে পৌছুতে চান ? কি পড়তে চান ? কি করতে চান? কিভাবে করতে চান ?–এসব ভাবনাকে সাজিয়ে গুছিয়ে একটি বার্ষিক পরিকল্পনা তৈরি করে নিন।

বার্ষিক পরিকল্পনাকে মাস ওয়ারী সাজিয়ে মাসিক পরিকল্পনা তৈরি করুন।

মাসিক পরিকল্পনাকে পক্ষ কিংবা সাপ্তাহ ওয়ারী সাজিয়ে পাক্ষিক কিংবা সাপ্তাহিক পরিকল্পনা তৈরি করুন।

আর প্রতিদিনই চব্বিশ ঘন্টার কাজের পরিকল্পনা করুন।

–এভাবে পরিকল্পনা করে কাজ করুন।

–প্রতিটি পরিকল্পনার লক্ষ্য মাত্রা ঠিক করুন।

–কখনো আজকের কাজ কালকের জন্যে ফেলে রাখবেন না।

৩. কাজের রুটিন করুন ঃ আপনার পরিকল্পনায় এবং তালিকায় যেসব কাজ আছে, সেগুলোর মধ্যে অধিকাংশ কাজই এমন, যেগুলো প্রতিদিনই করতে হবে। আপনাকে খেতে হবে, গোসল করতে হবে, পড়তে হবে, ক্লাশে কিংবা কাজে যেতে হবে, ঘুমাতে হবে, নামায পড়তে হবে ইত্যাদি প্রতিদিন করার এমন অনেকগুলো কাজ আপনার আছে। এগুলো কোন্টি কখন করবেন এবং কোন্টির জন্যে কত সময় ব্যয় করবেন, তার একটি রুটিন তৈরি করে নিন। এটার নাম দৈনিক রুটিন। রুটিন ওয়ার্কের বাইরে প্রতিদিনই কিছু না কিছু কাজ থাকবে। সেগুলো যথাসাধ্য রুটিন মেনটেইন করেই করার চেষ্টা

করবেন। তবে রুটিন কাজের সময় কোনো জরুরি কাজ এলে তা জরুরিভাবেই করে নেয়া উচিত।

–রুটিনে অভ্যস্ত হোন।

–তবে রুটিনকে অলংঘনীয় মনে করবেন না।

৪. কাজের তালিকা তৈরি করুন ঃ তালিকা করে কাজ করলে লাভ অনেক। এতে কোনো কাজ করতে বাদ পড়ে না। এতে করে কোন্ কাজ আগে, কোন্‌টি পরে করতে হবে তা ঠিক করে নেয়া যায়। এতে ভুলে যাবার ভয় থাকে না।

–একটি ডাইরি মেনটেইন করুন।

–এ বছর আপনার প্রধান প্রধান কাজ কি কি সেগুলো ডাইরির একদিকে লিখে নিন। মাঝে মধ্যে সেগুলোর উপর চোখ বুলান।

–প্রতি মাসের প্রধান প্রধান কাজগুলো ডাইরিতে সে মাসের সূচনায় লিখে নিন। মাস শেষ হওয়া পর্যন্ত সেগুলোর উপর মাঝে মাঝে চোখ বুলান।

–আজ কি কি কাজ করতে হবে, ভোরে সেগুলোর তালিকা তৈরি করে নিন। এ তালিকা পূর্বের রাতে শোবার আগেও করতে পারেন। তবে সকালে করাই ভালো। সারাদিন একটি একটি করে কাজ সম্পন্ন করুন।

৫. অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে কাজ করুন ঃ আপনার পরিকল্পনায়, রুটিনে এবং তালিকায় যে কাজগুলো গুরুত্বপূর্ণ এবং জরুরি, সেগুলোকে মার্ক করুন। সেগুলো অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে করুন। আপনার ১০০টি কাজের মধ্যে সম্ভবত ২০টি এমন আছে, যেগুলোর ফল ও প্রভাব ৮০টির সমান। সুতরাং এ ২০টি চিহ্নিত করুন এবং এগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে করুন।

৬. করুন এবং করান ঃ আপনার সবগুলো কাজকে আবার দু' ভাগে ভাগ করুন। কিছু নিজে করুন আর কিছু অন্যদের দিয়ে করান।

আপনার সবগুলো কাজের মধ্যে এমন কিছু কাজ অবশ্যি আছে, যেগুলো আপনি সহজেই অন্যদের দিয়ে করাতে পারেন। সহকর্মী, কর্মচারী, বন্ধুবান্ধব, স্ত্রী, স্বামী, ভাইবোন–এদেরও আপনার কাজ থেকে কিছু কিছু কাজ দিন। সেই কাজ গুলো তাদের দিন,

–যেগুলো করার দায়িত্ব পেলে তারা খুশি হবে,

–যেগুলো তারা দক্ষতার সাথে করতে পারবে.

–যেগুলোর চাইতে আরো গুরুত্বপূর্ণ কাজ আপনার হাতে রয়েছে।

এমন কাজটিও অন্যকে দিয়ে করান, যেটি করতে ধরা যাক আপনার দুই ঘন্টা সময় লাগবে। অথচ আপনি অন্য কাজ করলে এ দুই ঘন্টায় দুশো টাকা কামাই করতে পারেন আর এ কাজটি অন্যকে দিয়ে সুন্দরভাবে পঞ্চাশ টাকায় করাতে পারেন। এ ক্ষেত্রে এ কাজটি অন্যকে দিয়েই করান আর আপনি ঐ মূল্যবান কাজটিই করুন।

৭. ক্যালেণ্ডার ও ডাইরি ব্যবহার করুন ঃ এক পাতায় ১২ মাসের ক্যালেণ্ডার আছে এমন একটি ক্যালেণ্ডার আপনার টেবিলে পেতে রাখুন, কিংবা সম্মুখে টানিয়ে রাখুন। অথবা একটি ইয়ার প্লানার ক্যালেণ্ডার সামনে টানিয়ে রাখুন। এ ক্যালেণ্ডারে সেসব তারিখ চিহ্নিত করুন যেসব তারিখে আপনার বিশেষ বিশেষ কাজ বা কর্মসূচি রয়েছে। বিভিন্ন কাজ ও কর্মসূচির জন্যে বিভিন্ন চিহ্ন ব্যবহার করুন। এ ক্যালেণ্ডার প্রতিদিন আপনাকে আপনার গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো স্মরণ করিয়ে দেবে।

আপনার appointment ডাইরিতেও আপনার সারা বছরের নির্দিষ্ট হয়ে যাওয়া কাগুলো তারিখ অনুযায়ী লিখে রাখুন। এতে ডাইরি আপনার ব্যক্তিগত সেক্রেটারির কাজ করবে।

১১. নিজেকে নিয়ে যান উন্নতির শিখরে

এভাবে সুপরিকল্পিত প্রক্রিয়ায় এবং সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে নিজেকে নিয়ে যান উন্নতির চূড়ান্ত শিখরে। পৃথিবীতে যারা বড় হয়েছেন এভাবেই হয়েছেন। পৃথিবীকে যারা গড়েছেন এভাবেই গড়েছেন। পৃথিবীকে যারা কিছু দিয়েছেন এভাবেই দিয়েছেন। যারা মানবতার কল্যাণে নিবেদিত হয়ে পৃথিবীকে সুন্দর সুসজ্জিত করে, পৃথিবী তাদের চিরস্মরণীয় করে রাখে।

নবী-রসূলগণ সময়ের সর্বোত্তম ব্যবহারের মাধ্যমে পৃথিবীকে গড়বার কাজ করে গেছেন, পৃথিবী তাদের অমর করে রেখেছে।

আবু বকর, উমর, হুসাইন, খালিদ, সালাউদ্দীন, আবু হানীফা, শাফেয়ী, ইবনে তাইমিয়া, গাযালী, শাহ অলীউল্লাহ, সাইয়েদ আহমদ ব্রেলবী, হাসানুল বান্না, সাইয়েদ কুতুব, সাইয়েদ মওদূদী—এঁরা আল্লাহর পৃথিবীকে আল্লাহর রঙে রাঙিয়ে তুলবার জন্যে নিজেদের ক্ষুদ্র জীবনের স্বল্প সময়কে সর্বোত্তমভাবে কাজে লাগিয়েছেন, পৃথিবীও তাঁদের চিরস্বরণীয় করে রেখেছে।

এ সুন্দর পৃথিবীতো গড়ে উঠেছে সত্য ও সুন্দরের আহ্বায়কদের অবদানে, মুজাদ্দিদ ও সংস্কারকদের পরিশ্রমে, বিজ্ঞানীদের আবিষ্কারে, প্রকৌশলীদের কারিগরী শিল্পে, চিকিৎসকদের চিকিৎসায়, দার্শনিকদের চিন্তায়,

রাজনীতিবীদদের প্রজ্ঞায়, কবি সাহিত্যিকদের সুন্দরের চেতনায়, কৃষকের চাষে, শ্রমিকের ঘামে।

আমাকে আপনাকে এবং আমাদের সবাইকে এঁদেরই মতো নির্মাণ করতে হবে জীবনের কোনো না কোনো রাজপথ। আল্লাহর পৃথিবীকে আল্লাহর রঙে রাঙিয়ে তুলতে হবে। গড়ে তুলতে হবে শান্তিময় বিশ্ব এবং মানবতাকে উন্নীত করতে হবে জীবন সৌন্দর্যের শিখরে।

আর এজন্যেই গড়তে হবে এবং উন্নতি করতে হবে নিজের জীবনকে। ক্ষুদ্র জীবনের স্বল্প সময়কে কাজে লাগিয়ে নিজেকে নিয়ে যেতে হবে উন্নতির শিখরে। যে নিজেকে গড়েছে, সেই গড়তে পারে পৃথিবীকে। যে নিজেকে উন্নত করেছে, সেই উন্নত করে গড়ে তুলতে পারে আল্লাহর যমীনকে।

১২. সময় বাঁচান

তাই সময় বাঁচাতে হবে। সে সময়কে লাগাতে হবে নিজেকে গড়ার কাজে। কিছু লোক এমন অনেক কাজ করে, যেগুলো করার প্রয়োজন নেই, যেগুলোতে কোনো লাভ নেই, যেগুলো করার দায়িত্ব তাদের নেই। এভাবে তারা সময় নষ্ট করে। আমাদেরকে তো জীবনে অনেক এগুতে হবে। অথচ জীবনটা ছোট। সময় খুব কম। তাই আমাদেরকে সময় বাঁচাতে হবে। সময় বাঁচিয়ে তা জীবনকে এগিয়ে নেবার কাজে লাগাতে হবে। আমরা সময় বাঁচাতে পারি ঃ

১. সুপরিকল্পিতভাবে কাজ করলে,
২. সময়ের কাজ সময়ে করলে। সময় মতো করলে,
৩. যা করার তা কম সময়ের মধ্যে করার চেষ্টা করলে,
৪. যা করার প্রয়োজন নেই তা না করলে,
৫. যা করলে লাভ নেই তা না করলে,
৬. যা করলে ক্ষতি হতে পারে, তা না করলে,
৭. যা করার দায়িত্ব নেই তা না করলে,
৮. সুযোগ মতো কাজের ফাঁকে কাজ করলে,
৯. অবসর সময়কে কাজে লাগালে,
১০. অপেক্ষার সময়কে কাজে লাগালে,
১১. বাজে ও অপ্রয়োজনীয় কথা না বললে।

ইংরেজীতে একটা বিখ্যাত কথা আছে। এটিকে কাজে লাগালে আমরা সবাই উপকৃত হবো। সেটি হলো ঃ

Great minds discuss ideas,
Average minds discuss events,

Small minds discuss people,
Very small minds discuss themselves.

১৩. অবসর সময় কি করবেন ?

পরিকল্পনা ও রুটিন মাফিক কাজ করার পরও দেখবেন আপনার কিছু সময় বেঁচে গেছে। কিংবা বাস, লঞ্চ, ট্রেন বা প্লেনের জন্যে অপেক্ষা করছেন। অথবা কারো সাথে সাক্ষাতের অপেক্ষায় আছেন, বা যার সাথে আপনার কাজ তার জন্যে অপেক্ষা করছেন। ক্লাশে তোমার শিক্ষক আসেননি বা পরবর্তী পিরিয়ডের আগে এক পিরিয়ডে ক্লাশ নেই। কিংবা আপনি যানবাহনে ভ্রমণরত আছেন। অথবা কোথাও বৃষ্টিতে আটকা পড়েছেন। জামায়াতে নামায পড়ার জন্যে কিছু সময় অপেক্ষা করতে হচ্ছে। কিংবা খাবার তৈরি হতে কিছুটা বিলম্ব হচ্ছে। এভাবে কিছু সময় প্রতিদিনই আপনার হাতে আসে। এটাকে আমরা অবসর সময়, উদ্বৃত্ত সময়, কিংবা সুযোগ বলতে পারি। এরূপ সময়কে কাজে লাগান। তাতে আপনার কাজ অনেক এগিয়ে যাবে। এসব সময়কে কি কাজে লাগাবেন ? হ্যাঁ, এ ব্যাপারে কিছু hints দিয়ে দিচ্ছি। এসব সময়ে আপনি ঃ

১. একটি সুন্দর বই পড়ুন। ক্লাশের পড়া রিভাইজ দিন।
২. যার সাথে কথা বলবেন, কথাগুলো কি কি এবং কিভাবে উপস্থাপন করবেন তা মনে মনে বা নোট বইতে সাজিয়ে নিন।
৩. কাউকে একটি সুন্দর আইডিয়া দিন।
৪. পরবর্তীতে আপনার কি কি কাজ আছে তা চিন্তা করে নিন।
৫. কুরআনের মুখস্ত অংশগুলো পাঠ করুন।
৬. আল্লাহ্‌র যিকর করুন।
৭. আল্লাহর কাছে কিছু চান।
৮. কোনো বিদেশী ভাষা শিখুন।
৯. কোনো টেকনিক্যাল কাজ শিখে নিন।
১০. সম্ভব হলে কিছু বাড়তি পয়সা রোজগার করুন।
১১. কোনো আত্মীয় বা বন্ধুর খোঁজ খবর নিন।
১২. যারা সাক্ষাত করতে চায় তাদের সময় দিন।
১৩. বক্তৃতার বিষয় সাজিয়ে নিন।
১৪. একটি চিঠি লিখুন, সময়ের অভাবে যা এতোদিন লিখতে পারেননি।
১৫. নতুন কারো সাথে পরিচয় করুন।

১৪. প্রতিদিন একধাপ এগিয়ে যান

সময়কে সর্বোত্তম কাজে লাগিয়ে নিজেকে এগিয়ে নিন। নিজেকে উন্নত করুন। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অন্যদের ছাড়িয়ে যান। অন্যদের ছাড়িয়ে যান–

জ্ঞানে, কর্মে, দক্ষতায়, চরিত্রে, উদারতায়, স্বাস্থ্যে, সৌন্দর্যে, শৃঙ্খলায়, পরিচ্ছন্নতায়, সময়ানুবর্তিতায়, নিয়মানুবর্তিতায়, ইবাদতে, আল্লাহভীতিতে, বিনয়ে, ধৈর্যে, সেবায়, সাহসে, সৌহার্দে, স্নেহে, ভালোবাসায়, নৈপুণ্যে, কৌশলে পরিচালনায়, পরিচর্যায়, দূরদৃষ্টিতে, অন্তরদৃষ্টিতে, আচারে, ব্যবহারে, ব্যক্তিত্বে, বিশ্বাসে, বীর্যবত্তায়।

আপনার লক্ষ্য অর্জনে এসব যোগ্যতা অর্জন করুন। এসব যোগ্যতা বলে নিজেকে এগিয়ে নিন। প্রতিদিন একধাপ এগিয়ে যান। প্রতি মাসে অনেকদূর ছাড়িয়ে যান। প্রতি বছর অনেক সিঁড়ি পেরিয়ে যান।

প্রতিদিন নিজের উন্নতির সমীক্ষা নিন। প্রতিমাসে সমীক্ষা নিন। প্রতি বছর সমীক্ষা নিন। সমীক্ষায় ধরা পড়া বিচ্যুতি ঝেড়ে ফেলুন। উন্নতির পথে আরো একটু বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিন। আপনার কোনো দু'টি দিন যেনো সমান না যায়। কোনো দু'টি মাস, কোনো দু'টি বছর যেনো একই সমতলে পড়ে না থাকে। উপরে উঠুন, শুধু উপরে উঠুন প্রতিদিন, প্রতি মাস, প্রতি বছর। প্রিয় রসূল (স) বলেছেন ঃ

"যার দু'টি দিন সমান গেলো, সে ক্ষতিগ্রস্ত হলো।"—[সুনানে দায়লমী]
(রচনাকাল ঃ ১৯৯৬ইং)

৪

বই পড়ুন জীবন গড়ুন

১. বই দেখলে আপনার কেমন লাগে ?

শিক্ষালাভ ও জ্ঞানার্জনের একটি বড় মাধ্যম হলো বই পড়া। বই শব্দটি এসেছে ওহী থেকে। ওহী>বহি>বই। বই জ্ঞান সূত্র। বই জ্ঞান সমুদ্র। তাই বই পড়ুন।

হ্যাঁ, বই পড়ুন। বই হাতে নিন ! বই একটু নেড়েচেড়ে দেখুন ! কেমন দেখা যায় ? কী ঝকঝকে ছাপা ! কী চমৎকার প্রচ্ছদ ! কেমন আকর্ষণীয় নাম! একটি সুন্দর বই দেখলে আপনার মনকি বলে না, একটু পড়ে দেখি ?'

আপনি কি পড়তে জানেন ? আপনি কি জাতির শিক্ষিতদের একজন ? তবে বই দেখলে কি আপনার পড়তে ইচ্ছে করে না ? একটু ধরে দেখতে মন চায় না ? একটু পাতা উল্টিয়ে দেখবার সখ হয় না ?

কারো কাছে একটি বই দেখলে আপনার মন কি সেটি হাতে নিয়ে দেখতে খুৎখুৎ করে না ? আপনার কি বলতে ইচ্ছে করে না ঃ ভাই আপনার বইটি একটু দেখবো ? বন্ধুর বাসায় তাকে সাজানো বই দেখলে আপনার কি ঈর্ষা হয় না ? বইর দোকানের সামনে দিয়ে আপনি কখনো হাটেননি ? দোকানের সাজানো বইয়ের বাগান আপনাকে কখনো হাতছানি দিয়ে ডাকেনি ? আপনি কখনো ফুটপাতে খোলা আকাশের নিচে সাজানো বইয়ের দোকানের পাশ দিয়ে হাঁটেননি ? সেখানে একটু দাঁড়াতে আপনার ইচ্ছে করেনি ? ইচ্ছে করেনি বইগুলো নেড়েচেড়ে দেখতে ?

একটি মনের মতো বই পেলে আপনার মন কি পুলকিত হয় না ? একটি সুন্দর বই পড়ে আপনার মনকি আবেগাপ্লুত হয় না ? কোনো বইয়ের একটি চমৎকার বাক্য কখনো আপনাকে শিহরিত করেনি ? হৃদয়ে দাগ কাটা কোনো বাক্যের নিচে আপনি কখনো দাগ টেনে রাখেননি ?

২. বই পড়ুন জীবন গড়ুন

হ্যাঁ, বই পড়ুন ! বই আনন্দ দেয়। বই মনকে পুলকিত করে। বই রক্ত শিরায় সুখের শিহরণ জাগায়। বই মনের কথা বলে। বই নিঃসংগতা দূর করে। বই বিষন্নতা তাড়িয়ে দেয়।

বই মনকে তাজা করে। তেজদীপ্ত করে। বই প্রেরণা জোগায়। কর্মচঞ্চল করে। বই পাঠককে মনযোগী করে। মনকে সুরভিত করে। বই অন্ধকার দূর করে। আলো ছড়ায়। মন মগজকে জ্যোতির্ময় করে তোলে।

আপনি অজানাকে জানতে চান? বই পড়ুন।

বড় হতে চান? বই পড়ুন!

ভালো হতে চান? বই পড়ুন!

আর কি হতে চান? বই পড়ুন !

জাতির বীর পুরুষদের কথা জানতে চান? ইতিহাস পড়ুন !

জাতি সমাজ রাষ্ট্রের সেবা করতে চান? বই পড়ুন !

আপনার আদর্শের বিপ্লব ঘটাতে চান? বই পড়ুন !

তুমি কি ছাত্র? বই পড়ো !

আপনি কি শিক্ষক? বই পড়ুন?

যেদিকেই পা বাড়াতে চান, বই পড়ুন !

জীবন গড়ুন, বই পড়ুন।

বই পড়ুন। বই আপনাকে গড়ে তুলবে। বড় করবে। মনের মতো সাজাবে।

ভালো ছাত্র হতে চাও? বই পড়ো, বই পড়ো এবং বই পড়ো।

ভালো শিক্ষক হতে চান? বই পড়ুন, বই পড়ুন এবং বই পড়ুন।

ডাক্তার হতে চান, প্রকৌশলী? আমলা? শাসক? কবি? সাহিত্যিক? বই পড়ুন এবং বই পড়ুন।

নবীর প্রতি আল্লাহর প্রথম বাণী ঃ পড়ো।

নবী রসূলদের কাছে আল্লাহ বই পাঠিয়েছেন। তাঁরা বই পড়েছেন। পড়িয়েছেন। বড় বড় জাতি গড়েছেন!

বই জ্ঞানের বাহন। জ্ঞানী বইয়ের মাধ্যমে তাঁর জ্ঞানকে ছড়িয়ে দেন সমাজে, জাতিতে, দেশে, দেশান্তরে। পৃথিবীতে যে জাতি সমাজ এবং দেশ জ্ঞানের এই বাহনকে বিজয় করেছে, তারাই শ্রেষ্ঠত্বের মর্যাদা অলংকৃত করেছে।

পৃথিবীতে যারাই বড় হয়েছেন, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, সমাজতত্ত্ববিদ, চিকিৎসাবিদ, প্রকৌশলী, শিল্পী, চিন্তানায়ক, আবিষ্কারক, তারা সবাই বই পড়েছেন। বই-ই তাদের বড় করেছে। মহান বানিয়েছেন। ইতিহাসে স্থান করে দিয়েছে।

যে বই পড়ে না সে বন্য।

যে জাতি বই পড়ে না তারা অসভ্য।

৩. বই না পড়ার দল

অনেক ছাত্র আছে, পাঠ্য বই যাদের একমাত্র সম্বল। আবার অনেককে দেখেছি, ছাত্র জীবন শেষ করে কর্মজীবনে প্রবেশ করার পর বইয়ের সাথে আর কোনো সম্পর্ক রাখেন না। এরা কি পাঠ্য বইতেই সবকিছু শিখে ফেলেছেন ? তা কি করে সম্ভব ? না, তা নয়, আসলে জ্ঞানের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠা তাদের লক্ষ্যই নয়। পাঠশালায় তারা যেটুকু শিখেন এবং শিখেছেন, সেটুকুকে সম্বল করেই তারা জীবন নির্বাহ করতে চান। জ্ঞান সমুদ্রে অবগাহন করে জীবনকে সুন্দর করা তাদের উদ্দেশ্য নয়। কোনো রকমে জীবন যাপন করাই তাদের উদ্দেশ্য। তবে কেন তারা বই পড়বেন ?

আমার জীবনে আমি পাঁচ, সাত, দশ, বার ক্লাস এমনকি মাষ্টার্স পাশ করা বহু লোক দেখেছি। পাঠশালাকে গুডবাই বলার পর তারা আর বইয়ের পাতা উল্টাননি।

৪. রাজ পড়ুয়া

আবার এমন বহুলোক আছেন যাঁরা রাজ পড়ুয়া, যারা গ্রন্থকীট, বইয়ের পোকা। তবে উই পোকা নন। দিনরাত বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকেন। ঘুমের হাতছানি, ক্ষুধার তাড়না কোনো কিছুই তাদের নিবৃত্ত করতে পারে না।

আমি আমার নানাকে দেখিনি। মুফতি আহমদ উল্লাহ। বাংলার সেরা আলিমদের একজন ছিলেন। সেকালে রিপন কলেজে অনারারী অধ্যাপনা করতেন। ছোট বেলায় বাড়িতে তাঁর সংগৃহীত গ্রন্থরাজির সারি সারি আলমারি দেখেছি। ডান দিক থেকে লেখা গ্রন্থাবলীতে পাতার নিচের বাম কোণ নেই। বাম দিক থেকে লেখা বইগুলোর পাতার নিচের ডান কোণ নেই। বার বার উল্টাতে উল্টাতে নিচের কোণ ক্ষয় হয়ে নিঃশেষ হয়ে গেছে। আসলে এঁরাই গ্রন্থকীট। বইয়ের পোকা।

ভারতের শ্রেষ্ঠ আলেমদের একজন ছিলেন মাওলানা আনওয়ার শাহ কাশ্মিরী। প্রথম দিকে তিনি দেওবন্দ মাদ্রাসার প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তাঁর সম্পর্কে শুনেছি, তিনি একবার মিশরের আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর এ সফরের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিলো, সেখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচিত হয়েছে, সেটি কপি করে আনা। কিন্তু আল আজহার লাইব্রেরীতে গিয়ে তিনি দেখতে পান অনেক নতুন নতুন গ্রন্থ। এ যেনো ক্ষুধার্ত ভোজ পুরীয়ার সামনে মজার মজার রকমারী খাদ্য হাজির করা হয়েছে আর কি! একটির পর একটি আলমারী খুলে প্রতিটি নতুন গ্রন্থ পড়তে শুরু করেন। এমনি করে গোগ্রাসে পড়তে পড়তে একদিন তাঁর সফরের মেয়াদ শেষ হয়ে

যায়। তিনি দেশে ফিরে আসেন। মাদ্রাসার শিক্ষকরা সেই বিশেষ বইটি দেখার জন্য উন্মুখ হয়ে আছেন। কিন্তু সেই বইটি সম্পর্কে তিনি নীরব। কৌতুহলী শিক্ষকরা জিজ্ঞেস করলেন ঃ হুজুর ! সেই গ্রন্থটি কই ? তিনি বললেন ঃ সেখানে বহু নতুন গ্রন্থ রচিত হয়েছে। সেগুলো পড়তে পড়তে আমার সময় শেষ। ওটি আর কপি করা হয়নি। তাঁর বক্তব্য শুনে সবাইর মাথায় হাত। তিনি বললেন ঃ তবে কাগজ কলম দাও, আমি লিখে দিচ্ছি। অন্যান্য গ্রন্থের সাথে সেটিও পড়ে এসেছি। অতপর তিনি পাঠ করা স্মৃতি থেকে গ্রন্থটি লিখে দিলেন। মাদ্রাসার পক্ষ থেকে একটি অতিরিক্ত কপি আল আজহারে পাঠিয়ে দেয়া হয় যথাযথভাবে কপি করা হলো কিনা তা মিলিয়ে দেখার জন্যে। কিছু দিন পর সেখান থেকে জবাব এলো, অক্ষরে অক্ষরে যথাযথ কপি করা হয়েছে !

এই হলো আমাদের অতীত মনিষীদের অবস্থা ! তাঁরা কোনো নতুন বই পেলে তা পড়ে শেষ করার আগে সবকিছু ভুলে যেতেন। আবার পড়াও এমনভাবে পড়তেন যে, অক্ষরে অক্ষরে গ্রন্থটিকে হজম করে নিতেন। এঁদেরই বলে রাজ পড়ুয়া।

৫. কুরআন হাদীসের তাকিদ

কুরআন বলে ঃ 'যারা জ্ঞানী আর যারা জ্ঞানী নয় এরা উভয়ে কি এক হতে পারে ?'–(সূরা যুমার ঃ ৯)

কুরআন আরো বলেছে ঃ "যদি না জানো, তবে জ্ঞানীদের কাছে জিজ্ঞেস করে জেনে নাও।"–(সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৭)

ইসলামের প্রাচীন মহামনিষী ইবরাহীম আলাইহিস সালাম কা'বা ঘর নির্মাণ শেষে আল্লাহর দরবারে দু'আ করেছিলেন ঃ

> "হে প্রভু ! এদের মধ্য থেকেই এদের মাঝে একজন রসূল পাঠিয়ো, যিনি এদেরকে তোমার বাণী পাঠ করে শুনাবেন, আল কিতাব শিখাবেন, জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রশিক্ষণ দেবেন আর তাদেরকে সংস্কার সংশোধন করবেন।"

ইবরাহীমের প্রার্থিত রসূল মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসেছিলেন এবং হযরত ইবরাহীম যেভাবে দু'আ করেছিলেন, তিনি ঠিক সে কাজই করেছিলেন, একথার স্বীকৃতি কুরআনেই রয়েছে। শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে তিনি জগত সেরা একটি উম্মাহ গড়ে তুলেছিলেন। 'পড়ো', শব্দ দিয়েই তাঁর যাত্রা শুরু। শিক্ষা দানই ছিলো তাঁর আসল কাজ। তিনি বলেছেন ঃ

'আমি শিক্ষক হিসেবে প্রেরিত হয়েছি।'

শিক্ষা গ্রহণ, জ্ঞানার্জন ও শিক্ষা প্রচার সম্পর্কে তাঁর রয়েছে অসংখ্য অমরবাণী, দেখুন তাঁর কয়েকটি বাণী ঃ

১. যে জ্ঞানার্জনে বের হয়, আল্লাহ তার জান্নাতের পথ সুগম করে দেন।

২. জ্ঞানের কথা জ্ঞানীর হারানো সম্পদ। যে-ই তা খুঁজে পায়, সে-ই তার অধিকারী।

৩. জ্ঞানার্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্যে অপরিহার্য।

৪. সারা রাতের ইবাদতের চাইতে রাতের কিছু সময় জ্ঞানার্জন করা উত্তম।

৫. আল্লাহ যার ভালো চান, তাকে দীনের জ্ঞানে ভূষিত করেন।

৬. আমার একটি বাণী হলেও তা মানুষের কাছে পৌছে দাও।

৭. তোমাদের মাঝে সেই সর্বোত্তম যে কুরআন শিখে এবং শিখায়।

সুতরাং বই পড়ুন ! জ্ঞানের পথে পা বাড়ান। জ্ঞান আর অজ্ঞতা এক হতে পারে না। জ্ঞান সভ্যতার প্রতীক। নবী রসূলরা জ্ঞান বিস্তারের জন্যেই আগমন করেছিলেন। জ্ঞান চর্চাকে তাঁরা সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। জ্ঞান হলো আলো, আর অজ্ঞতা হচ্ছে অন্ধকার। অন্ধকার থেকে বেরিয়ে আলোর দিকে আসুন। বিশিষ্ট সাহাবী মুয়ায ইবনে জাবাল (রা) বলেছেন ঃ

> "জ্ঞানার্জন করো ! জ্ঞান আল্লাহভীতি বাড়ায়। জ্ঞানার্জন করা ইবাদত ! পাঠ করা তাসবীহ। জ্ঞান চর্চা করা জিহাদ। যে জানে না তাকে শিখানো একটি দান। জ্ঞানীর সাথে জ্ঞানের কথা বন্ধুতা বাড়ায়। জ্ঞান ও গ্রন্থ তোমার একাকীত্বের বন্ধু, নির্জনতার সাথি।"

৬. মৌমাছির মতো হোন

বই পড়া জ্ঞানার্জনের একমাত্র উপায় নয়, শ্রেষ্ঠ উপায়। আবার কেবল বই পড়লেই জ্ঞানার্জন হয় না। বই থেকে জ্ঞান চয়ন করতে হয়। যে কোনো পোকা মাকড়, প্রজাপতি ফুলে বসলেই মধু অর্জন করতে পারে না। কিন্তু মধু মাছি তা পারে। কেন সে পারে ? কারণ, মধু চয়ন করবার জন্যেই সে ফুলে বসে। কিভাবে মধু চয়ন করতে হয়, তাও সে জানে। তাছাড়া মধু চয়ন করে তা সংরক্ষণ করার দক্ষতাও তার আয়ত্বে। এ তিনটি জিনিসই এ কাজে তার সাফল্য বয়ে আনে।

আপনি কি বই পড়ে জ্ঞানার্জন করতে চান ? তবে আপনাকেও হতে হবে মধু মাছির মতো। আপনার মধ্যেও থাকতে হবে ঐ তিনটি গুণ। অর্থাৎ

১. জ্ঞান লাভের ইচ্ছা বা উদ্দেশ্য,

২. জ্ঞান লাভের পদ্ধতি জানা এবং

৩. জ্ঞানকে ধরে রাখার দক্ষতা।

৭. বই পড়বেন কি উদ্দেশ্যে ?

যে কোনো কাজের ক্ষেত্রে ইচ্ছা বা উদ্দেশ্যই আসল। প্রিয় নবী (সা) বলেছেন ঃ

"কাজের ফল কি হবে, তা নির্ভর করে উদ্দেশ্যের উপর।"–(বুখারি)

সত্যি তাই। অনেক পোকা মাকড়ই তো ফুলে বসে, সবাই তো আর মধু নিয়ে ফিরে না। মধু নিয়ে ফিরে তো কেবল মধু পোকা। কারণ এ উদ্দেশ্যেই তো সে ফুলে বসে। উদ্দেশ্যই তাকে কাংখিত কর্ম সম্পাদনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়।

তবে কেবল উদ্দেশ্য থাকলেই হবে না, উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে থাকতে হবে প্রবল মনোবাসনা, উদগ্র আকাংখা আর দুর্বার ইচ্ছাশক্তি। এ তিনটি শক্তি মিলেই সৃষ্টি হয় মানুষের মনে অজেয় অশ্বশক্তি। আর এ অশ্বশক্তিই তাকে প্রবল গতিবেগে পৌঁছে দেয় কাংখিত লক্ষ্যে।

তাই, বই থেকে জ্ঞান আহরণের জন্যে আপনিও আপনার মাঝে সৃষ্টি করুন অদম্য আকাংখা, প্রবল মনোবাসনা আর দুর্বার ইচ্ছাশক্তি। মনে রাখবেন এ তিন জিনিস কিন্তু সব কাজেরই 'মাষ্টার কী'।

হ্যাঁ, বই পড়তে হবে জ্ঞানার্জনের উদ্দেশ্যে আর জ্ঞানার্জন করতে হবে সুন্দর জীবন গড়ার উদ্দেশ্যে। জ্ঞানার্জনের মাধ্যমে ব্যক্তির মাঝে সুন্দর ও সত্যের পক্ষে তিনটি পরিবর্তন তথা বিপ্লব সাধিত হতে হবে। সেগুলো হলো ঃ

১. মানসিক পরিবর্তন বা চিন্তার বিপ্লব।
২. চরিত্র বিপ্লব।
৩. সমাজ বিপ্লবের উদ্দীপনা।

আমি বই পড়বো, জ্ঞানার্জন করবো, অথচ আমার মন মানসিকতার পরিবর্তন হবে না, সে রকম বই পড়া আর সে রকম জ্ঞানার্জন করা তো বৃথা। এ জ্ঞানের কোনো মূল্য নেই। আমি যদি সুন্দরকে গ্রহণ করতে না পারি। সত্যকে উপলব্ধি করতে না পারি এবং অসুন্দর ও অসত্যকে নির্মূল করে সত্য সুন্দর চিন্তা মানসিকতা সৃষ্টি করতে না পারি, তবে আমার বই পড়ার কি মূল্য? আমার জ্ঞানার্জনের কি দাম ? এমনটি হলে আমাতে আর পশুতে কি তফাত ? সত্য উপলব্ধি ও গ্রহণে যারা ব্যর্থ তাদের সম্পর্কে আল কুরআন বলে ঃ

"ওদের মন-মস্তিষ্ক আছে কিন্তু তা দিয়ে তারা উপলব্ধি করে না, কান আছে তা দিয়ে (সত্যের আবেদন) শুনতে পায় না আর তাদের চোখও আছে কিন্তু তা দিয়ে (সত্য) দেখতে পায় না। মূলত এরা হলো পশুর মতো, বরং পশুর চাইতেও অধপতিত।"

আসলে সত্য ও সুন্দরকে জানা ও মানাই হলো জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্য। যে ব্যক্তি জ্ঞান সমুদ্রে অবগাহন করে সত্য সুন্দরকে উপলব্ধি করলো এবং তা গ্রহণ করলো, তার মাঝেই সাধিত হলো চিন্তার বিপ্লব। এ বিপ্লবের তীব্র স্রোতবেগে তার মন-মস্তিষ্কে জমাট বেঁধে থাকা সমস্ত কুসংস্কার, সংকীর্ণতা, যুক্তিহীনতা এবং মিথ্যা ও অসুন্দর ভেসে যায়, তলিয়ে যায় মহাসমুদ্রের অতল গহীনে।

এভাবে যখন পরিশুদ্ধ হয়ে যায় তার মন মস্তিষ্ক ও চিন্তা মানসিকতা, তখন এর অনিবার্য পরিণতিতে বিপ্লব সাধিত হয় তার চরিত্রে, তার আচরণে। তার কথাবার্তায়, চাল চলনে, কাজেকর্মে।

এ দু'টি বিপ্লব অর্থাৎ মানসিক বিপ্লব আর চরিত্র বিপ্লব মানুষকে সত্যিকার মানবত্ব দান করে। তাকে পশুত্ব থেকে মনুষ্যত্ব উন্নীত করে। সে স্রষ্টার সন্তুষ্টি লাভের উপযুক্ত হয়। এবার সে নিজকে শ্রেষ্ঠত্ব ও মানবত্বের উচ্চ থেকে উচ্চতর শিখরে নিয়ে চলে।

তখন গোটা সমাজকে পরিবর্তন করবার চরম উদ্দীপনা সে লাভ করে। সমাজের সমস্ত মানুষের চিন্তা ও চরিত্র বিপ্লবের জন্যে সে নিজেকে নিয়োজিত করে। এ উদ্দেশ্যে এগিয়ে আসা মানুষদেরকে সে সংগঠিত করে এবং মানুষের মধ্যে এ দু'টি বিপ্লব সাধনের মাধ্যমে সমাজ বিপ্লব সাধনের কাজে সে এগিয়ে চলে। তাহতে বলছি, বই পড়তে হবে জ্ঞানার্জনের জন্যে আর জ্ঞানার্জন করতে হবে সত্য সুন্দরকে উপলব্ধির মাধ্যমে চিন্তা ও চরিত্রে বিপ্লব সাধন করে আদর্শ সমাজ গড়ার জন্যে।

৮. কী বই পড়বেন ?

বই পড়ার জন্যে কতো কথা বললাম ! কিন্তু কি বই পড়বেন ? আপনি যদি বাংলাবাজার, বাইতুল মোকাররম আর নিউ মার্কেটের সমস্ত বই এক নাগাড়ে পড়তে শুরু করেন, তবে কি সারা জীবনেও কোনো কূল কিনারা করতে পারবেন ? স্বদেশী বিদেশী, প্রাচীন আধুনিক সমস্ত লেখকের বইই যদি আপনি পড়ার তালিকায় আনেন, তবে আপনার জীবন শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু আলমারীকে আলমারী বই আপনার চোখের সামনে পিছে রয়ে যাবে। আপনি মাত্র অল্প কিছুই পড়ে শেষ করতে পারবেন, আর অগণিত অগাধ বই থেকেই যাবে।

মানুষের মন এবং রুবি বিচিত্র। কেউ পসন্দ করেন আনন্দ রস সিঞ্চিত শৈল্পিক সাহিত্য। কেউ পসন্দ করেন প্রাকৃতিক বিজ্ঞান কেন্দ্রিক বই। কেউ পসন্দ করেন ইতিহাস ও সমাজ বিজ্ঞান কেন্দ্রিক সাহিত্য। আবার কেউ পসন্দ করেন নিরেট আদর্শ কেন্দ্রিক সাহিত্য।

কেউ বিখ্যাত বই পড়েন, আবার কেউ পড়েন বিখ্যাত লেখকের বই। অর্থাৎ যেসব বইয়ের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছে দিকে দিকে, লেখক যেই হোক না

কেন, কিছু লোকের পসন্দ সেইসব বই। আবার যেসব লেখকের জশ আর সুনাম ছড়িয়ে পড়েছে, বই যে রকমই হোক না কেন, কিছু লোকের পসন্দ সেসব লেখকের বই।

কিছু লোক আছেন, অতীত লেখকের বইই তাদের পসন্দ, সমকালীনরা তাদের কাছে নস্যি। আবার এর উল্টোটাও আছে। মোটকথা মানুষের মন আর মনন বিচিত্রগামী, যেমন বিচিত্র মহান স্রষ্টার এ সৃষ্টি।

আপনি যদি মুমিন হয়ে থাকেন, আপনি যদি আদর্শ মুসলিম হতে চান, তবে আপনার পয়লা চয়েচ হতে হবে ইসলামী আদর্শ ভিত্তিক গ্রন্থরাজি। আল কুরআন হবে আপনার সর্বক্ষণের সাথী। তারপর রসূলের হাদীস। এগুলো আপনি যে যে ভাষা জানেন, সব ভাষাতেই পাবেন। আপনার তালিকায় এরপর স্থান পাবে শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদদের বই।

আদর্শিক জ্ঞানের মজবুত ভিত রচনার পর আপনার পাঠাভ্যাস ইতিহাস এবং সমাজ বিজ্ঞানের সকল বিভাগেই গমনাগমন করা উচিত। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানও যথেষ্ট আকর্ষনীয়। শৈল্পিক সাহিত্যের বাগানেও মাঝে মাঝে পায়চারি করবেন। এতে রিক্রিয়েশন হবে। তাছাড়া ওখানে কি গাছ কি ফল দেয় তাও জানতে পারবেন। মনোহরী মাকাল ফলের স্বাদ আস্বাদন করে দেখার সুযোগ পাবেন।

পাঠকের বিজ্ঞতা ধরা পড়ে তার বই সিলেকশন। এখানেই ব্যর্থতার পরিচয় দেন অধিকাংশ পাঠক। ভালো বই সংখ্যায় কম পড়া হলেও জ্ঞান অর্জিত হয় প্রচুর। পাঠক সত্য সুন্দরকে দেখতে পায় অতি নিকটে। সত্যের পক্ষে সুন্দরের পক্ষে তার মানসিক বিপ্লব সাধিত হয় সহজে।

অনেকে নির্বাচনে ভুল করে প্রচুর বই পড়েন। আলমারীকে আলমারী উজাড় করেন। কিন্তু তার চিন্তা চরিত্রে কোনো বিপ্লব সাধিত হয় না। এরা গ্রন্থকীট, বড়জোর গ্রন্থ সুহৃদ। কিন্তু এদের পাঠাভ্যাস মহত উদ্দেশ্য প্রনোদিত নয়। এরা নির্বিশেষে সব ফুলেই বসে, কিন্তু মধু সংগ্রহে ব্যর্থ।

বই নির্বাচনে লেখক নির্বাচন আসল। লেখক নির্বাচনে ব্যর্থ হলে শ্রেষ্ঠ বই নির্বাচন দুঃসাধ্য। শ্রেষ্ঠ লেখকই শ্রেষ্ঠ বই উপহার দিতে পারে। যে ব্যক্তি লেখক নির্বাচনে ব্যর্থ হবে, তার পক্ষে ভালো বই খুঁজে পাওয়া ছাই হাতিয়ে সোনা পাওয়ার মতোই দুঃসাধ্য।

তবে শ্রেষ্ঠ বই নির্বাচনের জন্যে লেখক নির্বাচনই একমাত্র উপায় নয়। শ্রেষ্ঠ পাঠকদের মতামত অনেক বইকে শ্রেষ্ঠ বই বলে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছে।

৯. সেরা পড়ুয়ার 'মাষ্টার কী'

বই পড়ার ক্ষেত্রে মাওলানা মওদূদীর জুড়ি নেই। এ কালের শ্রেষ্ঠ ইসলামী চিন্তাবিদ তিনি। অসাধারণ মেধা আর বই পড়ার অকল্পনীয় নেশা তাঁকে মহামানবে পরিণত করেছে। তবে তাঁর ক্ষেত্রে সবচাইতে বড় কথা হলো, তিনি বই পড়ে সমুদ্রসম জ্ঞান আহরণ করেছেন আর জ্ঞান সমুদ্রের গহীনে অবগাহন করে মহাসত্যকে আবিষ্কার করেছেন। কি সেই মহাসত্য ? তাঁর ভাষাতেই শুনুন ঃ

> "সত্যে উপনীত হবার আগে কতনা বই আমি পড়েছি। প্রাচীন ও আধুনিক দর্শন, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে আলমারীকে আলমারী উজাড় করেছি। কিন্তু যখন চোখ খুলে কুরআন পড়লাম, খোদার কসম, তখন মনে হলো, আগের সমস্ত পড়াই ছিলো নিষ্ফল ব্যর্থ প্রয়াস। জ্ঞানের মূল সূত্র এখন আমার হাতের মুঠোয়। ক্যান্ট, হেগেল, নিটসে মার্কসসহ বিশ্বের সমস্ত বড় বড় চিন্তাবিদ দার্শনিকদের এখন আমার কাছে শিশু মনে হয়। বেচারাদের জন্যে বড়ই আফসোস, সারা জীবন তাঁরা যেসব সমস্যা সমাধানের জন্যে অকল্পনীয় সাধনা গবেষণা করে, বড় বড় গ্রন্থাবলী রচনা করে সেগুলোর সমাধান দিতে ব্যর্থ হয়েছেন, এই মহাগ্রন্থ একেকটি দু' দু'টি বাক্যে সেগুলোর সহজ সমাধান পেশ করে রেখে দিয়েছে। এই আল কুরআনই আমার প্রকৃত সহায়-শুভার্থী মহাগ্রন্থ। এ গ্রন্থ আমাকে একেবারে বদলে ফেলেছে। পশু থেকে মানুষ বানিয়ে দিয়েছে। অন্ধকার থেকে বের করে উজ্জ্বল আলোতে এনে দিয়েছে। এ গ্রন্থ এমন এক প্রদীপ আমার হাতে তুলে দিয়েছে, এখন আমি জীবনের যে বিষয়ের দিকেই তাকাই তার বাস্তব রূপ নিরাবরণ হয়ে ভেসে উঠে। যে চাবি দিয়ে প্রতিটি তালা খোলা যায়, ইংরেজিতে তাকে বলা হয় MASTER KEY. আল কুরআন আমার 'মাষ্টার কী'। জীবন সমস্যার যে তালাতেই তা লাগাই, চট করে খুলে যায়। যে দয়াময় খোদা দান করেছেন এ কিতাব, তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার ভাষা আমার নেই।"

এবার দেখলেন তো কি বই পড়তে হয় ? কিভাবে পড়তে হয় ? বইয়ের রাজ্যে তিনি ডুবে গিয়েছিলেন। মধু মাছির মতো বাগানের প্রতিটি ফুলে ফুলে তিনি বসেছেন। মধু খুঁজেছেন। অবশেষে খুঁজে পেয়েছেন রাজ ফুলের সন্ধান, যে ফুলের মধু মৃত্যুঞ্জয়ী–'শারাবান তহুরা'। আল কুরআনই সেই মৃত্যুঞ্জয়ী সুধা। বিশ্বনিখিলের মালিক মহান আল্লাহর বাণী এ মহাগ্রন্থ। আসুন এটিকেই আমরা প্রধান পাঠ্য বানাই ! তারপর অন্যগুলো।

১০. পড়ার জন্যে চাই পাঠ্যসূচি

একজন অগ্রসর মুসলিম হিসেবে আপনার জানা থাকা দরকার 'পূর্ণাংগ জীবন ব্যবস্থা' হিসেবে ইসলামের সঠিক ও যথার্থ পরিচয়। আপনার অর্জন করা প্রয়োজন যৌক্তিকতার নিরিখে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জ্ঞান। আপনার জানা থাকা দরকার বিজ্ঞানের সাফল্য, উন্নতি ও অভিযাত্রা সংক্রান্ত আপটুডেট তথ্য-প্রমাণ। আধুনিক বিশ্বব্যবস্থা সংক্রান্ত মৌলিক জ্ঞান অবশ্যি আপনার থাকা দরকার। ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা এবং বিশ্ব ইতিহাস সম্পর্কে মৌলিক ধারণা আপনার থাকা দরকার। স্বজাতির সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস আপনার জানা থাকা দরকার।

কিন্তু এতো কিছু জানার জন্যে তো আপনি হাজার হাজার বই পড়তে পারবেননা। এতো সময় কোথায় আপনার ? সে জন্যে আপনাকে পড়তে হবে প্রতিটি বিষয়ের উপর মোক্ষম দু' চারটে করে বই। আর তাই স্বাভাবিকভাবেই আপনার তৈরি করে নেয়া উচিত একটি যথার্থ পাঠ্যসূচি।

আমরা এখানে একটি মডেল পাঠ্যসূচি উপস্থাপন করছি। আপনি এটি অনুসরণ করতে পারেন। এটিকে আরো সমৃদ্ধও করে নিতে পারেন।

ক. আল কুরআন

আল কুরআনকে জানা ও বুঝার জন্যে আমরা এগ্রন্থে আলাদা একটি অধ্যায় (কুরআন জানুন কুরআন মানুন) সংযোজন করেছি। উক্ত অধ্যায়ে কুরআন জানা, বুঝা ও মেনে চলার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। সেখানে কুরআন জানা ও বুঝার ব্যাপারে একটি পাঠ্যতালিকাও দেয়া হয়েছে। তাই এখানে আর 'আল কুরআন' বিষয়ে আলাদা পাঠ্যসূচি উল্লেখ করা হলোনা।

খ. সুন্নতে রসূল সা.

১. যাদুল মা'আদ : আল্লামা হাফিয ইবনুল কাইয়্যিম
২. সুন্নাতে রাসূলের আইনগত মর্যাদা : সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
৩. সুন্নত ও বিদআত : মুহাম্মদ আবদুর রহীম

গ. হাদীস[১]

১. মিশকাত শরীফ : অলিউদ্দীন আল খতীব
২. যাদেরাহ : জলীল আহসান নদভী

১. হাদীস পড়ার ক্ষেত্রে গবেষণার কাজ ও ব্যাপক অধ্যয়নের উদ্দেশ্য ছাড়া বুখারি, মুসলিমসহ বড় বড় গ্রন্থাবলী পড়ার তেমন প্রয়োজন হয়না। আমরা এখানে যেসব হাদীস গ্রন্থের কথা উল্লেখ করছি, সেগুলোতেই বড় বড় গ্রন্থাবলী থেকে বিষয় ভিত্তিক হাদীসসমূহ সংকলন করা হয়েছে।

৩. রিয়াদুস সালেহীন ঃ ইমাম নববী
৪. সিহাহ্ সিত্তার হাদীসে কুদসী ঃ আবদুস শহীদ নাসিম
৫. এন্তেখাবে হাদীস ঃ আবদুল গাফফার হাসান নদভী
৬. হাদীস সংকলনের ইতিহাস ঃ মুহাম্মদ আবদুর রহীম
৭. হাদীসের তত্ত্ব ও ইতিহাস ঃ নূর মুহাম্মদ আজমী

ঘ. সীরাত

১. সীরাতুন্নবী ঃ শিবলী নুমানী
২. সীরাতে সরওয়ারে আলম ঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
৩. মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ ঃ নঈম সিদ্দিকী
৪. বিশ্বনবী ঃ গোলাম মোস্তফা
৫. সীরাতে ইবনে হিশাম ঃ ইবনে হিশাম
৬. আর রাহীকুল মাখতুম ঃ ছফীউর রহমান
৭. নবীদের সংগ্রামী জীবন ঃ আবদুস শহীদ নাসিম

ঙ. ঈমান-আকীদা

১. ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা ঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
২. ইসলামী আকীদা ঃ শায়খ মুহাম্মদ আল গাযালী
৩. কিতাবুত তাওহীদ ঃ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব
৪. ইবাদতের মর্মকথা ঃ ইমাম ইবনে তাইমিয়া
৫. তাওহীদ রিসালাত আখিরাত ঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
৬. ঈমানের পরিচয় ঃ আবদুস শহীদ নাসিম

চ. ইসলামের মৌলিক পরিচয়

১. ইসলামের বুনিয়াদী শিক্ষা ঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
২. ইসলাম পরিচিতি ঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
৩. ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলিক রূপরেখা ঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
৪. ইসলাম ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দ্বন্দ্ব ঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
৫. রাসায়েল ও মাসায়েল (১-খণ্ড) ঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
৬. ইসলামের পূর্ণাংগ রূপ ঃ সদরুদ্দীন ইসলাহী
৭. ইসলাম আপনার কাছে কি চায় ঃ সাইয়েদ হামেদ আলী
৮. ভ্রান্তির বেড়াজালে ইসলাম ঃ মুহাম্মদ কুতুব
৯. Islam and the West : Alija Ijctobegovic

১০. ইসলাম পরিচয় ঃ ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ
১১. ইসলামী জীবন বিধান ঃ সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী

ছ. ফিক্‌হ ও উসূলে ফিক্‌হ

১. ইসলামে হালাল ও হারামের বিধান ঃ ইউসুফ আল কারাদাভী
২. আসান ফিকাহ ঃ ইউসুফ ইসলাহী
৩. মহিলা ফিক্‌হ ঃ আতাইয়া খামীস
৪. আল্লাহর রসূল কিভাবে নামায পড়তেন ঃ আল্লামা হাফিয ইবনুল কায়্যিম
৫. রসূলুল্লাহর নামায ঃ নাসিরুদ্দীন আলবানী
৬. যাদুল মা'আদ ঃ আল্লামা হাফিজ ইবনুল কায়্যিম
৭. ফিকহুস সুন্নাহ ঃ সাইয়েদ সাবেক
৮. হিদায়া ঃ বুরহান উদ্দীন ফরগনানী
৯. মতবিরোধ পূর্ণ বিষয়ে সঠিক পন্থা অবলম্বনের উপায় ঃ শাহ অলী উল্লাহ দেহলবী
১০. নুরুল আনোয়ার ঃ মোল্লা জুয়ুন
১১. Principles of Islamic Jurisprudence : Muhammad Hashim Kamali

জ. রাজনীতি ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা

১. বিশ্বনবীর রাজনৈতিক জীবন ঃ ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ
২. ইসলামী রাষ্ট্র ও সংবিধান ঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
৩. খেলাফত ও রাজতন্ত্র ঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
৪. রসূল মুহাম্মদ সা.-এর সরকার কাঠামো ঃ ড. ইয়াসিন মাজহার সিদ্দিকী
৫. মুসলিম রাষ্ট্র পরিচালনা ব্যবস্থা ঃ ড. মুহাম্মদ হামীদুল্লাহ
৬. ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা ঃ ড. আবদুল করীম যায়েদান
৭. ইসলামী রাষ্ট্র ও সরকার ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ঝ. আইন, বিধান ও মানবাধিকার

১. ইসলামী আইন ঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
২. ইসলামের বিধিবদ্ধ আইন ঃ ইসলামিক ফাউন্ডেশন কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত
৩. ইসলামী আইন বনাম মানবীয় আইন ঃ শহীদ আবদুল কাদের আওদাহ
৪. ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধ ঃ আফীফ আবদুল ফাত্তাহ তাবারা

৫. ইসলামে মানবাধিকার : মুহাম্মদ সালাহ উদ্দিন
৬. নির্বাচিত রচনাবলী : সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
৭. ইসলামী রাষ্ট্রে অমুসলিমদের অধিকার : সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

ঞ. অর্থনীতি

১. ইসলামী অর্থনীতি : সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
২. সুদ ও আধুনিক ব্যাংকিং : সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
৩. ইসলাম ও আধুনিক অর্থনৈতিক মতবাদ : সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
৪. ইসলামের যাকাত বিধান : ইউসুফ আল কারদাবী
৫. ইসলামের ভূমি ব্যবস্থা : মুফতী মুহাম্মদ শফী
৬. Islam and the Economic Challenge. : Dr. Umar Chapra.

ট. পারিবারিক ও সামাজিক জীবন

১. স্বামী স্ত্রীর অধিকার : সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
২. পরিবার ও পারিবারিক জীবন : মুহাম্মদ আবদুর রহীম
৩. ইসলামের পারিবারিক জীবন : আবদুস শহীদ নাসিম

ঠ. নারী

১. পর্দা ও ইসলাম : সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
২. মুসলিম নারীর সমস্যা ও সমাধান : সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
৩. ইসলামী সমাজে নারী : সদরুদ্দীন ইসলাহী
৪. সংঘাতের কবলে নারী : নঈম সিদ্দীকী
৫. রসূলের যুগে নারী স্বাধীনতা : আবদুল হালিম আবু শুক্কা
৬. ইসলাম ও পাশ্চাত্য সমাজে নারী : ড. মুস্তফা আস্ সিবায়ী

ড. শিক্ষা ও সংস্কৃতি

১. শিক্ষা ব্যবস্থা ইসলামী দৃষ্টিকোণ : সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
২. শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি : আবদুস শহীদ নাসিম
৩. ইসলামী সংস্কৃতির মর্মকথা : সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
৪. সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য : ড. হাসান জামান
৫. শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ : আফজাল হোসাইন

ঢ. ইতিহাস ঐতিহ্য

১. তারিখুল ইসলাম : সাইয়েদ আমীমুল ইহসান
২. খুলাফায়ে রাশেদীন (চার খলিফার জীবনী ও রাষ্ট্র পরিচালনার ইতিহাস) : যে কোনো ভালো লেখকের

৩. বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস ঃ আব্বাস আলী খান
৪. উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন ও মুসলমান ঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
৫. একশ বছরের রাজনীতি ঃ আবুল আসাদ
৬. History of Muslim Bengal : Dr. Mohr Ali
৭. বাংলাদেশ ঃ জলে যার প্রতিবিম্ব ঃ জেমস্ জে. নোভাক
৮. আওয়ার ইন্ডিয়ান মুসলমান্স ঃ উইলিয়াম হান্টার

ণ . দাওয়াত আন্দোলন সংগঠন

১. ইসলামী দাওয়াত ও তার দাবি ঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
২. ইকামতে দ্বীন ঃ অধ্যাপক গোলাম আযম
৩. ইসলাম প্রচারের হৃদয়গ্রাহী পদ্ধতি ঃ আলবাহী আল খাওলী
৪. ইসলামী রেনেসাঁ আন্দোলন ঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
৫. ইসলামী সমাজ বিপ্লবের ধারা ঃ সাইয়েদ কুতুব শহীদ
৬. আন্দোলন সংগঠন কর্মী ঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
৭. ইসলামী নেতৃত্বের গুণাবলী ঃ খুররম মুরাদ
৮. ইসলামী আন্দোলন সাফল্যের শর্তাবলী ঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
৯. বাংলাদেশে রসূলুল্লাহর আদর্শ অনুসরণের অংগীকার ঃ আবদুস শহীদ নাসিম
১০. জামায়াতে ইসলামীর ইতিহাস ঃ আব্বাস আলী খান

ত. আচরণ ও দক্ষতা উন্নয়ন

১. ট্রেনিং গাইড ফর ইসলামিক ওয়ার্কার্স ঃ হিশাম আল তালিব
২. আধুনিক প্রশাসন ব্যবস্থা ঃ মোঃ আবদুল কাদের মিয়া
৩. সাংগঠনিক আচরণ ঃ ড. শ্যাম সুন্দর কর্মকার
৪. উন্নত জীবনে আদর্শ ঃ মুহাম্মদ আবদুর রহীম
৫. সাফল্যের চাবিকাঠি ঃ মহা জাতক
৬. অমনিবাস২ ঃ ডেল কার্ণেগি
৭. চাই প্রিয় ব্যক্তিত্ব চাই প্রিয় নেতৃত্ব ঃ আবদুস শহীদ নাসিম
৮. আদাবে যিন্দেগী ঃ ইউসুফ ইসলাহী

---

২. এটি ডেল কার্ণেগির চারটি বইয়ের একত্র সংকলন। সেই চারটি বই হলো ঃ (১) 'প্রতিপত্তি ও বন্ধু লাভ' (২) 'দুশ্চিন্তাহীন নতুন জীবন' (৩) 'ব্যক্তিত্ব বিকাশ ও সাফল্যের সহজ উপায়' (৪) 'বিক্রয় ও জনসংযোগ প্রতিনিধি কিভাবে হবেন।'–এ বইগুলো আলাদা আলাদাভাবেও পাওয়া যায়।

থ. জীবনী৩

১. আসহাবে রসূলের জীবন কথা : মুহাম্মদ আবদুল মা'বুদ
২. দি হাণ্ড্রেড (শ্রেষ্ঠ একশ) : মাইকেল হার্ট
৩. হাসানুল বান্নার ডাইরি : খলিল আহমদ হামেদী
৪. মাওলানা মওদূদী : আব্বাস আলী খান
৫. আত্ম জীবনী (উমর তিলমেসানী ও ইখওয়ান) : সাইয়েদ উমর তিলমেসানী
৬. কারাগারের রাতদিন : যয়নাল আল গাযালি
৭. মৃত্যুর দুয়ারে মানবতা : আবুল কালাম আজাদ

দ. শিশু কিশোরদের পাঠ্য

১. ইসলাম পরিচিতি : সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
২. ঈমানের হাকীকত : সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
৩. ইসলামের হাকীকত : সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
৪. কিশোর মনে ভাবনা জাগে : অধ্যাপক গোলাম আযম
৫. বিশ্বনবীর জীবনী : যে কোনো লেখকের
৬. নবীদের সংগ্রামী জীবন : আবদুস শহীদ নাসিম
৭. সত্যের সেনানী : এ. কে. এম. নাজির আহমাদ
৮. এসো এক আল্লাহর দাসত্ব করি : আবদুস শহীদ নাসিম
৯. সবার আগে নিজেকে গড়ো : আবদুস শহীদ নাসিম
১০. কুরআন পড়ো জীবন গড়ো : আবদুস শহীদ নাসিম
১১. হাদীস পড়ো জীবন গড়ো : আবদুস শহীদ নাসিম
১২. এসো জানি নবীর বাণী : আবদুস শহীদ নাসিম
১৩. আমরা সেই সে জাতি : আবুল আসাদ

ধ. বিবিধ

১. ইসলামী বিশ্বকোষ : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
২. আল জিহাদ : সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
৩. বিশ্ব শান্তি ও ইসলাম : সাইয়েদ কুতুব
৪. বাংলা একাডেমী বিজ্ঞান বিশ্বকোশ : সম্পাদনা বোর্ড কর্তৃক সম্পাদিত
৫. কালের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস : স্টিফেন ডব্লু. হকিং
৬. THE CLASH OF CIVILIZATIONS : Samuel P. Huntington
৭. Islamisation of Knowledge : Dr. Ismail Raji Al Faruki

---

৩. জীবনী বেশি করে পড়ুন। এখানে যে ক'টি বইয়ের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো ছাড়াও অন্যান্য সেরা মনীষীদের জীবনী পড়ুন।

এখানে বিভিন্ন বিষয়ের উপর যেসব বইয়ের নাম উল্লেখ করা হয়েছে, সেগুলো আপনি পড়ুন। অভিজ্ঞ লোকদের পরামর্শ নিয়ে আরো বই পড়ুন। বিষয় ও বইয়ের বহর বৃদ্ধি করুন। তত্ত্ব ও তথ্যের দিক থেকে সঠিক, যথার্থ ও গুরুত্বপূর্ণ বই পড়ুন।

এখানে যতোগুলো বইয়ের তালিকা দেয়া হলো, তার সবগুলো পড়া সম্ভব না হলে, প্রত্যেকটি বিষয় থেকে কিছু কিছু বই পড়ুন। অন্তত একটি করে পড়ুন, অতপর পাঠাভ্যাস জারি রাখুন। মনে রাখবেন, প্রকৃত জ্ঞানী তিনি, যার জ্ঞান পিপাসা কখনো মেটেনা। আপনি প্রশ্ন করতে পারেন ঃ পড়ার জন্যে বই কোথায় পাবো ? আমরা বলবো ঃ পড়ার জন্যে বই আপনি–

–কিনে পড়ুন।[৪]
–পাঠাগারে গিয়ে পড়ুন।
–পাঠাগার থেকে ইস্যু করে বাসায় এনে পড়ুন।
–ধার করে পড়ুন।
–বইয়ের দোকানে দাড়িয়ে পড়ুন এবং
–যেখানে পান, সেখানে পড়ুন।
(রচনাকাল ঃ ১৯৯৫। পাঠসূচি অংশ ২০০০ সাল)

৪. আমরা এখানে পাঠ্যসূচিতে যেসব বইয়ের নাম উল্লেখ করেছি, সেগুলো কিনতে চাইলে নিম্নোক্ত প্রকাশনী ও স্থানে যোগাযোগ করুন ঃ
ক. ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, বায়তুল মোকাররম ঢাকা।
খ. আধুনিক প্রকাশনী, বাংলাবাজার, ঢাকা।
গ. শতাব্দী প্রকাশনী, মগবাজার ওয়ারলেস রেলগেইট, ঢাকা।
ঘ. বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, কাটাবন, ঢাকা।
ঙ. নিউ মার্কেটের বিভিন্ন বইয়ের দোকান।
চ. বাংলাবাজার ও চকবাজারের বিভিন্ন বইয়ের দোকান।
ছ. জেলা শহর ও মফস্বলের বিভিন্ন নামকরা বইয়ের দোকান।

৫

কুরআন জানুন কুরআন মানুন

১. কুরআন সাফল্যের চাবিকাঠি

আল কুরআন সুন্দর মানুষ, আদর্শ সমাজ ও শ্রেষ্ঠ জাতি গঠনের সর্বোত্তম মাধ্যম। আল কুরআন সাফল্য ও বিজয় লাভের 'মাষ্টার কী' (Master Key)। এ শুধু কথার কথা নয়, বাস্তব ঘটনা। সপ্তম শতাব্দীর ইতিহাস খুলে দেখুন।

৬১০ খৃষ্টাব্দে অবতীর্ণ হবার সূচনা থেকে মাত্র কয়েক দশকের মধ্যে আল কুরআন কতো যে অখ্যাত অজ্ঞাত মানুষকে ইতিহাসের স্বর্ণ শিখরে মর্যাদাশীল করেছে। ইতিহাসের অন্তরালে অবস্থিত কতো যে কবিলা আর কওমকে বিশ্ব ইতিহাসের সোনালি পত্রে স্থান করে দিয়েছে। এ কুরআন মেষ পালের রাখালদের মানবেতিহাসের সেরা মানুষ রূপে গড়ে তুলে এশিয়া, ইউরোপ ও আফ্রিকা জোড়া সাম্রাজ্যের সম্রাট বানিয়ে দিয়েছে। কালো কুচকুচে ক্রীত-দাসদের সুপ্ত প্রতিভা প্রস্ফুটিত করে অসীম সাহসী সেনাপতির পদে সমাসীন করে দিয়েছে। গোত্র প্রিয় বেদুঈনদের মানবতা প্রিয় ন্যায়পরায়ণ শিক্ষক, প্রশাসক, রাষ্ট্রদূত, বিচারপতি, বীর সেনাপতি ও কর্মবীর বানিয়ে দিয়েছে।

আল কুরআন ব্যক্তির আত্মগঠন ও সাফল্যের সিঁড়ি। এর মাধ্যমে আপনি নিজেকে বিকশিত করে উঠাতে পারেন সাফল্যের শিখরে। জাতীয়ভাবে গোটা জাতি কুরআনের সিঁড়ি বেয়ে উঠে যেতে পারে উন্নতির সর্বোচ্চাসনে। আল কুরআন সেরা ব্যক্তি, সেরা সমাজ ও সেরা জাতি নির্মাণের শ্রেষ্ঠ হাতিয়ার। যে কোনো জাতি আল কুরআনের সিঁড়ি বেয়ে উঠে যেতে পারে সাফল্য, গৌরব ও মুক্তির বিশ্বজয়ী মিনারের চূড়ায়।

আমাদের দেশে কুরআন পাঠ করা হয় সাধারণত নেকীর উদ্দেশ্যে। কিন্তু কুরআন কেবল নেকীর উদ্দেশ্যে পাঠ করার জন্যে অবতীর্ণ হয়নি। কেবল নেকীর উদ্দেশ্যে পাঠ করলে কুরআন থেকে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতি গঠনে কোনো ফায়দা পাওয়া সম্ভব নয়। কুরআন থেকে ফায়দা পেতে হলে কুরআনকে বুঝতে হবে, কুরআনের শিক্ষাকে হৃদয়ংগম করতে হবে এবং কুরআনকে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও জাতীয় জীবনে অনুশীলন করতে হবে।

কুরআন একটি গ্রন্থ, একটি বিমূর্ত জীবন ব্যবস্থা। কেবল অনুশীলনের মাধ্যমেই তা মূর্ত ও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। তাই যারা কুরআনকে আল্লাহ প্রদত্ত গ্রন্থ ও জীবন ব্যবস্থা বলে বিশ্বাস করেন, তাদের জীবনের সব চাইতে বড়

কর্তব্য হলো আল কুরআনকে বুঝা ও অনুশীলন করা। এভাবেই সফল ও স্বার্থক হতে পারে কুরআন অবর্তীণের উদ্দেশ্য আর উপকৃত হতে পারে মানুষ ও মানব সমাজ। তাই এখানে কুরআন নিয়েই বলতে চাই কিছু কথা। এসব কথা হয়তো অনেকেরই অজ্ঞাত নয়, তবুও ন্যায় কথা নিত্যদিন নজরে আনা অন্যায় নয়।

২. আল কুরআন সম্পর্কে আল কুরআন

● এ কুরআন আল্লাহ ছাড়া কারো পক্ষে রচনা করা সম্ভব নয়। এটি সন্দেহাতীত, নিখিল বিশ্বের অধিকর্তার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ।–(সূরা ১০ ইউনুস ঃ ৩৭)

● এ (কুরআন) হলো আল্লাহর দেয়া পথ নির্দেশ।–(সূরা ৩৯ যুমার ঃ ২৩)

● রমযান মাসে নাযিল করা হয়েছে আল কুরআন মানব জাতির জীবন যাপনের ব্যবস্থা হিসেবে। আর এ গ্রন্থ এমন অকাট্য ও সুস্পষ্ট নির্দেশিকা সম্বলিত, যা সঠিক পথ দেখায় এবং সত্য ও মিথ্যার পার্থক্য পরিষ্কার করে দেয়।–(সূরা ২ আল বাকারা ঃ ১৮৫)

● এ কুরআন এমন পথ দেখায় যা সবচেয়ে সরল-সঠিক ও স্থায়ী। যেসব মুমিন এর ভিত্তিতে সঠিক কাজ করে, এ কুরআন তাদেরকে বিরাট প্রতিদানের সুসংবাদ দেয়।–(সূরা ১৭ বনি ইসরাঈল ঃ ৯)

● আল্লাহর নিকট থেকে তোমাদের কাছে এসেছে জ্যোতি ও সুস্পষ্ট কিতাব। যারা তাঁর সন্তুষ্টি চায়, এ গ্রন্থের মাধ্যমে তিনি তাদের দেখিয়ে দেন শান্তি ও নিরাপত্তার পথ, নিজ ইচ্ছায় তাদের বের করে আনেন অন্ধকার থেকে আলোতে এবং তাদের নির্দেশিকা প্রদান করেন সরল-সঠিক পথের।–(সূরা ৫ আল মায়িদা ঃ ১৫-১৬)

● আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন সর্বোত্তম বাণী, তা এমন এক গ্রন্থ, যাতে বিভিন্ন বিষয় পুন পুন আলোচনা হয়েছে, তবু তা নিখাঁদ ভারসাম্যপূর্ণ। যারা তাদের মালিককে ভয় করে, এ গ্রন্থ পাঠে তাদের লোম শিউরে উঠে। অতপর আল্লাহর স্মরণে তাদের দেহমন বিগলিত হয়ে যায়।–(সূরা যুমার ঃ ২৩)

● আমি আল কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্যে সহজ করে দিয়েছি। এ থেকে উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি ?–সূরা ৫৪ আল ক্বামার ঃ ৪০)

৩. আল কুরআন সম্পর্কে রসূলুল্লাহ সা. এর বাণী

● তোমাদের মাঝে সর্বোত্তম ব্যক্তি সে, যে কুরআন শিখে এবং শিখায়।
–(বুখারি)

- তোমরা কুরআন পড়ো, কুরআনের সাথি হও। কিয়ামতের দিন কুরআন তার সাথিদের পক্ষে সুপারিশকারী হয়ে আসবে।−(সহীহ মুসলিম)
- কিয়ামতের দিন কুরআন বান্দার পক্ষে অথবা বিপক্ষে সুপারিশ করবে। −(মিশকাত)
- পৃথিবীতে যে ব্যক্তি কুরআনকে সাথি বানিয়েছে, আখিরাতে তাকে বলা হবে, পড়ো এবং উপরে উঠো।−(তিরমিযি)
- সকল বাণীর উপর আল্লাহর বাণীর শ্রেষ্ঠত্ব ঠিক সে রকম, যেমন সকল সৃষ্টির উপর আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব।−(তিরমিযি)
- কুরআন আল্লাহর মজবুত রশি, বিজ্ঞান সম্মত উপদেশ এবং সরল সঠিক পথ।−(তিরমিযি)
- কুরআনের আহ্বান ও আলোচ্য বিষয় নিয়ে ভাবনা-চিন্তা করো, অবশ্যি তোমরা সাফল্য লাভ করবে।−(বায়হাকি)
- কুরআনের চেয়ে উত্তম কোনো জিনিস সাথে নিয়ে তোমরা আল্লাহর কাছে ফিরে যাবে না।−(হাকিম)
- কুরআন একটি রশি। এর এক প্রান্ত আল্লাহর হাতে, আরেক প্রান্ত তোমাদের মাঝে। তোমরা এ রশিকে শক্ত করে ধরো, তাহলে কখনো পথভ্রষ্ট হবে না, ধ্বংস হবে না কখনো।−(ইবনে আবি শাইবা)

৪. মানবতার মুক্তির পথ আল কুরআন

আমরা বিশ্বাস করি, আল্লাহ এক ও অদ্বিতীয়। তাঁর সত্তা, গুণাবলী, ক্ষমতা, অধিকার কোনো কিছুতেই কেউ অংশীদার নেই। পৃথিবী এবং পৃথিবীর সকল প্রাণীসহ গোটা মহাবিশ্বের তিনিই একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, মালিক, প্রভু, প্রতিপালক, শাসক ও নিয়ন্ত্রক। তাঁর ক্ষমতার কাছে সবাই এবং সবকিছুই অসহায়। তিনিই সমস্ত ক্ষমতার উৎস। তাঁর সন্তুষ্টিই মুক্তির একমাত্র উপায়।

মৃত্যুর পর তিনি সব মানুষকে পুনরায় জীবিত করবেন। মানুষের বিচার করবেন। বিচারে যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে চলেছে বলে প্রমাণিত হবে, তিনি তাদের বসবাসের জন্যে দান করবেন অফুরন্ত সুখের সামগ্রীর সুসজ্জিত জান্নাত। সেখানে থাকবে তারা চিরদিন, চিরকাল।

বিচারে যারা তাঁর সন্তুষ্টি মাফিক জীবন যাপন করেনি বলে প্রমাণিত হবে, তাদের তিনি নিক্ষেপ করবেন কঠিন শাস্তির দুঃখময় জাহান্নামে।

মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর আখেরি রসূল। তাঁর মাধ্যমে তিনি নাযিল করেছেন মানবতার মুক্তির নির্দেশিকা আল কুরআন। এ

গ্রন্থে তিনি বাতলে দিয়েছেন তাঁর সন্তুষ্টি লাভের পথ এবং তাঁর অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচার উপায়। কুরআনের ভিত্তিতে কিভাবে আল্লাহর সন্তুষ্টি অনুযায়ী জীবন যাপন করতে হয় এবং কিভাবে তাঁর নারাজি ও অসন্তুষ্টি থেকে বাঁচতে হয়, তা নিজ জীবনে পূংখানুপূংখরূপে বাস্তবায়ন ও কার্যকর করে দেখিয়ে দিয়ে গেছেন মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি আল্লাহর পথে চলার ও আল্লাহর সন্তুষ্টি মাফিক কাজ করার নিখুঁত ও পূর্ণাংগ মডেল।

তাই মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসৃত নীতি ও পদ্ধতি অনুযায়ী আল কুরআনের ভিত্তিতে জীবন পরিচালনার মাধ্যমেই মানুষ লাভ করতে পারে পার্থিব জীবনের সার্বিক সুখ, শান্তি ও কল্যাণ আর পরকালীন জীবনের মুক্তি ও সাফল্য। এটাই মানব জাতির মুক্তি ও কল্যাণের শাশ্বত উপায়।

৫. আল কুরআন জীবন যাপনের নির্ভুল বিধান

আল কুরআন মানুষের জন্যে আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত জীবন যাপনের বিধান। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা হযরত জিব্রীল আমীনের মাধ্যমে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এই মহাগ্রন্থ অবতীর্ণ করেন। এটি আগা গোড়া এবং অক্ষরে অক্ষরে আল্লাহর বাণী। এতে কোনো প্রকার শোবা-সন্দেহ নেই। এর প্রতিটি কথা, প্রতিটি বাণী, প্রতিটি বক্তব্য, প্রতিটি তথ্য, প্রতিটি তত্ত্ব, প্রতিটি সংবাদ, প্রতিটি খবর, প্রতিটি ভবিষ্যত বাণী এবং এতে বর্ণিত প্রতিটি ঘটনা অকাট্য সত্য।

আল কুরআন আল্লাহর বাণী হবার ব্যাপারে কোনো প্রকার সন্দেহ সংশয় নেই। গত দেড় হাজার বছরে কেউ আল কুরআনকে চ্যালেঞ্জ করতে পারেনি। যে-ই এসেছে চ্যালেঞ্জ করতে, সে-ই হয়েছে কুপোকাত। আল কুরআন মানব জাতির প্রতি বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহ তায়ালার এক অসীম ও অফুরন্ত অনুগ্রহ। এ কুরআন গোটা মানব জাতির জন্যে আল্লাহর দেয়া নির্ভুল পথ নির্দেশ ও শাশ্বত জীবন বিধান।

৬. মানুষের ভালো মন্দের মাপকাঠি

এই মহাগ্রন্থের মূল বিষয়বস্তু হলো 'মানুষ'। কিসে মানুষের ভালো আর কিসে মানুষের মন্দ ? কোন্টা মানুষের কল্যাণের পথ আর কোন্টা অকল্যাণের? কিসে মানুষের লাভ আর কিসে তার ক্ষতি ? কোন্টা মানুষের ধ্বংসের পথ আর কোন্টা মুক্তির ? কোন্টি শাস্তির পথ আর কোন্টি পুরস্কারের ? কোন্টি মানুষের স্রষ্টা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের পথ আর

কোন্‌টি তাঁর অসন্তুষ্টির ?—কুরআনের সব কথা এই লক্ষ্য বিষয়কে কেন্দ্র করেই আলোচিত হয়েছে।

মানুষকে আল্লাহর ইচ্ছা অনিচ্ছা, সন্তুষ্টি অসন্তুষ্টি এবং তাঁর বিধান ও হুকুম জানাবার জন্যে তিনি এক সুন্দর অনুপম নিয়ম করেছেন। সেই মানব সৃষ্টির প্রথম থেকেই তিনি মানুষের মধ্য থেকেই কিছু লোককে নবী রসূল নিযুক্ত করেছেন। এই নবী রসূলদের মাধ্যমে তিনি মানুষকে তাঁর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির পথ এবং তাঁর হুকুম ও বিধান জানিয়ে দিয়েছেন। হযরত মুহাম্মদ (স) আল্লাহর সর্বশেষ নবী। তাঁর পরে আল্লাহ্ পৃথিবীতে আর কোনো নবী পাঠাবেন না। মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্য আল্লাহ্ তাঁর প্রতি আল কুরআন নাযিল করেছেন।

আল কুরআন মানুষকে আল্লাহর পথ দেখায়। আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ দেখায়। জান্নাতের পথ দেখায়। এ কিতাব জীবনের সকল ব্যাপারে সত্য মিথ্যা, ন্যায় অন্যায়, কল্যাণ অকল্যাণ ও লাভ ক্ষতির কথা পরিষ্কার করে বলে দেয়। এই মহা গ্রন্থই মানুষের জন্যে সত্য মিথ্যা ও ভালো মন্দের মাপকাঠি।

আল কুরআনই আল্লাহর প্রকৃত পরিচয়, রিসালাতের মর্যাদা, পরকালীন জবাবদিহিতা এবং জান্নাত ও জাহান্নাম সম্পর্কে জানবার মূল সূত্র। এ কিতাবের মাধ্যমেই মানুষ নিজের মুক্তির পথ খুঁজে পেতে পারে। লাভ করতে পারে সত্য সঠিক জীবন বিধান। আজো বিশ্বের সমস্যা নিপীড়িত ও শান্তির অন্বেষী মানবতাকে এ কিতাবই দিতে পারে সুখ শান্তি ও মুক্তির দিশা।

৭. শিখা অনির্বাণ

এ মহাগ্রন্থে বিষয়-বস্তুর গ্রন্থনা এমন অভিনব পন্থায় করা হয়েছে যা বাক্যের অনুপম বিন্যাসে, সুরের সহৃদয় মুর্ছনায়, ছন্দের সাবলীল সম্মোহনে আর বিষয়বস্তুর মর্মস্পর্শী আবেদনে পাঠককে ধাবিত করে এক অপূর্ব অনাবিল আধ্যাত্মিক জগতে। আলোচ্য বিষয়ের পুনরুক্তি ও প্রতিধ্বনিতে এখানে পাঠক কখনো আড়ষ্ট হয়ে পড়ে না। গোটা গ্রন্থ বিস্ময়কর বর্ণনা ভঙ্গিতে বাঙময়। পাঠকের সংকীর্ণ হৃদয়ের দুয়ার খুলে তাকে প্রসারিত করে দেয় বিশ্বময়। এখানে প্রতিটি কথাকে এমন আকর্ষণীয় ব্যঞ্জনায় উপস্থাপন করা হয়েছে যে, তা ভোলা যায় না, ভুল হয় না, বার বার শুধু দোলা দেয় পাঠকের হৃদয়ে। প্রতিটি কথাই যেনো সদ্যজাত, অথচ চিরন্তন, চির শাশ্বত। এ এমন আলোকবর্তিকা, যা সত্যকে সত্যরূপে উদ্ভাসিত করে দিয়ে দিবালোকের মতো জ্যোতির্ময় করে তোলে। দুঃখ বেদনায় মর্মপীড়িত মুমিনের হৃদয়কে সিক্ত করে তোলে প্রশান্তির দুর্নিবার ফল্গুধারায়। এ কিতাব শিখা অনির্বাণ,

শারাবান তহূরা। একবার যে এ কিতাবের অমৃত সুধায় সিক্ত করে নিজের হৃদয়, মৃত্যুঞ্জয়ী সাফল্য চুম্বন করে তার পদযুগল।

৮. আসুন কুরআন পড়ুন

কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয়, আমাদের দেশের অনেক মানুষই এ কিতাবের মর্মবাণী সম্পর্কে অবহিত নন। এমনকি মুসলিম সমাজের অবস্থাও করুণ। অনেকেই কুরআন মজীদ পড়তে পারেন, কিন্তু এর মর্ম বুঝতে পারেন না। আবার অনেকেই কুরআন মজীদ পড়তেও শিখেননি। অথচ আল কুরআনই হলো মানুষের জন্যে মহান আল্লাহ্ প্রদত্ত হিদায়াত বা জীবন পরিচালনার নির্দেশিকা।

আপনি পুরুষ হোন কিংবা মহিলা, আপনার কাজের জন্যে আপনাকে একান্ত ব্যক্তিগতভাবেই আল্লাহর কাছে জবাবদিহী করতে হবে। তাই আপনাকে আহ্বান জানাচ্ছি, আপনি যে কোনো দৃষ্টিভংগিই পোষণ করুন না কেন, একবার আল কুরআন পড়ে দেখুন। মুক্ত ও নিরপেক্ষ মনে এ গ্রন্থটিকে অধ্যয়ন করুন। আপনার বিবেক, নিরপেক্ষ মন আর মানবিক যুক্তি যদি এ মহাগ্রন্থকে গ্রহণ করে, তবে আসুন, আপনি এ গ্রন্থকে আঁকড়ে ধরুন। বিবেক ও যুক্তিকে সম্মান দিন।

আপনি তো কতো গ্রন্থ, কতো বই-পুস্তকই পড়ে থাকেন। সকল বই-পত্রের মতো আল কুরআন পড়বার অধিকারও আপনার আছে। আপনি কেন বিশ্বের সর্বাধিক পঠিত এই মহা গ্রন্থকে উপেক্ষা করছেন? এর ফলে কি আপনি একটি বিরাট জিনিস হারাচ্ছেন না? আপনি সব ব্যাপারেই সক্রীয় হতে পারলে কুরআন পাঠের ব্যাপারে কেন সক্রীয় হতে পারবেন না?

তাই আসুন, কুরআন পড়ুন এবং কুরআনের সত্যতা অকাট্যতা ও গ্রহণ যোগ্যতা সম্পর্কে বিবেকের কাছে প্রশ্ন করুন। বিবেক যদি এটিকে গ্রহণ করে, তবে আপনার পক্ষে বিবেকের বিরুদ্ধে যাওয়া কি ঠিক হবে?

৯. কুরআন বুঝুন এবং মেনে চলুন

পৃথিবীতে যতো বই পুস্তক ও গ্রন্থই লেখা হয়, সেটা যে কোনো বিষয়েই লেখা হয়ে থাক না কেন, হোক তা প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, হোক সমাজ বিজ্ঞান, হোক আইন-কানুন, কিংবা হোক তা অন্য কোনো বিষয়ের, তা মূলত লেখা হয়ে থাকে অনুসরণ, বাস্তবায়ন ও কার্যকর করার জন্যে। ব্যক্তিগত চিঠি থেকে আরম্ভ করে পত্র পত্রিকা পর্যন্ত সবকিছু থেকেই মানুষ তথ্য, তত্ত্ব, উপদেশ, সতর্কতা, কর্মনীতি, কর্মপন্থা ও নির্দেশিকা গ্রহণ করে।

আর আল কুরআন হলো মানুষের স্রষ্টা, মালিক ও প্রতিপালক মহান আল্লাহর বাণী। এ বাণীতে তিনি গোটা মানব জাতির জন্যে জীবন যাপনের হিদায়াত বা নির্দেশিকা প্রদান করেছেন। সুতরাং মানুষের উচিত দুনিয়ার যে কোনো বই পুস্তক ও গ্রন্থের চাইতে আল কুরআনকে অধিক গুরুত্ব দিয়ে, অতীব গুরুত্বপূর্ণ মনে করে এবং অপরিহার্য বিধান হিসেবে গ্রহণ করে পাঠ করা, শিখা, বুঝা এবং এর মর্ম উপলব্ধি করা। সেই সাথে জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল কুরআনের নির্দেশ বাস্তবায়ন করা। এ গ্রন্থে প্রদত্ত নির্দেশিকার আলোকে ব্যক্তি জীবন ও সমাজ গড়ে তোলা। এ উদ্দেশ্যে সর্বত্র কুরআনের আলো ছড়িয়ে দেয়া। ব্যাপকভাবে কুরআন শিখা ও শিক্ষাদানের আয়োজন করা এবং কুরআন চর্চার আন্দোলন গড়ে তোলা। আপনার বিবেক কি এই অকাট্য যুক্তি অগ্রাহ্য করতে পারবে?

কোনো বিষয়কে যেমন না বুঝে প্রত্যাখ্যান করা যায় না। তেমনি কোনো বিষয়কে না বুঝে ঠিক মতো জানা এবং মানাও যায় না। কেউ যদি কুরআনের প্রতি ঈমান আনতে এবং এ গ্রন্থকে মানতে ও অনুসরণ করতে না চান, সে ক্ষেত্রে যুক্তি, বুদ্ধি ও বিবেকের দাবি হলো, গ্রন্থটি পড়ে এবং বুঝে যুক্তির ভিত্তিতে তার সিদ্ধান্ত নেয়া উচিত যে, কেন তিনি এটিকে মানবেন না? না পড়ে, না বুঝে অন্ধতা ও অজ্ঞতার ভিত্তিতে কোনো গ্রন্থকে প্রত্যাখ্যান করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক।

অপর দিকে যারা আল্লাহর কিতাব হিসেবে কুরআনের প্রতি ঈমান রাখেন এবং কুরআনকে মানতে ও অনুসরণ করতে চান, সে ক্ষেত্রেও তাদেরকে অবশ্যি কুরআন বুঝতে হবে। কুরআন সম্পর্কে অজ্ঞতা নিয়ে কুরআনের হুকুম-বিধান ও নির্দেশাবলী সঠিকভাবে মানা কিছুতেই সম্ভব নয়। যেমন কম্পিউটার অপারেশনের পদ্ধতি না জেনে কম্পিউটার চালনা করা সম্ভব হতে পারে না, ঠিক তেমনি কুরআনকে মানা ও অনুসরণ করার জন্যে কুরআন জানা ও বুঝা অপরিহার্য।

তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাতে বিশ্বাসী প্রত্যেক মুমিনের জন্যে এ কাজ অবশ্যি একটি অপরিহার্য কাজ।

আপনার কাছে কুরআনের দাবি ও আহ্বান হলো, আপনি যেখানেই থাকুন, যে এলাকায়ই থাকুন, আপনি যদি ঃ

১. আল কুরআনকে বিশ্ব জগতের মালিক আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা কর্তৃক অবতীর্ণ ও সুরক্ষিত কিতাব বলে বিশ্বাস করে থাকেন,

২. কুরআনকে মানুষের জীবন যাপনের জন্যে আল্লাহ্ তাবারুক ওয়া তা'আলার প্রদত্ত গাইড বুক বা নির্দেশিকা বলে মেনে নিয়ে থাকেন,

৩. কুরআনকে মানবতার সার্বজনীন ও শাশ্বত কল্যাণ, মুক্তি ও সাফল্যের একমাত্র চাবিকাঠি বলে মেনে নিয়ে থাকেন।

তবে, কুরআনকে আঁকড়ে ধরুন। জানার জন্য কুরআন পড়ুন, মানার জন্য কুরআন পড়ুন। আল কুরআনের বাহক মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনাদর্শ ও জীবন যাপন পদ্ধতিকে কুরআনের বাস্তব মডেল ও ব্যাখ্যা হিসেবে গ্রহণ করুন। কুরআন বুঝবার ও মেনে চলবার অংগীকার করুন। গোটা মানব সমাজকে কুরআনের প্রতি আকৃষ্ট করবার এবং কুরআন বুঝাবার চেষ্টা করুন।

১০. কুরআন বুঝার উপায় কি ?

কিন্তু কুরআন বুঝার উপায় কি ? কিভাবে সহজ সরল উপায়ে সঠিকভাবে কুরআন বুঝা সম্ভব ? হ্যাঁ, অন্য যে কোনো গ্রন্থ বুঝা ও উপলব্ধি করার জন্যে আপনি যে পন্থা অবলম্বন করে থাকেন, কুরআন বুঝার ক্ষেত্রেও সে পন্থা অবলম্বন করুন। কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে আরবি ভাষায়। এটি বাংলাভাষীদের জন্যে একটি বিদেশী ভাষা। আমাদের দেশের অসংখ্য শিক্ষিত মানুষ বিদেশী ভাষায় লিখিত বই পুস্তক এবং পত্র পত্রিকা পড়ে থাকেন। অনেকেই বিদেশী ভাষায় অফিস আদালত পরিচালনা করেন। অর্থাৎ সামাজিক ও বৈষয়িক কার্যক্রম জানা, বুঝা ও পরিচালনার জন্যেই আপনি বিদেশী ভাষা শিখেছেন।

কিন্তু কুরআন তো আপনার স্রষ্টা, মালিক, মনিব ও প্রতিপালক মহান আল্লাহর কিতাব। এ কিতাব বুঝা ও অনুধাবন করা আপনার জীবনের অন্য যে কোনো বিষয় বুঝার চেয়ে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এ কিতাবের নির্দেশাবলী জানা ও মানার উপরই তো নির্ভর করছে আপনার পার্থিব জীবনে সঠিক পথ লাভ এবং পরকালীন অনন্ত জীবনে মুক্তি ও সাফল্য অর্জন।

তাই আপনি কুরআনের ভাষা শিখার সিদ্ধান্ত নিন। কোনো ভাষা শিখার জন্যে বয়েস কোনো বাধা নয়। প্রয়োজন হলো গুরুত্ব অনুভব করার এবং আল্লাহর নির্দেশাবলী জানা ও হিদায়াত লাভ করার তীব্র আকাংখার। সেই সাথে প্রয়োজন এ জন্যে একটি বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নেবার।

তবে কুরআন বুঝার জন্যে আরবি শিখতেই হবে, এটা অপরিহার্য নয়। আল হামদুলিল্লাহ, বাংলা ভাষায় কুরআনের অনেক ক'টি অনুবাদ ও তফসীর প্রকাশ হয়েছে। আপনি কুরআন বুঝার জন্যে এসব গ্রন্থের সাহায্য নিন।

১১. তফসীর পড়ে কুরআন বুঝুন

কুরআন মজীদ বুঝা ও হৃদয়ংগম করার জন্যে তফসীর পড়া জরুরি। কুরআন সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ সেই প্রাথমিক যুগ থেকে এ যাবত বহু তফসীর গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। যিনি কুরআনের তফসীর করেন বা লিখেন, তাঁকে বলা হয় মুফাসসির। মুফাসসিরগণ কুরআনের আলোকে কুরআনের ব্যাখ্যা করেছেন, হাদীস ও সুন্নতে রসূলের আলোকে ব্যাখ্যা করেছেন, সাহাবায়ে কিরামের বাণী ও আছারের ভিত্তিতে ব্যাখ্যা করেছেন। সুতরাং তফসীরের সাহায্যেই কুরআন বুঝা সহজ।

আধুনিক কালের বৈজ্ঞানিক গবেষণা ও আবিষ্কারের ফলে কুরআনে বর্ণিত প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, জীব বিজ্ঞান সহ বহু বিষয়ে মানুষ এখন স্বচ্ছ ধারণা লাভ করছে। কুরআনের এ সংক্রান্ত আয়াতগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা ও মর্ম উপলব্ধি করছে। আধুনিক কালে যারা কুরআনের তফসীর লিখেছেন, তাঁদের অনেকেই জ্ঞান-বিজ্ঞানের সর্বশেষ তথ্য ও বাস্তবতাকে আল কুরআনের বিভিন্ন আয়াতের অকাট্য সত্যতার প্রমাণ হিসেবে ব্যাখ্যা করেছেন। ফলে আধুনিক শিক্ষিতদের জন্যে এসব তফসীরের মাধ্যমে কুরআন বুঝা আরো সহজ হয়ে উঠেছে।

স্বাভাবিকভাবেই কুরআনের সর্বাধিক তফসীর লেখা হয়েছে আরবি ভাষায়। তাছাড়া উর্দূ, ইংরেজি, ফার্সি, বাংলাসহ পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষায় তফসীর লেখা হয়েছে। আমাদের ভাষা বাংলা। আমাদের অধিকাংশ লোকই শুধু বাংলা ভাষা বুঝেন। আলহামদুলিল্লাহ, এ যাবত আরবি ও উর্দূ থেকে বহু তফসীর বাংলা ভাষায় অনূদিত হয়ে প্রকাশ হয়েছে।

যারা বাংলা তফসীর পড়তে চান, তাদের জন্য পরামর্শ হলো, আপনি প্রথমত বাংলায় অনূদিত নিম্নোক্ত তফসীরগুলোর কোনো একটিকে নিজের পাঠ্য বানিয়ে নিন ঃ

১. তফসীরে তাবারি–মুহাম্মদ ইবনে জরীর আত তাবারি (আরবি থেকে)।

২. তাফহীমুল কুরআন–সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী (উর্দূ থেকে অনুবাদ)।

৩. ফী যিলালিল কুরআন–সাইয়েদ কুতুব শহীদ (আরবি থেকে অনুবাদ)।

৪. তফসীরে ইবনে কাসীর–ইসমাঈল ইবনে কাসীর (আরবি থেকে অনুবাদ)।

৫. তফসীরে উসমানি–সাব্বীর আহমদ উসমানি (উর্দূ থেকে অনুবাদ)।

৬. মা'আরিফুল কুরআন–মুহাম্মদ শফি (উর্দূ থেকে অনুবাদ)।

৭. বয়ানুল কুরআন বা তফসীরে আশরাফি–আশরাফ আলী থানবি (উর্দূ থেকে)

যারা সরাসরি আরবি, উর্দূ ও ইংরেজী তফসীর পড়তে চান, তাদের জন্যে উপরোক্ত তফসীরগুলো ছাড়াও আরো কয়েকটি তফসীর পড়ার পরামর্শ রই-লো। সেগুলো হলো ঃ

৮. রূহুল মু'আনি (তফসীরে আলুসি)–শিহাবুদ্দীন আলুসি (আরবি)।

৯. আহকামুল কুরআন–আহমদ ইবনে আলী আল জাস্‌সাস (আরবি)।

১০. তাফসীরে কুরতবী ঃ ইমাম কুরতবী (আরবি)।

১১. তাদাব্বুরে কুরআন–আমীন আহসান ইসলাহী (উর্দূ)।

১২. The Holy Quran -A. Yusuf Ali (English)

13. The Noble Quran -Dr. Muhammad Taqiud Din Al Hilali & Dr. Muhmmad Muhsin khan. (শেষোক্ত দুটি মদীনাস্থ বাদশাহ ফাহদ কুরআন মুদ্রণ কমপ্লেক্স থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।)

আপনি এই তাফসীরগুলো থেকে কোনো একটিকে নিজের পাঠ্য বানিয়ে নিন। আপনি যদি ভালো ভাবে কুরআন বুঝতে চান, অথবা আপনি যদি কোথাও কুরআন ক্লাশ পরিচালনা করেন, কিংবা দরসে কুরআন বা তফসীর পেশ করেন, তবে একই সাথে তিনটি তফসীর পড়ুন। এতে করে আপনি যে অংশ পড়বেন তা ভালোভাবে উপলব্ধি করতে পারবেন। ক্রমান্বয়ে সবগুলো তফসীর পড়ে নিতে পারলে খুবই উপকৃত হবেন।

উপরের ১৩টি তফসীরকে আমরা তফসীরের রীতির দিক থেকে তিন গ্রুপে ভাগ করতে পারি। আপনি তিনটি তফসীর পড়তে চাইলে উপরের ক্রমিক নম্বর অনুযায়ী তিন গ্রুপ থেকে তিনটি বাছাই করুন ঃ

গ্রুপ–এক ঃ ২, ৩, ৮, ১১	গ্রুপ–দুই ঃ ১, ৪, ১২, ১৩	গ্রুপ–তিন ঃ ৫, ৬, ৭, ১০

আপনার পাঠ্য গ্রন্থ প্রথম গ্রুপ থেকে বাছাই করলে অধিক উপকৃত হবেন। কারণ এগুলো সমৃদ্ধতর। বাকি দুই গ্রুপের তফসীর পড়বেন সহায়ক হিসেবে। ৯ম তফসীরটি বিধান সংক্রান্ত তফসীর। প্রয়োজনে সেটা আলাদাভাবে পড়ে নেবেন। এগুলো হলো আমাদের পরামর্শ। আপনি এর বাইরেও যে কোনো ভালো তফসীর পড়তে পারেন। কুরআনের শুধু মাত্র অনুবাদ জানার জন্যে পড়ুন ঃ

১. কুরআনুল করীম ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

২. তরজমায়ে কুরআন মজীদ ঃ আধুনিক প্রকাশনী।

৩. The Noble Quran : (উপরের তফসীরের তালিকায় ১৩নং)

আরো কয়েকটি বইয়ের সাহায্য নিন

যারা আল কুরআনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা এবং বাস্তবতাও জানতে চান, তারা ২ নম্বর তফসীর দ্বারা উপকৃত হবেন। তবে এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বইগুলোও পড়ে নিতে পারেন ঃ

1. Scientific Indications in the Holy Quran.
   (Prepared and published by : Islamic Foundation Bangladesh)
2. The Bible, The Quran and Science : Dr. Maurice Bucaille
   (বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান' নামে বাংলায় অনুবাদ হয়েছে)

৩. কোরআনে বিজ্ঞান ঃ ডাঃ গোলাম মুয়ায্যম।

বাংলা ভাষায় সহজ ভাবে কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে আরো কয়েকটি বই পড়ে নিলে আপনি দারুণ উপকৃত হবেন। এগুলো থেকে আপনি আল কুরআন সম্পর্কে মৌলিক ধারণা লাভ করতে পারবেন। লাভ করতে পারবেন কুরআন সম্পর্কে বিভিন্ন দিক নির্দেশনা। এগুলো কুরআন সম্পর্কে আপনার দৃষ্টি প্রসারিত করে দেবে। সে বই গুলো হলো ঃ

১. কুরআন অধ্যয়ন সহায়িকা ঃ খুররম মুরাদ।

২. কুরআন ব্যাখ্যার মূলনীতি ঃ শাহ্ ওলী উল্লাহ্ দেহলবি।

৩. কুরআনের মর্মকথা (এটি মূলত তফসীর 'তাফহীমুল কুরআন'-এর ভূমিকা। কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ)।

৪. কুরআন বুঝা সহজ ঃ অধ্যাপক গোলাম আযম।

৫. আল কুরআন আত তাফসীর ঃ আবদুস শহীদ নাসিম।

৬. আল কুরআনের শিল্প ও সৌন্দর্য ঃ সাইয়েদ কুতুব।

কুরআন বুঝার ক্ষেত্রে নবীগণের জীবনী গ্রন্থ অধ্যয়ন খুবই প্রয়োজনীয়। বিশেষ করে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা.-এর নির্ভরযোগ্য জীবনী গ্রন্থ পড়ে নেয়া একান্ত জরুরি। এ ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলো পড়ে নিতে পারেন ঃ

১. মানবতার বন্ধু মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ ঃ নঈম সিদ্দীকী।

২. সীরাতে ইবনে হিশাম অথবা সীরাতে ইবনে ইসহাক।

৩. সীরাতুন নবী ঃ শিবলি নুমানি।

৪. সীরাতে সরওয়ারে আলম ঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী।

৫. নবীদের সংগ্রামী জীবন ঃ আবুদস শহীদ নাসিম।[1]

---

১. এ গ্রন্থে কুরআনে বর্ণিত ২৪জন নবীর জীবনী কুরআনের আলোকে লেখা হয়েছে।

৬. রসূলুল্লাহর বিপ্লবী জীবন ঃ আবু সলীম মুহাম্মদ আবদুল হাই।

আরো দু'টি গ্রন্থ আপনার সংগ্রহে রাখা প্রয়োজন। এর একটি হলো ঃ 'আল মুজাম আল মুফাহ্হারাস লিআলফাজিল কুরআনিল কারীম।'

কুরআন মজীদের যে কোনো আয়াত বা শব্দ, সেটি কুরআনের কোন্ সূরার এবং কত নম্বর সূরার কত নম্বর আয়াতে রয়েছে এ গ্রন্থ দ্বারা আপনি নিমিষেই তা বের করতে পারবেন। অর্থাৎ এ গ্রন্থটি কুরআনের যে কোনো আয়াত বা শব্দ বের করার চাবিকাঠি। এটি মধ্য প্রাচ্যের যে কোনো আরব দেশ থেকে সংগ্রহ করতে পারেন। এটি তৈরি করছেন ফুয়াদ আবদুল বাকী।

আর দ্বিতীয় যে গ্রন্থটি আপনার কাছে থাকা দরকার সেটি হলো ঃ 'তাফহীমুল কুরআনের বিষয় নির্দেশিকা।'

এ গ্রন্থটি হলো, যে কোনো বিষয়ে কুরআনের বক্তব্য অর্থাৎ বিষয়টি কুরআনের কোন্ সূরার কত নম্বর আয়াতে আছে, তা বের করার চাবিকাঠি। সেই সাথে বিখ্যাত তফসীর 'তাফহীমুল কুরআন' থেকে বিষয়টির তফসীর বা ব্যাখ্যাও বের করতে পারবেন। এটি প্রকাশ করেছে ঢাকাস্থ শতাব্দী প্রকাশনী।

১৩. শুনে কুরআন বুঝুন

কুরআন বুঝার আরেকটি উৎকৃষ্ট উপায় হলো শুনে বুঝা। দুনিয়ার সব বিষয় বুঝার জন্যেই মানুষ একটা পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষকের সাহায্য গ্রহণ করে। শিক্ষকের সাহায্য এবং নিজের প্রচেষ্টার মাধ্যমেই মানুষ শিখে থাকে। শিক্ষকের সাহায্য আনুষ্ঠানিক ভাবেও নেয়া যায়, উপ আনুষ্ঠানিকভাবেও নেয়া যায়, আর নেয়া যায় অনানুষ্ঠানিক ভাবেও। সাহাবায়ে কিরাম রা. রসূল সা.-এর নিকট থেকে শুনেই কুরআন শিখেছেন। রসূল সা. ছিলেন তাঁদের শিক্ষক। যারা নিরক্ষর তাদের তো শুনেই কুরআন বুঝতে হবে। বুঝার চেষ্টা করাকে তারাও অবহেলা করতে পারেন না। কিন্তু শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে নিজেরা সরাসরি পড়ার সাথে সাথে যারা কুরআনের জ্ঞান রাখেন এমন লোকদের নিকট থেকেও কুরআনের অর্থ, মর্ম ও ব্যাখ্যা শুনা, বুঝা ও শিখা প্রয়োজন। তবেই তাদের কুরআন বুঝা ও শিখাটা হবে যথার্থ ও পূর্ণাংগ।

আমাদের জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় অর্থাৎ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থায় ছাত্রদের আল কুরআনের ব্যাখ্যা ও মর্ম বুঝার সুযোগ খুব কমই আছে। তাই কুরআনের পতাকাবাহীরা সরাদেশেই বিভিন্ন উদ্যোগে 'কুরআন ক্লাশ', 'দরসে কুরআন' এবং 'তফসীরুল কুরআন' আলোচনার আয়োজন করে। কুরআন শিখা ও কুরআনের মর্ম বুঝার এসব অনুষ্ঠানে শিক্ষিত এবং নিরক্ষর, নারী এবং পুরুষ

সকলেরই যোগদান করা কর্তব্য। কিশোর, তরুণ ও যুবকদেরও এসব অনুষ্ঠানে ব্যাপক ভাবে যোগদান করা এবং করানো উচিত।

তাছাড়া যার যেখানে সুযোগ আছে সেখানেই কুরআন ক্লাশ, দরসে কুরআন এবং তাফসীরুল কুরআনের আয়োজন করা প্রয়োজন। যারা কুরআনের জ্ঞান রাখেন, তাদের এসব প্রোগ্রাম চালানো এবং আলোচনা পেশ করা উচিত।

১৪. কুরআন ক্লাশ চালু করুন

'কুরআন ক্লাশ' মানে আল কুরআনের অর্থ, ব্যাখ্যা, তাৎপর্য ও শিক্ষা সম্পর্কে আলোচনার ক্লাশ। এ ক্লাশ সাপ্তাহিক, পাক্ষিক বা মাসিক নিয়মিত অনুষ্ঠিত হতে পারে। তবে সাপ্তাহিক অনুষ্ঠিত হওয়াই উত্তম। আল কুরআন সম্পর্কে উৎসাহী এবং জানা শুনা আছে, এমন কেউ কুরআন ক্লাশের পরিচালক হবেন। ক্লাশের স্থান বা এলাকা নির্ধারিত থাকবে। এ ক্লাশে আল কুরআনের শুরু থেকে ধারাবাহিকভাবে আলোচনা করা যেতে পারে এবং এভাবে কুরআন মজীদ শেষ করার জন্যে সময় ও ক্লাশের একটি টারগেটও নির্ধারণ করা যেতে পারে। তবে আমপারাটা আগে শেষ করে দিয়ে প্রথম থেকে শুরু করলে বেশি ভালো হয়।

ক্লাশে নিয়মিত অংশ গ্রহণকারীগণ নির্ধারিত অংশের উপর পড়াশুনা করে আসবেন এবং পারস্পরিক আলোচনার মাধ্যমে অর্থ, মর্ম ও শিক্ষা জেনে নেবেন। ক্লাশ পরিচালক শিক্ষকের ভূমিকা পালন করবেন, অন্যদেরকেও বলার সুযোগ দেবেন এবং তাদের প্রশ্নের জবাব দেবেন। প্রত্যেক ক্লাশেই নিজেদের জীবনে ও পরিবারে কুরআনের শিক্ষা বাস্তবায়নের অগ্রগতি সম্পর্কে কিছু সময় পর্যালোচনা হতে পারে। এভাবে কুরআন ক্লাশের মাধ্যমে আমরা কুরআন বুঝা এবং কুরআনের জ্যোতিতে জীবন ও সমাজকে আলোকিত করার পথে এগিয়ে যেতে পারি।

তাই, আপনি যেই হোন, যেখানেই থাকুন, আপনার পরিমণ্ডলে কুরআন ক্লাশ চালু করুন। আপনার বাসায়, প্রতিবেশীর বাসায়, বৈঠকখানায়, ক্লাবে, কর্মস্থলে, মসজিদে, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, যেখানেই কুরআনের ব্যাপারে দু' চারজনকে আগ্রহী করতে পারেন, সাপ্তাহিক কুরআন ক্লাশ চালু করে দিন। নিজে পরিচালনা করুন, অথবা আপনার চেয়ে অধিক জানা কাউকে পেলে তাঁকে দিয়ে পরিচালনা করান।

আপনি যদি কুরআন ক্লাশ পরিচালনা করার মতো যথেষ্ট জ্ঞান আপনার নাই বলে মনে করেন, তবে তাতেও অসুবিধা নেই। কুরআনের বাংলা অনুবাদ ও তফসীর নিয়ে বসুন, নির্দিষ্ট অংশ পাঠ করুন এবং তার উপর সবাই মিলে

আলোচনা করুন। সে অংশটুকুর তাৎপর্য ও শিক্ষা আলোচনা করুন। এভাবে ধারাবাহিক ভাবে সাপ্তাহিক ক্লাশে আলোচনা করুন। নিয়মিত অংশ গ্রহণকারী প্রত্যেকের হাতেই কুরআনের বাংলা অনুবাদ ও তফসীর থাকলে ভালো হয়।

কুরআন ক্লাশে অংশ গ্রহণের জন্যে মানুষকে ডাকুন। পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, সহপাঠি, সহকর্মী, প্রতিবেশী এবং পরিচিত অপরিচিত সবাইকে ডাকুন। অনুরোধ করুন নিয়মিত অংশগ্রহণ করতে, অন্তত যেদিন পারে সেদিন অংশ নিতে। মহিলারা নিজেদের মধ্যে ক্লাশ চালু করুন অথবা পর্দার সাথে পুরুষদের সংগে বসুন। ছোটদেরকেও কুরআন ক্লাশে ডাকুন। কুরআন ক্লাশে মুসলিম অমুসলিম সকলেই অংশ নিতে পারেন।

১৫. দরসুল কুরআনের ব্যবস্থা করুন

'দরসে কুরআন' মানে কুরআন শিক্ষাদান। এটি মূলত একটি পরিভাষা। এর প্রচলিত অর্থ হলো, কুরআন সম্পর্কে ভালো জ্ঞান রাখেন, এমন কোনো ব্যক্তি কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কুরআনের কোনো নির্দিষ্ট অংশের উপর শিক্ষা মূলক আলোচনা পেশ করা। তিনি আলোচনাকে এভাবে সাজিয়ে পেশ করবেন ঃ

প্রথমত ঃ নির্দিষ্ট অংশ তিলাওয়াত করে শুনাবেন।

দ্বিতীয়ত ঃ মাতৃভাষায় সে অংশের অর্থ বলবেন।

তৃতীয়ত ঃ উক্ত অংশের পটভূমি বা শানে নযুল আলোচনা করবেন। এ ক্ষেত্রে অংশটি যে সূরার অন্তরভুক্ত, সেটি নাযিলের সময়কাল এবং তার পটভূমিও সংক্ষেপে বলবেন। প্রাসংগিকতার প্রতি লক্ষ্য রাখবেন।

চতুর্থত ঃ পটভূমির আলোকে আলোচ্য অংশের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করবেন।

পঞ্চমত ঃ কুরআনের উক্ত বক্তব্যের সাথে নিজেদের বর্তমান জীবন ও সমাজের তুলনা মূলক আলোচনা করবেন। নিজেদের অবস্থা খতিয়ে দেখবেন।

ষষ্ঠত ঃ আল্লাহর বাণীর আলোচ্য অংশে নিজেদের জন্য যেসব শিক্ষণীয় ও করণীয় বিষয় পাওয়া গেলো সেগুলো উল্লেখ (Point out) করবেন।

সপ্তমত ঃ কুরআনি শিক্ষার আলোকে উপস্থিত সকলকে নিজেদের জীবন ও সমাজ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করার আহ্বান জানাবেন।

অষ্টমত ঃ শ্রোতাদের প্রাসংগিক প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসার সহজ-সরল ও যথার্থ জবাব দেবেন। তথ্যভিত্তিক জবাব দেবেন।

এই হলো দরসে কুরআন। যিনি দরস পেশ করেন তাকে 'মুদাররিস বা শিক্ষক বলা হয়। দরসের ব্যবস্থা নিয়মিতও হতে পারে, অনিয়মিতও হতে

পারে। আপনি নিজ পরিবার পরিজনের মধ্যে আত্মীয় স্বজনকে একত্রিত করে, কিংবা মসজিদে অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা অন্য কোনো স্থানে দরসে কুরআন প্রদানের ব্যবস্থা করুন। নিজের পক্ষে সম্ভব না হলে আপনি আয়োজন করুন এবং দরস পেশ করতে পারেন এমন কাউকে দাওয়াত দিয়ে দরসে কুরআন পেশের ব্যবস্থা করুন।

এভাবে যেসব স্থানে দরসের মাধ্যমে কিছু লোক কুরআনের ব্যাপারে উৎসাহী হবে তাদের নিয়ে সাপ্তাহিক কুরআন ক্লাশ চালু করুন।

১৬. তফসীরুল কুরআনের অনুষ্ঠান করুন

'তফসীরুল কুরআন অনুষ্ঠান' বা 'তফসীর' কথাটি বাংলাদেশে সুপরিচিত। সাধারণত কুরআনের জ্ঞানে পারদর্শী কোনো ব্যক্তি এ ধরনের মাহফিলে কুরআনের কোনো অংশের উপর তফসীর পেশ করেন। তফসীর মাহফিলে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, নারী পুরুষ সর্ব শ্রেণীর মানুষেরই অংশ গ্রহণের সুযোগ থাকে। তফসীর মাহফিল, মাঠ, মসজিদ, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি যে কোনো স্থানে অনুষ্ঠিত হতে পারে এবং যে কোনো ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ বা প্রতিষ্ঠান এর আয়োজন করতে পারে।

তাই, যেখানেই যাদের পক্ষে সম্ভব, স্থানীয়ভাবে উদ্যোগ নিয়ে ব্যাপকভাবে তফসীর মাহফিলের আয়োজন করা প্রয়োজন। তফসীর মাহফিলের মাধ্যমে মানুষের মন যখন কুরআনের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তখন তাদেরকে নিয়মিত কুরআন ক্লাশে শরীক করাও সহজ।

১৭. কুরআন তিলাওয়াত শিখুন

আমাদের দেশে পরিবেশগত বিভিন্ন কারণে অনেকেই ছোট বেলায় কুরআন পড়া শিখতে পারেন না। এটা মুসলমানদের জন্যে খুশির বিষয় নয়। ছোট বেলায় যাদের কুরআন পড়তে শিখার সুযোগ হয়নি ; কিংবা পড়তে পারলেও শুদ্ধ করে পড়তে পারেন না, তাদের একটি জরুরি কর্তব্য হলো, কুরআন পড়তে এবং বিশুদ্ধভাবে পড়তে শিখার প্রতি মনোনিবেশ করা।

মরে রাখবেন, কুরআন আমাদের স্রষ্টা, মালিক, প্রতিপালক ও প্রভু মহান আল্লাহর বাণী। তিনি মানুষকে সঠিক পথ প্রদর্শনের জন্যে এ কালাম অবতীর্ণ করেছেন। সুতরাং এ কালাম পড়তে জানা এবং এর অর্থ ও মর্ম বুঝা দু'টোই মুসলমানদের জন্যে অতীব জরুরি বিষয়। এ ক্ষেত্রে অবহেলা করার কোনো সুযোগ নেই।

আজকাল সহজে ও স্বল্প সময়ে বিশুদ্ধভাবে কুরআন পড়তে শিখার বেশ ক'টি পদ্ধতি আবিষ্কার হয়েছে। এসব পদ্ধতিতে সারাদেশেই কুরআন শিখাবার চেষ্টা চলছে। আপনিও এসব পদ্ধতির ক্লাশে শরীক হয়ে দ্রুত কুরআন পড়তে শিখে নিন। এসব পদ্ধতিতে অল্প সময়ে কুরআন পাঠ শিখানো হয়। এভাবে যদি শিখার সুযোগ না পান, তবে আপনার আশ পাশের কোনো আলেমকে অনুরোধ করে তাঁর কাছ থেকে শিখে নিন। মোটকথা, আপনি কুরআন তিলাওয়াত শিখার জন্যে নিজের মধ্যে পেরেশানী সৃষ্টি করুন।

১৮. লেখার অভ্যাস থাকলে লিখুন

মানুষের প্রতি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার এক বিরাট অনুগ্রহ হলো, তিনি মানুষকে, 'বলে' এবং 'লিখে' মনের ভাব প্রকাশ করার যোগ্যতা দিয়েছেন। তাইতো আল্লাহ পাক বলেন ঃ 'আল্লামাহুল বায়ান' অর্থাৎ তিনি মানুষকে বলতে শিখিয়েছেন এবং 'আল্লামা বিল কলম'—তিনি কলম দ্বারা শিক্ষা দিয়েছেন।

যারাই আল্লাহর কালাম বা কালামের কিছু অংশ হলেও শিখেছেন, বুঝেছেন, তাদের কর্তব্য হলো নিজেরা তা মেনে চলবেন এবং অন্যদেরকেও তা শিখাবেন, বুঝাবেন এবং মেনে চলার জন্যে আহ্বান জানাবেন। মৌখিকভাবে এ দায়িত্ব পালন করাতো সকলেরই দায়িত্ব। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা যাদেরকে লেখার যোগ্যতাও দান করেছেন, এ দায়িত্ব পালনে কলম ধরাও তাদের কর্তব্য। তাই আপনি আপনার লেখার যোগ্যতাকে মানুষের কাছে আল্লাহর কালামের মর্মবাণী পৌঁছে দেবার জন্যে নিয়জিত করুন। কলমের সাহায্যে মানুষকে আল্লাহর বাণীর তাৎপর্য বুঝাবার চেষ্টা করুন। যারা আল কুরআন শিখে এবং শিক্ষা দেয় তারা শ্রেষ্ঠ মানুষ। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ, তাঁর বাণীও সর্বশ্রেষ্ঠ। সুতরাং যারা তাঁর বাণী শিখবে এবং মানুষকে শিখাবে, মানুষের মাঝে তাঁর কালামের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করবে, তারা যে মানুষের মাঝে শ্রেষ্ঠ মানুষ, তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ থাকতে পারে না।

আপনি কলম ধরুন। কুরআনের উপর লিখুন। সহজ ভাষায় কুরআনের বক্তব্য মানুষের সামনে তুলে ধরুন। কুরআনের আলোকে বিভিন্ন বিষয়ের উপর লিখুন। চিন্তা করুন, চিন্তা করলে আপনার চোখের সামনে ভেসে উঠবে হাজারো বিষয়। মৌলিক মানবীয় গুনাবলী, নৈতিক চরিত্র, দাম্পত্য জীবন, পারিবারিক জীবন, মানবাধিকার, সমাজিক সম্পর্ক, অর্থনীতি, রাজনীতি, ব্যবসা -বানিজ্য, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, সমাজ বিজ্ঞান, আন্দোলন, সংগঠন, আইন-আদালত, সরকার, প্রশাসন, শিক্ষা, সংস্কৃতি ইত্যাদি সকল বিষয়ে আপনি দিক

নির্দেশনা পাবেন আল কুরআনে। তাই কুরআনি আদর্শে শ্রেষ্ঠ মানুষ ও শ্রেষ্ঠ সমাজ গড়ার উচ্চাকাংখা নিয়ে আপনি এসব বিষয়ে লিখে যান অবিরাম।

লেখার মাধ্যমে আল্লাহর বাণী প্রচার করে যান। কলম চালিয়ে যান। পত্র পত্রিকায় লিখুন। বই পুস্তক লিখে প্রকাশ করুন। লেখক হিসেবে কলমের সাহায্যে আল্লাহর কালামকে বিজয়ী করার সংগ্রামে অবতীর্ণ হোন।

১৯. আসুন অংগীকার করি

এ যাবতকার আলোচনা থেকে আমরা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার কালাম আল কুরআনের ব্যাপারে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পেরেছি। তাই আসুন অংগীকার করি ঃ

১. আমি আল্লাহর বাণী আল কুরআনের প্রতি ঈমান পোষণ করবো।

২. আমরা আল কুরআন শিখবো, বুঝবো এবং আল কুরআনের শিক্ষা ও মর্ম উপলব্ধি করার জন্য আজীবন যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাবো।

৩. নিজের জীবনে আল কুরআনকে মেনে চলবো এবং আল কুরআনের নির্দেশিত পথে ও পন্থায় জীবন যাপন করবো।

৪. অন্যদেরকে আল কুরআন শিখাবো ও বুঝাবো। আল কুরআনের শিক্ষা ও মর্মবাণীর ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটানোর কাজে আত্মনিয়োগ করবো এবং কুরআনের আলো সর্বত্র ছড়িয়ে দেবো।

৫. মানুষকে আল কুরআনের নির্দেশিত পথে আসার এবং এর আদর্শ ও বিধি বিধানের ভিত্তিতে জীবন যাপন করার আহ্বান জানাবো।

৬. পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে এ সকল বিভাগে আল কুরআনের হুকুম আহকাম অনুশীলনের প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবো।

আসুন, আমরা আল্লাহর কিতাব আল কুরআনের ব্যাপারে আমাদের উপর অর্পিত এই অপরিহার্য দায়িত্ব ও কর্তব্যগুলো পালন করি। আসুন, আমরা এগুলো পালনের অংগীকার করি। আল্লাহর কালামের ব্যাপারে দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্যে যদি আমরা অংগীকার করি এবং আল্লাহর সাহায্য চাই, তবে অবশ্যি সচেষ্ট ব্যক্তিদের জন্যে আল্লাহর সাহায্য অবধারিত। আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ যারা আমার পথে চলার জন্যে প্রাণান্তকর চেষ্টা সাধনা করে, আমি অবশ্যিই আমার পথে চলতে তাদের সাহায্য করি।–(সূরা ২৯ আল আনকাবূত ঃ ৬৯)

প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যথার্থই বলেছেন ঃ

"আমি তোমাদের মাঝে দু'টো জিনিস রেখে যাচ্ছি। তোমরা যদি এ দু'টোকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরো, তবে কখনো বিপথগামী হবে না, হবে না ধ্বংস। শুনো, সে দু'টোর একটি হলো–আল্লাহর কিতাব (আল কুরআন) আর অপরটি হলো তাঁর রসূলের সুন্নাহ।"–(বিদায় হজ্জের ভাষণ)

আসুন, আমরা সবাই মিলে আল্লাহর রজ্জু আল কুরআনকে শক্ত করে আঁকড়ে ধরি। আসুন, জানার জন্যে কুরআন পড়ি, বুঝার জন্যে কুরআন পড়ি, শিখার জন্যে কুরআন পড়ি। আসুন আমরা মানার জন্যে কুরআন পড়ি। বুঝাবার ও শিখাবার জন্যে কুরআন পড়ি, প্রচার-প্রসার ও বাস্তবায়ণ করার জন্যে কুরআন পড়ি।

সত্যি আমরা যদি কুরআনকে আমাদের জীবনের সকল কর্মকাণ্ডের চাবিকাঠি হিসেবে গ্রহণ করতে পারি, আমরা যদি–

–আমাদের ব্যক্তি জীবনে,
–পরিবারে,
–সমাজের সকল স্তরে এবং
–রাষ্ট্র ও সরকারের সকল বিভাগে–

কুরআনের আদর্শ ও বিধান বাস্তবায়ণ ও প্রয়োগ করি, তবে অবশ্যি এ কুরআন আমাদের বানাবে–

–শ্রেষ্ঠ মানুষ,
–আদর্শ নাগরিক ও
–সেরা জাতি।

"তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর রজ্জু (আল কুরআন)-কে শক্ত করে আঁকড়ে ধরো এবং নিজেদের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করো না।"–(সূরা ৩ আলে ইমরান ঃ ১০)
(রচনাকাল ঃ ১৯৯৮ইং)

প্রশিক্ষণ নিন দক্ষতা উন্নয়ন করুন

১. প্রশিক্ষণ কি ?

আমাদের সকলেরই প্রশিক্ষণ নেয়া উচিত। প্রশিক্ষণ আমাদের দক্ষতা উন্নয়ন করবে, আমাদের মান বৃদ্ধি করবে এবং আমাদের লাভবান করবে আরো অনেক দিক থেকেই। সেসব কথা পরে আলোচনা করা যাবে। প্রথমে আসুন খতিয়ে দেখি, প্রশিক্ষণ বলতে কি বুঝায় ?

প্রশিক্ষণের আভিধানিক অর্থ হলো, কোনো বিশেষ বিষয়ে হাতে কলমে শিক্ষা দিয়ে কার্য সম্পাদনের উপযুক্ত বানানো বা হাতে কলমে শিক্ষাগ্রহণ করে কার্য সম্পাদনের উপযুক্ত হওয়া। প্রশিক্ষণের ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো ঃ Training. কোলকাতা থেকে প্রকাশিত SAMSAD ENGLISH-BENGALI DICTIONARY -তে Train মানে বলা হয়েছে ঃ

- "to prepare or be prepared for performance by instructions, practice, exercise, diet, etc."
- "to instruct and discipline."
- "to direct or aim."

শিক্ষাবিদদের প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ হলো ঃ বাছাই করা ব্যক্তিদের দায়িত্ব ও কর্মকেন্দ্রিক জ্ঞান, দক্ষতা, দৃষ্টিভংগি ও আচরণ উন্নয়নের উদ্দেশ্যে পরিচালিত যথোপযুক্ত কার্যক্রম।

কেউ কেউ বলেছেন ঃ পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনের উদ্দেশ্যে বাস্তব ধর্মী কাজের প্রস্তুতিমূলক অনুশীলনই হলো প্রশিক্ষণ।

আসলে সাংগঠনিক, প্রশাসনিক ও পেশাগত বিশেষ জ্ঞান, তথ্য, আচরণ, দৃষ্টিভংগি ও দক্ষতা উন্নয়নের উদ্দেশ্যে পরিচালিত যুক্তিসংগত ও বাস্তবধর্মী কার্যক্রমই হলো প্রশিক্ষণ।

আই. এল. ও. কনভেনশনে প্রশিক্ষণের পরিচয় প্রকাশ করা হয়েছে এভাবে ঃ

"the special kind of teaching and instruction in which goals are clearly determind and are usually and readily demonstrated and call for a degree of mastery."

২. শিক্ষা আর প্রশিক্ষণ এক জিনিস নয়

এ পর্যায়ে আমাদের মনে রাখতে হবে, শিক্ষা আর প্রশিক্ষণ এক জিনিস নয়। শিক্ষা হলো ব্যাপক ও সাধারণভাবে জ্ঞানার্জন প্রক্রিয়া। অন্যদিকে প্রশিক্ষণ হলো, সুন্দর ও সুচারুরূপে নির্দিষ্ট দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পাদনের বাস্তব অভিজ্ঞতা ও দক্ষতা অর্জন প্রক্রিয়া।

শিক্ষা হলো সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের উদার প্রক্রিয়া। প্রশিক্ষণ হলো, প্রতিভাকে বিশেষ দায়িত্ব পালন বা কর্মসম্পাদনের উপযুক্ত ও দক্ষ করে গড়ে তোলার প্রক্রিয়া।

শিক্ষা হলো জ্ঞানোন্নয়ন। প্রশিক্ষণ হলো মানোন্নয়ন।

শিক্ষা হলো জ্ঞানরাজ্যে নির্বিশেষে পরিভ্রমণ প্রক্রিয়া। প্রশিক্ষণ হলো জ্ঞানকে কাজে লাগাবার বিশেষ কৌশলার্জন প্রক্রিয়া।

শিক্ষা ব্যক্তি কেন্দ্রিক। ব্যক্তির দেহ, মন ও আত্মার সার্বিক ও সমন্বিত উন্নয়ন শিক্ষার লক্ষ্য।

প্রশিক্ষণ হলো কর্ম কেন্দ্রিক। উত্তমভাবে কর্ম সম্পাদনের উপযুক্ত যোগ্যতা, দক্ষতা ও দৃষ্টিভংগি অর্জনই প্রশিক্ষণের লক্ষ্য।

মূলত প্রশিক্ষণ হলো এমন কিছু শিক্ষণ কার্যক্রম যার মাধ্যমে কোনো সংগঠন, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের কর্মী, কর্মকর্তা ও দায়িত্বশীল সদস্যগণ নিজ নিজ সংগঠন, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠানের প্রত্যাশিত লক্ষ্যে পৌছার জন্যে প্রয়োজনীয় জ্ঞান, দৃষ্টিভংগি, দক্ষতা, পারদর্শিতা ও আচরণ অর্জন করতে এবং সেগুলোর কাংখিত প্রয়োগ কৌশল রপ্ত করতে সক্ষম হয়।

৩. প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য কি ?

উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য সম্পর্কেও একটা ধারণা পাওয়া গেলো। তবে উপরের আলোচনা থেকে প্রশিক্ষণের লক্ষ্য আরো ব্যাপক ও বিস্তৃত হতে পারে। প্রশিক্ষণ মূলত মানব জীবনের সকল ক্ষেত্র ও সকল কর্মের সাথেই সম্পৃক্ত হতে পারে। সকল কাজেরই প্রশিক্ষণ প্রদান করা ও প্রশিক্ষণ গ্রহণ করা উচিত। সে হিসেবে প্রশিক্ষণের লক্ষ্যও বিভিন্ন রকম। প্রশিক্ষণের লক্ষ্য হলো ঃ

১. পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন।

২. দায়িত্ব পালনে পারদর্শিতা উন্নয়ন।

৩. দৃষ্টিভংগি ও মনোভাব সংশোধন ও উন্নয়ন। ইতিবাচক দৃষ্টিভংগি সৃষ্টি।

৪. আচরণ সংশোধন ও উন্নয়ন।

৫. তথ্য আহরণ, তথ্য সমৃদ্ধি ও জ্ঞানোন্নয়ন।

৬. নৈতিক ও চারিত্রিক মানোন্নয়ন।

৭. আত্মিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি।

৮. পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন।

৯. আত্ম বিশ্বাস ও দায়িত্ব সচেতনতা সৃষ্টি।

১০. ব্যক্তিত্ব উন্নয়ন।

১১. কর্মকৌশল উন্নয়ন ও প্রায়োগিক দক্ষতা সৃষ্টি।

১২. দূরদর্শী, গতিশীল, চৌকশ, সুশৃংখল ও কর্তব্য পরায়ণ হতে সাহায্য করা।

১৩. যোগাযোগ, প্রভাব বিস্তার ও মটিভেশনের দক্ষতা সৃষ্টি।

১৪. শিক্ষাদানে পারদর্শিতা সৃষ্টি।

১৫. কাংখিত ও প্রত্যাশিত মানোন্নয়ন।

১৬. সমস্যা চিহ্নিত করণ, জটিলতা নিরসন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের দক্ষতা সৃষ্টি।

১৭. সচেতনতা সৃষ্টি।

১৮. সেবা করার যোগ্যতা ও মানসিকতা সৃষ্টি।

১৯. মেজাজের ভারসাম্য সৃষ্টি।

৪. প্রশিক্ষণ উপহার দেয় ছয় উপকারী বন্ধু

প্রশিক্ষণ আপনাকে ছয়জন বন্ধু উপহার দেবে। অন্য কথায় প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আপনাকে ছয়জন বন্ধু সংগ্রহ করতে হবে। আপনি যদি সত্যি সত্যি এ ছয় মহাজনকে আপনার বন্ধু বানাতে পারেন, তবে মনে রাখুন, এই ছয় বন্ধু সব কাজে আপনাকে সাফল্য এনে দেবে। সাফল্যের সব কাজ, সব পথ ওরা চেনে। এখন আপনার জন্যে জরুরি হলো, আপনিও ওদের চিনে নিন। হ্যাঁ, ওরা ছয় বন্ধু হলো ঃ

১. কি ?

২. কেন ?

৩. কোথায় ?

৪. কখন ?

৫. কে ?

৬. কিভাবে ?

ওদের ছয়জনকেই আপনার দরকার। কাউকেও বাদ দিয়ে কাউকেও নয়। ওরা সবাই মিলে একজোট একদল। ওরা একটি রসুনের ছয়টি কোষ। এ রসুনটির নাম হলো জিজ্ঞাসা ? অনুসন্ধিৎসা ?

–প্রতিটি কাজে আপনি ওদের ব্যবহার করুন।

–ওরা প্রত্যেকেই আপনাকে সাফল্যের পথ দেখাবে।

–ওরা প্রত্যেকেই আপনার অন্ধকার পথে আলো জ্বেলে দেবে।

–ওরা আপনাকে সব কাজে প্র্যাকটিক্যাল ও বাস্তবধর্মী বানাবে।

–ওরা আপনার অনুভূতি ও চেতনাকে জাগ্রত করে দেবে।

–ওরা আপনাকে সবকাজে লাভালাভ খতিয়ে দেখতে শেখাবে।

–ওরা আপনাকে বিজয়ের পথে কৌশলী বানাবে।

–ওরা আপনাকে চৌকস বানাবে।

জনাব আবদুর রহমানের এ ছয়জন বন্ধুই আছে। তিনি আন্তরিক প্রচেষ্টা, প্রশিক্ষণ ও অনুশীলনের মাধ্যমে এ ছয় মহাজনকে নিজের বন্ধু বানিয়ে নিয়েছেন। তার ছয় বন্ধু তাকে সব কাজে সাহায্য করে। জনাব আবদুর রহমান যে কাজই করতে মনস্থ করেন, কিংবা আদিষ্ট হন, অথবা আমন্ত্রিত হন, অথবা অগ্রসর হন, সে কাজটিই তার এই ছয় বন্ধু সাথে সাথে হাতে নিয়ে নেয়। হাতে নিয়ে তারা বসে থাকে না, শুরু করে দেয় অনুসন্ধান (investigation)। কাজটি সম্পর্কে তারা শুরু করে দেয় জিজ্ঞাসা। ছয় বন্ধুই অংশ নেয় জিজ্ঞাসাতেঃ

১ম বন্ধু ঃ কাজটি কি ? এর প্রকৃতি কি ? পরিচয় কি ? বৈশিষ্ট্য কি ---

২য় বন্ধু ঃ কাজটি আমি কেন করবো ? কেন আমার কাজটা করা উচিত ? কেন উচিত নয় ? কেন তা করা জরুরি ? কেন জরুরি নয় ? এতে লাভ কি ? ক্ষতি কি ? উপকার কি ? ----

৩য় বন্ধু ঃ কাজটির অবস্থান কোথায় ? উৎস কোথায় কোথায় ? শাখা কোথায় কোথায় ? সম্পর্ক কোথায় কোথায় ? আমাকে কোথায় কোথায় যেতে হবে ? ---

৪র্থ বন্ধু ঃ কাজটা কখন শুরু করতে হবে ? কখন শেষ করতে হবে ? কখন কতটুকু করতে হবে ? কখন পৌছুতে হবে ? কখন ফল পাওয়া যাবে ? তিনি কখন আসবেন ? কখন যাবেন ?----------

৫ম বন্ধু ঃ কে ? ব্যক্তি কে ? এর সাথে কে কে জড়িত ? কে দায়িত্বশীল ? কে দেবে ? কে নেবে ? কে পাবে ?

৬ষ্ঠ বন্ধু ঃ কিভাবে করতে হবে ? সঠিকভাবে করার পন্থা কি ? জেতার কৌশল কি ? কিভাবে লাভবান হওয়া যাবে ? কিভাবে সমাধান করা যাবে ? কিভাবে যেতে হবে ? কিভাবে বলতে হবে ? পাওয়ার উপায় কি ? কিভাবে হস্তগত হবে ?-----------

জনাব ম. রহমান একজন ডাক্তার। তিনিও সংগ্রহ করেছেন এ ছয় বন্ধুকে। প্রতিদিন কয়েক ডজন রোগী দেখেন তিনি। রোগী দেখার ক্ষেত্রে তার এ ছয় বন্ধু তাকে সাহায্য করে। ওরা তাঁকে একজন সফল চিকিৎসক বানিয়ে দিয়েছে। রোগী দেখার সময় ওরা তাকে সাহায্য করে এভাবে ঃ

১ম বন্ধু ঃ রোগটা কি ?

২য় বন্ধু ঃ রোগটা কেন হলো ?

৩য় বন্ধু ঃ রোগটার অবস্থান কোথায় ?

৪র্থ বন্ধু ঃ রোগটা কখন শুরু হয়েছে ?

৫ম বন্ধু ঃ রোগীটা কে ?

৬ষ্ঠ বন্ধু ঃ এই রোগীর এই রোগটা নিরাময় করার সঠিক পন্থা কি ?

জনাব আবদুর রহমান এবং জনাব ম. রহমান দু'জনকেই তাদের কাজে ও পেশায় এই ছয় বন্ধু সাফল্য এনে দিয়েছে। আপনি যে-ই হোন, আপনাকেও ওরা সাফল্য এনে দিবে যদি আপনি ওদের বন্ধু বানিয়ে নেন। আপনি ব্যবসায়ী হোন, আইনজীবি হোন, রাজনীতিবিদ হোন, কর্মী হোন, নেতা হোন, শিক্ষক হোন, ছাত্র হোন, চাকুরীজীবি হোন, গৃহিনী হোন, শাসক হোন, প্রশাসক হোন, যে-ই হোন আপনি, আপনার জীবনে এই বন্ধুদের অর্জন করুন। কিভাবে এই বন্ধুদের অর্জন করা যায়, প্রশিক্ষণ নিন। অনুশীলন করুন, অভ্যাস করুন এবং সাফল্য অর্জন করুন।

৫. প্রশিক্ষণের বৈশিষ্ট্য

উপরের তিনটি উপশিরোনামে যা কিছু আলোচনা করা হলো, তার আলোকে আমরা প্রশিক্ষণের বৈশিষ্ট্যসমূহ আলাদাভাবে সাজাতে পারি। আমরা এভাবে প্রশিক্ষণের বৈশিষ্ট্যগুলো সাজাতে পারি ঃ

১. প্রশিক্ষণের সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য থাকে।

২. প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য কেবল জ্ঞান দান নয়, বরং বিশেষ জ্ঞানদান করা এবং জ্ঞানকে সুন্দর ও চমৎকারভাবে কাজে লাগাবার দক্ষতা সৃষ্টি করা।

৩. শিক্ষা সাধারণভাবে সকলের জন্য, আর প্রশিক্ষণ বাছাই করা ও নির্বাচিত লোকদের জন্যে।

৪. শিক্ষার পরিধি সীমাহীন, কিন্তু প্রশিক্ষণের পরিধি নির্দিষ্ট।

৫. শিক্ষা তত্ত্বধর্মী, প্রশিক্ষণ বাস্তবধর্মী।

৬. শিক্ষা অধ্যয়ন ও অনুধাবন মুখী আর প্রশিক্ষণ অনুশীলন, অনুবর্তন, প্রয়োগ ও কর্মমুখী।

৭. শিক্ষার সময়সীমা দীর্ঘ, প্রশিক্ষণের সময়সীমা হ্রস্ব।

৮. শিক্ষা জ্ঞান বৃদ্ধি করে, প্রশিক্ষণ মান বৃদ্ধি করে।

৯. প্রশিক্ষণ ব্যক্তির কর্মে শৃংখলা, কৌশল ও পারদর্শিতা আনয়ন করে।

১০. প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে উপকরণের ব্যবহার, হাতে কলমে শিক্ষা ও ব্যবহারিক শিক্ষণ প্রাধান্য পায়।

১১. প্রশিক্ষণের প্রধান পঞ্চ স্তম্ভ হলো ঃ Aim, instruction, practice, exercise, descipline.

৬. প্রশিক্ষণ কাদের জন্য প্রয়োজন ?

নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে প্রত্যেকের জন্যেই প্রশিক্ষণ নেয়া জরুরি। কোনো ব্যক্তি যতো বড় জ্ঞানীই হোন না কেন, প্রশিক্ষণ ছাড়া কাংখিত কর্মদক্ষতা অর্জন করা তার পক্ষেও সম্ভব নয়। নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনীয় জ্ঞান, তথ্য, দক্ষতা, পারদর্শিতা, দৃষ্টিভংগি, আচরণ ও কর্মকৌশল অর্জন করার জন্যে অবশ্যি প্রশিক্ষণ নেয়া প্রয়োজন। প্রশিক্ষণ কাদের জন্যে প্রয়োজন ? এর সংক্ষিপ্ত জবাব হলো, প্রশিক্ষণ প্রয়োজন তাদের জন্য−

১. যারা কোনো পেশায় আত্মনিয়োগ করতে বা নিয়োগ প্রাপ্ত হতে চান।

২. যারা কোনো পেশায় নিয়োজিত হয়েছেন বা নিয়োগ লাভ করেছেন।

৩. যাদের পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন করা প্রয়োজন।

৪. যারা নতুন প্রযুক্তি ব্যবহার করতে চান।

৫. যারা প্রশাসনিক ও পরিচালনা ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনতে চান।

৬. যারা সাংগঠনিক বা পেশাগত মান/পদের উন্নতি করতে চান, তাদের জন্য।

৭. যাদের জ্ঞানোন্নয়ন প্রয়োজন, তাদের জন্যে।

৮. যাদের আত্মিক ও নৈতিক উন্নয়ন প্রয়োজন, তাদের জন্য।

৯. যাদের আচরণ ও দৃষ্টিভংগির সংশোধন ও উন্নয়ন প্রয়োজন তাদের জন্য।

১০. যারা সংগঠন পরিচালনা করেন, তাদের জন্য।

১১. যারা কার্যকর ও ফলপ্রসু দাওয়াত ও উপদেশ দান করতে চান।

১২. যারা সাফল্য ও বিজয় লাভের কৌশল আয়ত্ব করতে চান, তাদের জন্য।

১৩. যারা সেবা ও উন্নয়নের কাজ করতে চান, তাদের জন্য।

১৪. যারা সংস্কার ও সংশোধনের কাজ করতে চান, তাদের জন্যে।

১৫. যারা সুন্দর, সুখি ও উন্নত জীবন লাভ করতে চান, তাদের জন্য।

১৬. যারা জনমতকে স্বপক্ষে আনতে চান, তাদের জন্যে।

৭. প্রশিক্ষণ নেয়া প্রয়োজন আপনারও

আপনিও প্রশিক্ষণ নিন। আপনারও প্রশিক্ষণ নেয়া প্রয়োজন। কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা প্রদর্শন করতে চান? প্রশিক্ষণ নিন। কর্মকৌশল আয়ত্ব করতে চান? প্রশিক্ষণ নিন। আপনি বড় কর্মকর্তা হোন আর কর্মচারী হোন–প্রশিক্ষণ নিন। আপনি ব্যবসায়ী হোন, ব্যবস্থাপক হোন–প্রশিক্ষণ নিন। শিক্ষক হোন, আহ্বায়ক হোন–প্রশিক্ষণ নিন। কর্মী হোন আর নেতা হোন, প্রশিক্ষণ নিন। কর্মহীন হোন আর কর্মজীবি হোন প্রশিক্ষণ নিন। প্রশিক্ষণই খুলে দেবে আপনার উন্নতির দুয়ার, সাফল্য ও সৌভাগ্যের দুয়ার।

–যে কাজটি আপনি করতে পারেন না, প্রশিক্ষণ নিলে সেটি আপনি সহজেই করতে পারবেন।

–যে কাজটি আপনি করতে পারেন, প্রশিক্ষণ নিলে সেটি আপনি ভালোভাবে করতে পারবেন।

–যে কাজটি আপনি ভালোভাবে করতে পারেন, প্রশিক্ষণ নিলে সেটি আপনি দক্ষতার সাথে করতে পারবেন।

–যে কাজটি আপনি দক্ষতার সাথে করতে পারেন, প্রশিক্ষণ নিলে সে কাজ আপনি কম সময়ে করতে পারবেন এবং সে কাজে অন্যদের ছাড়িয়ে এগিয়ে যেতে এবং উপরে উঠে যেতে পারবেন।

অবশ্যি আপনার প্রশিক্ষণ নেয়া প্রয়োজন। প্রশিক্ষণ আপনাকে আত্মবিশ্বাসী করবে, আপনার জ্ঞানকে পাকা ও পরিশুদ্ধ করবে। প্রশিক্ষণ আপনাকে তথ্য সমৃদ্ধ করবে। আপনার মধ্যে পেক্ষাপট, পটভূমি ও পরিবেশের প্রেক্ষিতে কর্মকৌশল অবলম্বনে নৈপুণ্য সৃষ্টি করবে। প্রশিক্ষণ আপনাকে সাধারণের মধ্য থেকে বিশেষকে খুঁজে বের করার বৈশিষ্ট্য দান করবে।

হ্যাঁ, প্রশিক্ষণ আপনাকে বিশেষত্ব দান করবে। নির্বিশেষ থেকে বিশেষকে চিহ্নিত করার দক্ষতা আপনার মধ্যে সৃষ্টি করবে। প্রশিক্ষণ নিলে একটি বড় জন সমাবেশেও আপনি একজন বিশেষ ব্যক্তিকে দেখতে পাবেন, যাকে আপনার প্রয়োজন। বহু রকম বইয়ের একটি বড় স্তুপের মধ্যেও একটি বিশেষ বইয়ের উপর আপনার নজর পড়বে, যেটি আপনি খুঁজছেন। বহু যোগ্য প্রার্থীর মধ্যেও এমন একজনকে আপনি চিহ্নিত করতে পারবেন, আপনার সহকারী হিসেবে

নিযুক্তি লাভের জন্য যিনি অন্যদের চেয়ে উত্তম। দশটির মধ্যে একটি বাছাই করে গ্রহণ করার অফার পেলে আপনার দৃষ্টি ঠিক সেটির উপর গিয়েই পড়বে, যেটি আপনার বেশি প্রয়োজন।

আপনার অনেক জ্ঞান থাকতে পারে। অনেক বড় পণ্ডিত হতে পারেন আপনি। কিন্তু জ্ঞানই সবকিছু নয়। জ্ঞানের সাথে সমন্বয় হওয়া চাই গুণের। প্রশিক্ষণই পারে আপনার জ্ঞানের সাথে গুণের সমন্বয় ঘটাতে এবং আপনার মধ্যে জ্ঞানকে কাজে লাগাবার গুণ সৃষ্টি করতে। প্রশিক্ষণ জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে, জ্ঞানীকে গুণান্বিত করে।

প্রশিক্ষণ আপনার জীবনে শৃংখলা আনবে, আপনাকে পরিকল্পনা মনা করবে। আপনার মধ্যে সময়ানুবর্তিতা, নিয়মানুবর্তিতা, আনুগত্য ও শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি করবে। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আপনি অর্জন করতে পারেন সাংগঠনিক দক্ষতা, ব্যবস্থাপনার পারদর্শিতা, কাজ আদায় করার কৌশল, সমন্বয়ের নৈপুণ্য আর ধৈর্য ও সহনশীলতার প্রবণতা।

আপনার প্রশিক্ষণ নেয়া উচিত। প্রশিক্ষণ আপনাকে গতিশীল, সাবলীল ও সহজ হতে সাহায্য করবে। আপনার মধ্যে কর্মের প্রেরণা সৃষ্টি করবে। আপনি খুঁজে পাবেন যোগাযোগ ও সম্পর্ক উন্নয়নের কৌশল। সমস্যা খুঁজে বের করার উপায় এবং সমাধানের সঠিক রাস্তা।

প্রশিক্ষণ আপনার আচরণকে উন্নত করবে। আপনাকে ভদ্র, মার্জিত, উন্নত, উদার ও রুচিশীল হতে সাহায্য করবে। আপনার মধ্যে সৃষ্টি করবে মননশীলতা, দূর করবে দৃষ্টির সংকীর্ণতা। প্রশিক্ষণ আপনাকে সাহায্য করবে রোগমুক্ত সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে। সাহায্য করবে সদা সতেজ, বন্ধুসুলভ, অমায়িক ও প্রফুল্ল থাকতে।

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আপনি আত্মিক উন্নতি, নৈতিক দৃঢ়তা ও চারিত্রিক বলিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেন।

এভাবে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে আপনি অধিষ্ঠিত হতে পারেন প্রিয় ব্যক্তিত্ব, প্রিয় নেতৃত্ব ও প্রিয় কর্তৃত্বের আসনে। অর্জন করতে পারেন অন্যদের আস্থা। দ্রুত এগিয়ে যেতে পারেন সাফল্যের সিঁড়ি বেয়ে। অর্জন করতে পারেন বিরল কৃতিত্ব, সুনাম ও গৌরব। দূর করতে পারেন বেকারত্ব, অচলত্ব ও স্থবিরতা। নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেন সবখানে, সবকাজে। খুলতে পারেন বদ্ধ তালা, ভাংগতে পারেন অন্ধকার, জাগাতে পারেন স্তব্ধ পাড়া। তাই আসুন, প্রশিক্ষণ নিন, এবার জাগান সাড়া।–(রচনাকাল ঃ জানুয়ারি ১৯৯৯ইং)

৭

সুবক্তা হোন সত্যের আলো ছড়িয়ে দিন

১. বক্তৃতার ক্রিয়াশক্তি

সব মানুষই বক্তৃতা করেন না। তবু বক্তৃতা মানব জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সমাজে কিছু লোক বক্তৃতা করেন, বাকীরা বক্তৃতা শুনেন। শ্রোতার তুলনায় বক্তার সংখ্যা অবশ্যি কম। অনেক কম। অনেক বক্তা আছেন, যাদের বক্তৃতায় যাদুশক্তি আছে। তাঁরা বক্তৃতা শুরু করলে মানুষ মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে শুনে। বহু দূর দূরান্ত থেকে মানুষ তাদের বক্তৃতা শুনার জন্যে সমবেত হয়।

কারো কারো বক্তৃতা অগ্নিবর্ষী। তাদের বক্তৃতায় শ্রোতারা উন্মত্ত ও উত্তেজিত হয়ে উঠে। কারো কারো বক্তৃতা উদ্দীপনাময়। তাদের বক্তৃতায় শ্রোতারা উচ্ছ্বসিত ও উদ্বেলিত হয়ে উঠে। কারো বক্তৃতা মর্মস্পর্শী, তাদের বক্তৃতায় শ্রোতারা আবেগাপ্লুত হয়ে পড়ে, এমনকি অশ্রুপাত পর্যন্ত করে। কারো বক্তৃতা শানিত যুক্তির ধারালো অস্ত্রের মতো, তাতে শ্রোতাদের বুদ্ধি বিবেক জাগ্রত হয়ে উঠে, চিন্তার রাজ্যে আন্দোলন সৃষ্টি হয়। আবার কিছু বক্তা শিল্প সৌন্দর্যে, কেউবা রস-মাধুর্যে, কেউবা মনোহরী চাতুর্যে শ্রোতাদের আকৃষ্ট করেন।

এভাবে বক্তারা শ্রোতাদের প্রভাবিত করেন। কোনো ব্যক্তি, দল বা আদর্শের প্রতি উদ্বুদ্ধ করেন। কোনো কিছুর প্রতি আকৃষ্ট করেন। সম্মোহিত করে স্বমতে আনেন। কিংবা কারো বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলেন। আবার কারো প্রতি ভক্তিশ্রদ্ধা জাগিয়ে তোলেন। অথবা উদ্দীপ্ত করেন কোনো ভালো কাজে। ভালো বাগ্মিদের ভক্তের ভীড়ে সভাস্থল ভরে যায়। আপনার অবস্থা কী ? আপনি কি বক্তা ? নাকি শুধুই শ্রোতা ?

২. আপনিও বক্তৃতা করুন

আপনিও বক্তৃতা করুন। আপনি কেন সবসময় শ্রোতা থাকবেন ? আপনার কি কোনো আদর্শ নেই ? আপনার জীবনের কি কোনো মিশন নেই ? আপনি কি চান না মানুষের মধ্যে বিশেষ ধরনের দৃষ্টিভংগি ও চিন্তা-চেতনা সৃষ্টি হোক? মানুষ আপনার পসন্দের জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করুক ? মানুষ আপনার দল বা আপনার পসন্দের দলকে সমর্থন করুক, তা-কি আপনার কাম্য নয় ?

আপনি কি চান না সমাজ থেকে অন্যায়, অনাচার, সন্ত্রাস, দুর্নীতি এবং যাবতীয় অশান্তি ও দুষ্কৃতি দূর হোক ? আপনি কি চান না সমাজে সত্য, ন্যায়, সততা, সুকৃতি, সেবা ও যাবতীয় কল্যাণ প্রতিষ্ঠিত হোক ? আপনি কি চান না মানুষ সত্যের পক্ষে ঐক্যবদ্ধ হোক এবং অসত্য ও মন্দের বিরুদ্ধে হোক বিক্ষুব্ধ ? এসব ব্যাপারে আপনি কি আপনার কোনো দায়িত্ব অনুভব করেন না ? যদি এসব ব্যাপারে আপনার জবাব পজেটিভ হয়, তবে অবশ্যি আপনি বক্তৃতা করুন। কারণ–

১. বক্তৃতাতে আছে যাদুশক্তি।
২. বক্তৃতা আদর্শ প্রচারের বলিষ্ঠ হাতিয়ার।
৩. বক্তৃতা শ্রোতার বিবেককে নাড়া দেয়, সচেতন করে তোলে।
৪. বক্তৃতা জ্ঞান দান করে, বুঝ সৃষ্টি করে।
৫. বক্তৃতা শ্রোতার ভুল ধারণা দূর করে।
৬. বক্তৃতা শ্রোতার মনে ভক্তি ও ভালোবাসা সৃষ্টি করে।
৭. বক্তৃতা শ্রোতাদের মতামত সৃষ্টি করে, সিদ্ধান্ত শক্তি যোগায়।
৮. বক্তৃতা শ্রোতাদের সমর্থন আদায় করে, জনমত সৃষ্টি করে।
৯. বক্তৃতা বক্তার জনপ্রিয়তা সৃষ্টি করে।
১০. বক্তৃতা বক্তার ব্যক্তিত্ব তৈরি করে।
১১. বক্তৃতা শ্রোতাদের আবেগাপ্লুত করে।
১২. বক্তৃতা শ্রোতাদের উদ্বুদ্ধ ও উদ্বেলিত করে।
১৩. বক্তৃতা উত্তেজিত করে, ক্ষোভ সৃষ্টি করে।
১৪. বক্তৃতা শ্রোতাদের স্বমতে আনার সম্মোহনী শক্তি।
১৫. বক্তৃতা ঐক্যমতে আনার এবং ঐক্যবদ্ধ করার মোক্ষম হাতিয়ার।
১৬. বক্তৃতা মানুষকে কাজে লাগাবার সুনিপুণ কৌশল।
১৭. বক্তৃতা মনের উপর প্রভাব সৃষ্টি করে, মানসিকতা তৈরি করে।
১৮. বক্তৃতা শ্রেষ্ঠ যোগাযোগ প্রক্রিয়া, বাস্তব গণমাধ্যম।
১৯. বক্তৃতা সমাজ গড়ার এবং সমাজ ভাঙ্গার হাতিয়ার।
২০. বক্তৃতায় আছে চুম্বকের শক্তি।
২১. বক্তৃতা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় ক্ষমতার যুদ্ধ জয়ের শানিত অস্ত্র।

তাই আপনিও বক্তৃতা করুন। দেখছেন না, বক্তৃতা কতো কাজ করে দিতে পারে ! আপনিও বক্তৃতার সাহায্যে কাজ আদায় করুন, উদ্দেশ্য হাসিল করুন এবং নিজের মিশন সফল করুন।

৩. বক্তৃতা কী ?

হ্যাঁ, বক্তৃতা একটি শক্তিশালী কৌশল। আপনি এ মূল্যবান কৌশল আয়ত্ব করুন। বক্তৃতা মানে 'বক্তব্য', অর্থাৎ যা বলা বা ব্যক্ত করা হয়। মুলত বক্তৃতা হলো, সমবেত জনমণ্ডলীর সন্মুখে, বা অডিও, কিংবা অডিও-ভিজুয়াল, অথবা ইন্টারনেট প্রচার ও যোগাযোগ মাধ্যমের সাহায্যে বিশেষ উদ্দেশ্যে, বিশেষ বিষয়ে এবং বিশেষ বা নির্বিশেষ জনমণ্ডলীকে লক্ষ্য করে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বিশেষ ভংগিতে উপস্থাপিত সুবিন্যস্ত উক্তি, কথা, বক্তব্য ও আলোচনা।

এটি একটি জটিল ও লম্বা সংজ্ঞা হলেও আমরা যদি এর থেকে বক্তৃতার উপদানগুলো আলাদাভাবে সাজিয়ে নিই, তবে নিশ্চয়ই বক্তৃতা আমাদের কাছে সহজ হয়ে ধরা দেবে। জী-হ্যাঁ, এ সংজ্ঞা থেকে আমরা জানতে পারলাম, বক্তৃতার মৌলিক উপাদানগুলো হলো ঃ

১. বক্তা।

২. বক্তৃতার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

৩. বক্তৃতার বিষয়।

৪. বক্তৃতা উপস্থাপনার ভংগি।

৫. কথা বা ভাষার বিন্যাস।

৬. উপস্থাপনার সময়কাল।

৭. শ্রোতৃমণ্ডলী।

৮. বক্তা ও শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে সংযোগ মাধ্যম।

এগুলো বক্তৃতার মৌলিক উপাদান। এছাড়াও আছে কিছু আনুষঙ্গিক উপাদান। উপাদানগুলোর দক্ষ ও সফল প্রয়োগের উপরই নির্ভর করে বক্তৃতার সাফল্য। উপাদানগুলো সম্পর্কে আমরা সামনে আলোচনা করবো।

৪. বক্তৃতা কতো রকম ?

বক্তৃতা যে কতো রকম, কতো বিচিত্র তার ধরণ-প্রকৃতি, সে হিসেব কষা বড়ো কঠিন। আমাদের দেশে এবং তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশেই বক্তৃতার বৈচিত্র ব্যাকরণ বিচারে বর্ণনা করা ভারী আয়াসসাধ্য। তবে কতিপয় প্রকার প্রকরণ তো প্রথায় পরিণত হয়েছে। উদ্দেশ্য, আয়োজন ও কাঠামোগত দিক থেকে বক্তৃতার ধরণ বৈচিত্র লক্ষ্য করুন ঃ

১. জনসভা বা সমাবেশে নেতা বা কর্তা ব্যক্তিদের বক্তৃতা।

২. অডিও বা অডিও ভিজুয়াল যোগাযোগ মাধ্যমে বক্তৃতা।

৩. পার্লামেন্টে সংসদ সদস্যদের বক্তৃতা।

৪. দলীয় কর্মী সভায় বক্তৃতা।

৫. দলীয় পরামর্শ ও নির্বাহী পরিষদের সভায় বক্তৃতা।

৬. অধঃস্তন নির্বাহী কর্মচারীদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা।

৭. উপ কমিটিতে সুপারিশ তৈরির উদ্দেশ্যে বক্তৃতা।

৮. মতামত সৃষ্টি কিংবা আদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে সুধী সমাবেশে বক্তৃতা।

৯. সেমিনারের বক্তৃতা।

১০. সিম্পোজিয়াম বা আলোচনা সভার বক্তৃতা।

১১. বিতর্ক অনুষ্ঠানের বক্তৃতা।

১২. কনফারেন্স বা সিণ্ডিকেট বক্তৃতা।

১৩. ছাত্রদের উদ্দেশ্যে শ্রেণী কক্ষে শিক্ষকের বক্তৃতা।

১৪. প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষকের বক্তৃতা।

১৫. ধর্মীয় গ্রন্থের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপস্থাপন করে দেয়া বক্তব্য।

১৬. বিশেষ উদ্দেশ্যে জনতাকে উত্তেজিত করার জন্যে বক্তৃতা।

১৭. উত্তেজিত ও বিশৃংখল জনতাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্যে বক্তৃতা।

১৮. শান্তি স্থাপন এবং উন্নয়ন ও সেবা কাজে উদ্বুদ্ধ করণমূলক বক্তৃতা।

১৯. পণ্য বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে ক্যানভাসারের বক্তৃতা

আমাদের দেশে শ্রেণী, ক্ষেত্র ও পরিবেশ ভেদে উপরোক্ত বিভিন্ন ধরনের বক্তৃতা চালু রয়েছে। নিজ নিজ অবস্থানে প্রত্যেক প্রকার বক্তৃতারই বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। আজকের এ ক্ষুদ্র পরিসরে প্রত্যেক প্রকার বক্তৃতার বৈশিষ্ট্য আলাদা আলাদা বর্ণনা করার সুযোগ নেই। আমরা এখানে সামগ্রিকভাবে কিছু দিক নির্দেশনা গ্রন্থস্থ করবো। তবে এতোটুকু কথা মনে রাখা দরকার, বক্তৃতার যেসব উপাদান রয়েছে, বিভিন্ন প্রকার বক্তৃতায় সেগুলোর বৈশিষ্ট্যগত পার্থক্য সৃষ্টি হয়।

উপরে আমরা বক্তৃতার যেসব প্রকার প্রকরণের কথা বললাম, এর মধ্যে আপনি কোন্ প্রকারের বক্তা ? এতো প্রকারের মধ্যে আপনি কি শুধু এক প্রকারের বক্তা ? নাকি কয়েক প্রকারের বক্তা ? নাকি আপনি সর্বপ্রকার বক্তা ?

তবে আপনার প্রকার যা-ই হোক, আপনি দক্ষ, প্রভাব বিস্তারকারী ও জনপ্রিয় বক্তা হোন। এজন্যে কৌশল আয়ত্ব করুন।

সময় ও প্রস্তুতির দিক থেকে আপনাকে দুই ধরনের বক্তৃতা করতে হতে পারে ঃ

১. পূর্ব নির্ধারিত বক্তৃতা Set speech।
২. উপস্থিত বক্তৃতা Extempore speech।

নির্ধারিত বক্তৃতার ক্ষেত্রে তো আপনি প্রস্তুতি নেবার সুযোগ পাবেন। কিন্তু উপস্থিত বক্তৃতার ক্ষেত্রে তো সে সুযোগ পাওয়া যায় না। আপনি হঠাৎ বক্তৃতা করার জন্যে আদিষ্ট বা অনুরোধপ্রাপ্ত হলেন। তখন আপনাকে উপস্থিত ক্ষেত্রেই বক্তৃতা করতে হবে। তাই বক্তৃতার মৌলিক কৌশলগুলো আপনার আয়ত্বে থাকা বাঞ্ছনীয়।

৫. উপস্থিত বক্তার পূর্ব প্রস্তুতি

ধরে নিন, ঠিক হলো, এখনই আপনাকে বক্তৃতা করতে হবে। এমতাবস্থায় আপনি কি করবেন? যদি উপস্থিত ক্ষেত্রে আপনাকে বক্তৃতা করতে বলা হয়, তবু আপনি বক্তৃতা করতে পিছপা হবেন না। আপনি রাজি হয়ে যান। এ ক্ষেত্রে যদি আপনি একটি সফল বক্তৃতা করতে পারেন, তাহলে আপনার ব্যক্তিত্বের প্রভাব এবং জনপ্রিয়তা দারুণভাবে বেড়ে যাবে। ভবিষ্যতে মানুষ আপনার বক্তৃতা শুনতে থাকবে। উপস্থিত বক্তৃতার পূর্বে আপনি যতোটুকু সময় পান, মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে নিন। আপনি এমনটি করুন ঃ

১. নিজের মধ্যে মজবুত আস্থা, সাহস ও আত্মবল সৃষ্টি করুন।
২. বিষয়বস্তু আগাগোড়া একবার চিন্তা করে নিন।
৩. ভেবে নিন, আপনি এ বক্তব্যের মাধ্যমে কি উদ্দেশ্য হাসিল করতে চান?
৪. বিষয়ের প্রধান প্রধান পয়েন্টগুলো মনে মনে বিন্যস্ত করুন।
৫. কোন্ বিশেষ পয়েন্ট, যুক্তি, ভাষা, ভঙ্গি, উপমা ও আবেদন পেশ করে আপনি অন্যদের ছাড়িয়ে গিয়ে অনন্যতা অর্জন করতে পারবেন, সেটা খানিকটা ভেবে নিয়ে বক্তৃতা শুরু করুন।

এভাবে উপস্থিত বক্তৃতা করেও আপনি সফল হতে পারেন। আপনি চমকে দিতে পারেন শ্রোতা-দর্শকদের। আপনার মিশন এবং লক্ষ্যকে কার্যকরভাবে ছড়িয়ে দিতে পারেন জনগণের মাঝে। আমার মনে পড়ে, ঢাকায় অনুষ্ঠিত সার্কের প্রতিষ্ঠা শীর্ষ সম্মেলনে শ্রীলংকার প্রেসিডেন্ট জয়বর্ধন Extempore বক্তৃতা করে চমক সৃষ্টি করেছিলেন। অন্য সকলের মধ্যে তাঁর বক্তৃতার কথা এখনো আমার মনে পড়ে।

৬. নির্ধারিত বক্তার পূর্ব প্রস্তুতি

বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বক্তৃতা সম্পর্কে বক্তা আগে থেকেই অবহিত থাকেন। বক্তৃতার উদ্দেশ্য, বিষয় এবং সময় পূর্বেই নির্ধারিত হয়। আপনি যখন এ রকম

নির্ধারিত বক্তৃতা দেবেন, তার আগে আপনি ভালোভাবে প্রস্তুতি নেবার সময় পাচ্ছেন। আপনি একটি চমৎকার বক্তৃতা করবার প্রস্তুতি নিয়ে নিন। কিভাবে নেবেন সে প্রস্তুতি?

১. সর্বপ্রথম আপনি মানসিকভাবে সিদ্ধান্ত নিন, আপনি একটি অনন্য, সমৃদ্ধ Resourceful, আকর্ষণীয় ও চমৎকার বক্তৃতা দেবেন।

২. বক্তৃতার বিষয়, শ্রোতা, পরিবেশ ও গুরুত্ব ভালোভাবে চিন্তা করে নিন।

৩. এ বক্তৃতার মাধ্যমে আপনি শ্রোতাদের কোন্ লক্ষ্যে পৌঁছাতে চান এবং কী ধারণা দিতে চান? তা ভালোভাবে উপলব্ধি করুন।

৪. পড়ালেখা করুন, প্রয়োজনীয় তথ্য, রেফারেন্স ও দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করুন।

৫. গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো নোট করে নিন। (লিখিত বক্তৃতা পেশ করতে হলে পাণ্ডুলিপি তৈরি করুন)।

৬. আপনি বক্তা হিসেবে নতুন হয়ে থাকলে অনুশীলন করুন। প্রয়োজনে প্রচুর অনুশীলন করুন। ঘরে বক্তৃতা দিন।

এভাবে মজবুত মানসিক দৃঢ়তা, প্রবল ইচ্ছাশক্তি, পূর্ণাংগ প্রস্তুতি এবং চমৎকার আয়োজন নিয়ে আত্মবিশ্বাসী প্রফুল্ল মনে মঞ্চে গিয়ে উপস্থিত হোন। আপনার মঞ্চে উপস্থিতিকেও অনুপম এবং আকর্ষণীয় করে তুলুন।

৭. আকর্ষণীয় উপস্থিতি

আপনি নিশ্চয়ই মানসিক ও বিষয়গত পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়েই মঞ্চে উপস্থিত হয়েছেন। এখন যে কোনো সময়, কিংবা নির্ধারিত সময়েই আপনাকে অনুরোধ করা হবে বক্তব্য উপস্থাপনের জন্যে। কিন্তু উপস্থাপন সম্পর্কে বলার আগে আপনার উপস্থিতির বিষয়েও দুয়েকটি কথা বলা দরকার। আপনার উপস্থিতির ভংগি কেমন? অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শ্রোতা-দর্শকদের মনোযোগ কিন্তু বক্তা কেন্দ্রিক হয়ে থাকে। তাই বক্তার সুন্দর উপস্থিতির বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং আপনি–

ক. ঠিক সময় উপস্থিত হোন।

খ. সভার শুরুতে উপস্থিত হতে না পারলে ঠিক কখন এবং ক'টায় উপস্থিত হবেন, তা পূর্বেই সভাকে অবহিত করার ব্যবস্থা করুন। আপনার উপস্থিতির বিষয়ে আয়োজক এবং শ্রোতা-দর্শকদের নিশ্চিত করুন।

গ. সভাকক্ষে কিংবা মঞ্চে আগমনকালে যদি অপর কেউ বক্তৃতারত না থাকেন, তবে উপস্থিত শ্রোতা দর্শকদের সাথে সালাম বিনিময়

করুন। হাসিমুখে প্রবেশ করুন। হাত নেড়ে তাদের প্রতি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করুন।

ঘ. পরিবেশ ও অবকাশ থাকলে তাদের বলুন ঃ আপনারা কেমন আছেন ?

ঙ. সুযোগ থাকলে মঞ্চে উপবিষ্ট অন্যদের সাথে হাত মিলিয়ে নিন এবং হাসিমুখে কুশল বিনিময় করুন।

চ. এবার বসুন। আপনার জন্যে নির্ধারিত আসনে বসুন। এমন আসনে বসবেন না, যেখান থেকে স্থান বদলের প্রয়োজন পড়তে পারে।

ছ. বসার পরও কিছুক্ষণ হাসিমুখে থাকুন।

জ. গুরু গম্ভীর এবং আত্মম্ভরী উপস্থিতি বর্জন করুন।

৮. চমৎকার উপস্থাপন করুন

বক্তব্য উপস্থাপনের জন্যে এই মাত্র আপনার প্রতি অনুরোধ জ্ঞাপন করা হলো। আপনি উঠে আসুন বক্তব্য রাখার জন্যে। কিন্তু কিভাবে আসবেন আর কিভাবে রাখবেন বক্তব্য ? হ্যাঁ, এমনটি করুন ঃ

১. হাসিমুখে প্রফুল্ল বদনে এগিয়ে আসুন। দেখবেন, আপনার হাসিমুখ ও প্রফুল্লতা শ্রোতা-দর্শকদেরও প্রফুল্ল করে তুলবে। তারা আপনার প্রতি পূর্ণ মনোযোগী, এমন কি উদগ্রীব হয়ে উঠবে।

২. দাঁড়িয়েই বক্তব্য শুরু না করে কয়েক সেকেন্ড দর্শক শ্রোতাদের দেখে নিন। হাসিমুখে তাদের প্রতি তাকান। পূর্বে সালাম দেবার সুযোগ পেয়ে না থাকলে এ সুযোগে সালাম দিয়ে নিন।

৩. এভাবে ৫/১০ সেকেণ্ডের মধ্যে দর্শক শ্রোতাদের সাথে মানসিক সংযোগ স্থাপন করে শুরু করুন আপনার বক্তৃতা।

৪. শুরুতে একটু নাকটীয় ভংগি, একটি আকষর্ণীয় ঘটনার অবতারণা, কিংবা কয়েকটি শিক্ষণীয় সরল কথা আপনার পুরো বক্তৃতাকে গো-গ্রাসে গেলার পরিবেশ তৈরি করবে।

৫. শ্রোতা-দর্শকদের যদি আপনার পরিচয় জানা না থাকে, কিংবা পরিচয় দেয়া না হয়ে থাকে, তবে আপনার পরিচয় দিয়ে বা সঠিক পরিচয় দিয়ে বক্তব্য শুরু করুন। অনেক সময় এমন হয়, ঘোষক-বক্তার পরিচয় দিতে ভুলে গেছেন, কিংবা সঠিক পরিচয় দিতে পারেননি, এমতাবস্থায় আপনি নিজের সঠিক পরিচয় দিন। শুরুতেই বক্তার পরিচয় জানা না থাকলে শ্রোতা-দর্শকরা সাধারণত বক্তার প্রতি মনোযোগী হয় না। তবে পরিচয় দিতে

গিয়ে আপনি নিজের সম্পর্কে বাড়াবাড়ি করবেন না, নিজেকে বড় করে জাহির করতে যাবেন না। এটা শ্রুতিকটু। শুধু বিনয়ের সাথে ছোট করে নিজের মূল পরিচয়টা বলে দিন।

৬. কণ্ঠস্বর ঃ পুরো বক্তব্যের সময়টাতে আপনি আপনার কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখুন। কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখা মানে পরিবেশ ও প্রয়োজনের চাইতে অধিক উচ্চস্বরে বক্তব্য না রাখা। অযথা চিৎকার করবেন না। মাইক্রোফোনের ভলিউম দেখে নিন। ভদ্র শ্রোতামণ্ডলীর উপযোগী আওয়াজে বক্তব্য রাখুন। এতটা নিচু স্বরেও বক্তব্য রাখবেন না, যাতে শ্রোতাদের কান বাড়িয়ে আপনার বক্তব্য শুনতে হয়। তবে বক্তব্য বিষয়ের বলিষ্ঠতা ও স্বাভাবিকতার ভিত্তিতে কণ্ঠস্বরের কিছুটা উঠানামা হতে পারে। এ ক্ষেত্রে মনে রাখার বিষয় হলো ঃ

ক. কণ্ঠস্বর স্বাভাবিক রাখুন।

খ. বক্তব্য বিষয়ের ভিত্তিতে কিছুটা উঠানামা করুন।

গ. কর্কশ কণ্ঠস্বর পরিহার করুন।

ঘ. অযথা চিৎকার পরিহার করুন।

ঙ. প্রয়োজনের চেয়ে নিম্নস্বরে বলবেন না।

চ. কণ্ঠস্বরকে শ্রোতাদের উপযোগী করুন।

৭. ভাষা ও উচ্চারণ ঃ শুদ্ধ ও চলতি ভাষায় বক্তব্য রাখুন। বক্তব্যে সাধু ও চলতি ভাষা একাকার করবেন না। আঞ্চলিকতা পরিহার করুন। শব্দ উচ্চারণের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ। ভাষা ও ধ্বনিতত্ত্বের রীতি অনুযায়ী উচ্চারণ করুন। মোটকথা, আপনার শব্দ চয়ন, বাক্য বিনির্মাণ এবং উচ্চারণের উপরই আকর্ষণীয় উপস্থাপনের অনেক কিছু নির্ভর করে।

৮. স্পষ্ট ও সাবলীল ভাষায় বক্তব্য রাখুন। বক্তব্যের জড়তা পরিহার করুন। নোট ব্যবহার করতে গিয়ে এতোটা থামবেন না, যাতে শ্রোতাদের মধ্যে বিরক্তির উদ্রেক হতে পারে, অথবা তাদের দৃষ্টিকটু হতে পারে। নতুন বক্তা হবার কারণে আপনার বক্তৃতা করার ভীতি থাকলে বাম হাত শক্ত করে মুষ্টিবদ্ধ করে বক্তৃতা শুরু করুন, সব ভয় দূর হয়ে যাবে।

৯. গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো রিপিট করুন।

১০. মাঝে মধ্যে চুটকি, খণ্ড গল্প বা কবিতার চরণ, কিংবা কোনো পরিচিত ক্ষুদ্র ঘটনা বলে কিছুটা রস পরিবেশন করুন।

১১. পুরো সময় দর্শক শ্রোতাদের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখুন। সবার প্রতি দৃষ্টি বুলান। শ্রোতাদের সচেতন রাখুন।

১২. মাঝে মধ্যে উপমা উদাহরণ দিয়ে কথা খোলাসা করুন।

১৩. এমন ভাব প্রকাশ করুন, যাতে শ্রোতারা বুঝতে পারে, আপনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখছেন। তবে কোনো কৃত্রিম ভাব-ভংগি প্রকাশ করবেন না। কৃত্রিমতা কিন্তু একটা বোকামি।

১৪.আন্তরিকতার সাথে বক্তব্য রাখুন, যেনো দর্শক শ্রোতাগণ মনে করেন, আপনি সত্যিই তাদের কল্যাণ চান এবং তাদের কল্যাণের কথাই আপনি বলছেন। পুরো সময়টাকে আন্তরিকতা ও খোশ মেজাজ দিয়ে উষ্ণ রাখুন। এমনভাবে শ্রোতাদের সম্মোহিত করে রাখুন, যেনো আপনার বক্তৃতা শেষ হলেও শ্রোতাদের শুনার আগ্রহ শেষ না হয়।

এভাবেই আপনি উপস্থাপন করতে পারেন একটি সুন্দর, চমৎকার, হৃদয়গ্রাহী ও স্মৃতিতে অম্লান থাকা বক্তৃতা।

৯. সুবিন্যস্ত বক্তব্য রাখুন

এমন কিছু বক্তা আছেন, যাদের বক্তৃতার আগাগোড়া নেই। তাদের বক্তৃতার বিষয়বস্তু কি? শুরু কোথায়? শেষ কোথায়? তা শ্রোতাদের বুঝবার উপায় নেই। তাদের পুরো বক্তৃতাই এলোমেলো। আপনি এমনটি করবেন না। আপনি বক্তৃতাকে সাজিয়ে গুছিয়ে সুবিন্যস্ত করে নিন। এভাবে বিন্যাস করুন ঃ

ক. সম্বোধন, খ. ভূমিকা, গ. মূল বক্তব্য, ঘ. উপসংহার, ঙ. আবেদন।

সম্বোধন ঃ বক্তৃতায় দাঁড়িয়েই কয়েক সেকেণ্ডে দর্শক শ্রোতাদের সাথে দৃষ্টি সংযোগ করে নিন। তারপর প্রথমেই সম্বোধন করুন। সাধারণত তিনটি সম্বোধন করতে হয়। এভাবে সম্বোধন করুন ঃ

ক. শ্রদ্ধেয় সভাপতি !

খ. শ্রদ্ধেয়/মাননীয় প্রধান অতিথি! (যদি প্রধান অতিথি থাকেন)।

গ. সম্মানিত/প্রিয় দর্শক শ্রোতা/সুধীমণ্ডলী/ভদ্রমহোদয়/ও মহিলাগণ !

বক্তৃতা যদি অডিও ভিজুয়াল রেকর্ড না হয়, তবে 'দর্শক' সম্বোধনের প্রয়োজন নেই। প্রতিটি সম্বোধনই বাস্তব প্রেক্ষিতে হওয়া চাই।

ভূমিকা ঃ সম্বোধনের পর একটি সংক্ষিপ্ত ভূমিকা রাখুন। এ ক্ষেত্রে সম্ভব হলে নাটকীয় সূচনা করুন। কোনো বিষয় বা ঘটনাকে আকর্ষণীয় ভংগিতে পেশ করুন। এর ফলে শ্রোতাদের মনোযোগ ও একাগ্রতা আপনার প্রতি নিবদ্ধ হবে। ভূমিকায় শ্রোতাদের বলুন, আপনি তাদের কি বিষয়ে বলতে চান?

আপনার মূল বক্তব্য সম্পর্কে একটি সহজ ও সংক্ষিপ্ত ধারণা আকর্ষণীয়ভাবে পেশ করে শ্রোতাদের আপনার বক্তৃতার প্রতি কৌতুহলী করে তুলুন।

মূল বক্তব্য ঃ এবার মূল বক্তব্য রাখুন। মূল বক্তব্য উপস্থাপনের ক্ষেত্রে এ পরামর্শগুলো গ্রহণ করলে উপকৃত হবেন ঃ

১. আপনার বিষয়বস্তুর প্রতি লক্ষ্য রাখুন। ঘোষিত বিষয়ের সাথে আপনার বক্তব্য যেনো অবশ্যি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়। মূল বিষয়ের মাঝখান দিয়ে চলুন, আশেপাশে ঘুরবেন না। (Go through the subject, do not go around.)। অর্থাৎ আপনি বিষয়বস্তু কেন্দ্রিক কথা বলুন।

২. বক্তব্য বিষয়ে আপনি যেসব পয়েন্ট বলতে চান, সেগুলো সাজিয়ে গুছিয়ে বলুন। একটির পর একটি বলুন। খাপ খাইয়ে বলুন।

৩. বক্তব্য বিষয়কে বিভিন্ন উপস্তরে সাজিয়ে নিন। সিঁড়ির পর সিঁড়ি পার হয়ে উপরে উঠার মতো শ্রোতাদের মনোযোগকে ধারণ করে একটির পর একটি স্তর পার হয়ে এগিয়ে যান।

৪. যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য রাখুন। কারো মত, বক্তব্য বা যুক্তি খণ্ডন করতে হলে যুক্তি দিয়ে তা খণ্ডন করুন।

৫. তথ্যবহুল (informative) বক্তব্য রাখুন। প্রমাণিত তথ্য পেশ করুন। সর্বশেষ তথ্য পেশ করুন।

৬. বিভিন্ন তথ্য ও যুক্তি পেশ করার সময় উপমা উদাহরণ পেশ করুন। শ্রোতাদের জ্ঞাত বিষয়ের উপমা আকর্ষণীয় হবে।

৭. সমাজে বিরাজমান বাস্তব সমস্যাবলী তুলে ধরুন এবং সমাধান পেশ করুন।

৮. অনন্যতা সৃষ্টি করুন। শব্দ চয়ন, উপস্থাপন, রসবত্তা, চমৎকারিত্ব ও কৌশলগত অভিনবত্বের দিক থেকে অনন্যতা সৃষ্টি করুন। অন্যদের চাইতে ভিন্নতর স্বাদের সমাহার, রূপ, রস, গন্ধ ইত্যাদি সৃষ্টি করে চমৎকার স্টাইলে বক্তব্য রাখুন।

৯. কখনো কিছুটা আবেগ, কিছুটা উষ্ণতা, হাসি মুখ, ঐকান্তিকতা, বৈচিত্র, সাবলীলতা, আকর্ষণীয় ভাবভংগি ও সহজ স্বাভাবিক মেজাজে বক্তব্য পেশ করুন।

উপসংহার ও আবেদন ঃ মূল বক্তব্য পেশ করার পর এবার আপনি উপসংহারে আসুন। দীর্ঘ উপসংহার টানবেন না। উপসংহারে আপনার মূল বক্তব্যের সার সংক্ষেপ বা নির্যাসটুকু বলে দিন। অতি সংক্ষেপে মূল বক্তব্যের মূল কথাটা বলে দিন। এমন কয়েকটি পয়েন্ট রিপিট করুন, যেগুলো আপনার

বক্তৃতার আসল কথা। অর্থাৎ শ্রোতাদের সামনে গোটা বক্তৃতার একটি সংক্ষিপ্ত যোগসূত্র স্থাপনকারী স্বচ্ছ ছবি তুলে ধরুন।

এরপর এক দু' কথায় বক্তব্যের গুরুত্বের প্রতি শ্রোতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করুন এবং বক্তৃতা কেন্দ্রিক একটি আবেগোদ্দীপক (Motivational) আবেদন রাখুন। আপনার বক্তৃতা শুনার জন্যে শ্রোতাদের অবশ্যি ধন্যবাদ জানাবেন।

এবার সমাপ্ত করুন আপনার বক্তৃতা। সমাপ্ত করতে পারেন উপরোল্লেখিত আবেদনের মাধ্যমেই। অথবা এরপর একটি মর্মস্পর্শী বাক্য কিংবা হাস্য উদ্দীপক কথা বা সম্বোধন দিয়ে সমাপ্ত করতে পারেন। অথবা করতে পারেন কোনো আকর্ষণীয় ও শিক্ষণীয় উদ্বৃতি দিয়ে।

আকর্ষণীয় সূচনা, প্রভাবশালী মূল বক্তব্য, অবিচ্ছিন্ন ছন্দময় গতিশীল উপস্থাপনা, অনুপম উপসংহার এবং কাম্য সময়সীমার অনুসৃতির মাধ্যমেই আপনি হতে পারেন শ্রেষ্ঠ বক্তা।

ক'টি জরুরি কথা ঃ বক্তৃতা বিন্যাসের ক্ষেত্রে কয়েকটি জরুরি কথা মনে রাখুন। কথাগুলো হলো ঃ

১. শ্রোতাদের বলুন, আপনি তাদের কি বলতে চান ?
২. তাদেরকে আপনার বক্তব্য বলুন।
৩. তাদেরকে বলুন, আপনি তাদের কি বলেছেন ? এবং
৪. আপনি তাদের বলুন, আপনি বলা শেষ করেছেন।

একথাগুলো খুবই জরুরি। কারণ, কিছু কিছু বক্তা এমন আছেন, যাদের বক্তৃতার শুরু কোন্খান থেকে, শ্রোতারা তা বুঝতে পারেন না। তাঁরা কি বিষয়ে বলছেন, তাও শ্রোতারা আঁচ করতে পারেন না। গোটা বক্তব্যে তাঁরা শ্রোতাদের কি বলছেন, শ্রোতারা সেটাও বুঝে উঠতে পারেন না। তাঁরা বক্তৃতা বন্ধ করার পরও শ্রোতারা বুঝতে পারেন না, তারা কি বক্তৃতা শেষ করে বন্ধ করলেন, নাকি মাঝখান থেকেই বন্ধ করে দিলেন।

১০. পোশাক ও অংগভংগি

বক্তৃতার সময় স্থান কাল পাত্র ও সামর্থের ভিত্তিতে পোশাক পরুন। পবিত্র পরিচ্ছন্ন পোশাক পরুন। মানানসই পোশাক পরুন। জামার বোতাম লাগিয়ে নিন। কলার ঠিক করে নিন।

বক্তৃতার সময় দৃষ্টিকটু হয় এমনভাবে হাত নাড়াচাড়া করবেন না। হাত ছুঁড়ে মারবেন না। কিছু কিছু রাজনৈতিক নেতার মতো লাফালাফি করবেন না। স্বাভাবিক দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করুন। প্রয়োজনে শালীন ও আকর্ষণীয় ভংগিমায়

হাত ব্যবহার করুন। জামার হাতা গুটাবেন না। মাথা নাচাবেন না। শান্ত ধীর ভংগিতে বক্তব্য রাখুন। মনে রাখবেন, পোশাক ও অংগভংগি হওয়া চাই মার্জিত ও রুচিসম্মত। সবসময় আত্মসম্মানবোধের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন।

১১. সময় জ্ঞান

বক্তৃতা করতে উঠলে অনেকেরই সময় জ্ঞান থাকে না। সভাপতি, পরবর্তী বক্তা, শ্রোতা এবং আয়োজকদের প্রতি তারা কোনো প্রকার ভ্রূক্ষেপ করেন না। ঘোষক বক্তার জামা টেনে বসাবার চেষ্টা করেছেন, এমন অবস্থা নিজ চোখে আমরা কয়েকবার দেখেছি। একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপককে এক সেমিনারে বক্তৃতা শেষ করার জন্য আমরা সাতবার স্লিপ দিয়েছি। এ ধরনের অনেক বক্তাই সাজিয়ে গুছিয়ে বক্তৃতা করেন না। তাঁরা বক্তৃতা করতে উঠলেই আলোচ্য বিষয়কে উপেক্ষা করে সময়ের তোয়াক্কা না করে বিষয়ের চারপাশে ঘুরতে থাকেন।

আপনি এমনটি করবেন না। আপনি আপনার জন্যে নির্ধারিত সময়ের সাথে মিল করে নিজের বক্তৃতা সাজিয়ে নিন। সময়কে ভাগ করে ফেলুন ভূমিকা, মূল বক্তব্য এবং উপসংহারের মধ্যে। আপনি–

১. বক্তৃতাকে আপনার নিয়ন্ত্রণে রাখুন।

২. বক্তৃতার প্রতিটি অংশকে তার জন্যে নির্ধারিত সময়টুকুই দিন।

৩. নির্ধারিত সময়ের বেশি বক্তৃতা করাকে অন্যায় মনে করুন।

৪. নির্ধারিত সময়ের বেশি বক্তৃতা করে আপনি অন্যদের বিরক্তির কারণ হবেন না। শ্রোতাদের শুনার আগ্রহ শেষ করে দেবেন না।

৫. মনে রাখবেন, সময় মতো বক্তৃতা করলে শ্রোতারা আবার আপনার বক্তৃতা শুনতে চাইবে।

১২. বর্জনীয় কিছু জিনিস

আসুন, এবার এক জায়গায় বলে দিচ্ছি, সুবক্তা হবার জন্যে বক্তার সময় কি কি জিনিস পরিহার করা উচিত ? আপনি নিশ্চয়ই আমাদের সাথে একমত হবেন যে, একজন ভালো বক্তার নিম্নোক্ত জিনিসগুলো পরিহার করা উচিত ঃ

১. ভাবগম্ভীর, ভ্যাবাচেকা, কিংবা এলোমেলোভাবে মঞ্চে উপবেশন।

২. দৃষ্টিকটু অংগভংগি।

৩. বক্র হয়ে দাঁড়ানো।

৪. প্রয়োজনের তুলনায় নিম্ন বা উচ্চকণ্ঠে বক্তৃতা করা।

৫. অন্যদের গালাগাল করা, কটাক্ষ করা।

৬. নেগেটিভ বক্তব্য।

৭. আঞ্চলিক ভাষা। অশুদ্ধ ভাষা। শংকর ভাষা।

৮. জড়তা, ভয়, উত্তেজনা, বিষণ্নতা।

৯. একই কথা বারবার বলা। যেমন দু' একজন বক্তা এমন আছেন, যারা একই বক্তৃতায় কিছুক্ষণ পরপরই বলেন ঃ 'সর্বশেষ কথা হলো, শেষ কথা হলো, আমি বেশি সময় নেবো না।' একই বক্তৃতায় একথাগুলো একাধিকবার বলার ফলে শ্রোতারা তাদের একথাগুলো সঠিক মনে করেন না। এর ফলে শ্রোতাদের কাছে বক্তার গুরুত্ব কমে যায়।

১০. একথা বলা যে, আমি প্রস্তুতি নেয়ার সময় পাইনি, আমাকে আগে থেকে বক্তৃতা করার কথা বলা হয়নি, এ বিষয়ে আমার কিছু জানা নেই।

১১. নির্ধারিত সময়ের প্রতি লক্ষ্য না রাখা।

১২. অসত্য অংগীকার করা।

১৩. অবাস্তব কথা বলা।

১৪. অসত্য তথ্য প্রদান করা।

১৫. দুর্বল বাক্য প্রয়োগ করা।

১৩. রসূলুল্লাহ (সা)-এর বক্তৃতা কেমন ছিলো ?

মানব জাতির শ্রেষ্ঠ বক্তা ছিলেন নবীগণ। মানুষকে সত্যের জ্ঞানদান, সঠিক পথ প্রদর্শন এবং আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতে আদর্শ সমাজ গড়ার জন্যেই প্রেরিত হয়েছিলেন তাঁরা। এ কাজ তাঁরা করেছিলেন মানুষকে বুঝাবার মাধ্যমে। তাই তাঁদের সবাইকে সারা জীবন বক্তৃতা করতে হয়েছে। তাঁদের বক্তৃতা ছিলো সবচেয়ে সুন্দর, চমৎকার ও আকর্ষণীয়।

আল কুরআনে বহু নবীর বক্তৃতা বা বক্তৃতার অংশ উল্লেখ করা হয়েছে। এগুলো এতোই মর্মস্পর্শী ও প্রভাবশালী যে, নবী ছাড়া অন্য কারো বক্তৃতা এগুলোর সাথে তুলনা করা সম্ভব নয়। এগুলো সর্বদিক থেকে অতুলনীয়, অনুপম।

আখেরি রসূল হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জীবনের সব ঘটনাবলী সুসংরক্ষিত রয়েছে। তাঁর বক্তৃতাসমূহ এবং বক্তৃতার ধরণ পদ্ধতি সবই হাদীস ও সীরাত গ্রন্থাবলীতে লিপিবদ্ধ আছে। তাঁর বক্তব্য ছিলো সকল দিক থেকেই অনন্য। রসূলের অনুসারীদের উচিত জীবনের সকল ক্ষেত্রের ন্যায় বক্তৃতা করার ক্ষেত্রেও তাঁকে অনুসরণ করা। এখানে রসূলুল্লাহ (স)-এর বক্তৃতার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করছি ঃ

১. মঞ্চ : রসূল (স) কখনো সাহাবাগণের সাথে একই সমতলে বসে বক্তব্য রাখতেন। কখনো তাঁর জন্যে মাটি দিয়ে তৈরি করা মোড়ার মতো একটু উঁচু আসনে বসে বক্তব্য রাখতেন। কখনো সমতলে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করতেন। কখনো মিম্বর থেকে বক্তৃতা করতেন। কখনো বক্তৃতা করেছেন উটের পিঠে থেকে। কখনো করেছেন পাহাড়ের উপর থেকে। এসবই তিনি করেছেন স্থান কালের প্রেক্ষাপটে এবং জনসমাগমের প্রেক্ষাপটে। লোকেরা যাতে সহজেই তাঁর বক্তব্য শুনতে পায় এবং তাঁকে দেখতে পায়, তিনি সেদিকে লক্ষ্য রাখতেন।

২. সহজ ও সাবলীল ভাষা : প্রিয় নবী (স) সবসময় সহজ সাবলীল ভাষায় বক্তব্য রাখতেন, যেনো লোকেরা অনায়াসেই তাঁর বক্তব্য বুঝতে পারে। তিনি নিজ সাথিদেরকেও বলতেন : মানুষকে শিক্ষা দাও এবং সহজ করো।

৩. স্পষ্ট ভাষা : রসূলুল্লাহ (স) যখনই কোনো বক্তব্য রাখতেন, তাঁর বক্তব্যের প্রতিটি শব্দ ও বাক্য সুস্পষ্ট হতো। তিনি প্রতিটি শব্দের উচ্চারণগত স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতেন। একটি শব্দ যথার্থভাবে উচ্চারণ করার পরই আরেকটি শব্দ বলতেন। প্রতিটি শব্দের পৃথক উচ্চারণ তাঁর বক্তব্যকে করতো স্বচ্ছ-পরিচ্ছন্ন। যেনো শীতের ভোরে গাছের পাতা থেকে একটির পর একটি স্বচ্ছ শিশির ফোটা ঝরে পড়ছে। হযরত আয়েশা (রা) বলেন : রসূলুল্লাহ (স)-এর বক্তব্য এতোই স্পষ্ট হতো যে, কেউ ইচ্ছা করলে তাঁর বক্তব্যের প্রতিটি শব্দ গুণে রাখতে পারতো।

৪. বিশুদ্ধ উচ্চারণ : প্রিয় রসূল (স) আরবী ভাষার সবচে' বিশুদ্ধ পদ্ধতির উচ্চারণ করতেন। তিনি বলেছেন : 'আমি সর্বাপেক্ষা শুদ্ধভাষী। আরবী ভাষার সকল মাধুর্যদান করে আমাকে পাঠানো হয়েছে।'

৫. ব্যাপক অর্থবহ শব্দ প্রয়োগ : প্রিয় রসূল (স)-এর রীতি ছিলো, তিনি সহজ-সরল ভাষায় কথা বলতেন, তবে তাঁর বক্তব্যের শব্দ ও বাক্যগুলো হতো ব্যাপক অর্থবহ ও তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর বক্তব্য শুনে বুদ্ধি-বিবেকের দুয়ার খুলে যেতো। তিনি বলতেন : 'আমাকে ব্যাপক অর্থবহ কথা বলার যোগ্যতা দেয়া হয়েছে।'

৬. মর্মস্পর্শী বক্তব্য : রসূলুল্লাহ (স)-এর বক্তব্য ছিলো খুবই আকর্ষণীয়, মর্মস্পর্শী ও প্রভাব বিস্তারকারী। লোকেরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো তাঁর বক্তব্য শুনতো। তাঁর বক্তব্যের সময় লোকেরা নীরবতা অবলম্বন করতো, মনোযোগী ও একাগ্রচিত্ত হতো। তাঁদের হৃদয়াবেগ সৃষ্টি হতো। হৃদয় প্রকম্পিত হতো। ফলে তাঁদের মধ্যে সৃষ্টি হতো মানসিক বিপ্লব। আর এরি ফলশ্রুতিতে তাদের মধ্যে সংঘটিত হয় চরিত্র বিপ্লব ও সমাজ বিপ্লব।

৭. রিপিটেশন ঃ রসূলে করীম (স) তাঁর বক্তব্যের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো রিপিট করতেন। যে কথাটিই শ্রোতাদের হৃদয়ে বিশেষভাবে গেঁথে দেয়ার প্রয়োজন মনে করতেন, সেটি কখনো দু'বার, কখনো তিনবার উচ্চারণ করতেন। এতে শ্রোতারা কথাটির প্রতি বিশেষভাবে মনোযোগী হতেন এবং গুরুত্ব অনুধাবন করতেন।

৮. প্রশ্ন ঃ প্রিয়নবী (স) বক্তৃতার মধ্যে প্রায়ই শ্রোতাদের প্রশ্ন করতেন। এতে শ্রোতারা সচেতন ও সক্রিয় হয়ে উঠতো। তাঁর প্রশ্নের জবাবে সাহাবাগণ অধিকাংশ সময়ই বলতেন ঃ [এর জবাব] আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলই অধিক জানেন।' কখনো কোনো পরিচিত বিষয়ে প্রশ্ন করলে তাঁরা জবাব দিতেন। বিদায় হজ্জের ভাষণে রসূল (স) জিজ্ঞেস করেন ঃ আমি কি বক্তব্য পৌঁছে দিয়েছি ? আমি কি আমার দায়িত্ব পালন করেছি ? উপস্থিত জনমণ্ডলী সমস্বরে জবাব দেয় ঃ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি বার্তা পৌঁছে দিয়েছেন, আপনি আপনার দায়িত্ব পালন করেছেন।

৯. শ্রোতাদের প্রশ্নের জবাব দান ঃ কখনো কখনো এমন হতো যে, রসূল (স) কোনো বিষয়ে বক্তব্য রাখলে, সে বিষয়ে শ্রোতাদের মনে কোনো প্রশ্ন সৃষ্টি হতো। তাঁরা বিষয়টি সম্পর্কে খটকা দূর করার জন্যে কিংবা স্পষ্ট হবার জন্যে রসূলকে প্রশ্ন করতেন। রসূল (স) সহজ-সরল জবাব দিয়ে বিষয়টি পরিষ্কার করে দিতেন।

১০. কৌতুহল সৃষ্টি ঃ কখনো কখনো শ্রোতাদের মনে কৌতুহল সৃষ্টির মাধ্যমে, কোনো বিষয়ে জানার জন্যে তাদেরকে উদগ্রীব করে তুলতেন। যেমন, একবার তিনি মিম্বরে দাঁড়াতে দাঁড়াতে তিনবার বললেন ঃ ঐ ব্যক্তির মুখমণ্ডল ধূলোমলিন হোক, ঐ ব্যক্তির মুখে ছাই পড়ুক, ঐ ব্যক্তির মুখ মলিন হোক।' এতে লোকেরা দারুণ কৌতুহল বোধ করলো এবং জিজ্ঞেস করলো ঃ কে সে ব্যক্তি হে আল্লাহর রসূল ? তখন জবাবে তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের বাবা মা দু'জনকে অথবা তাদের একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেয়েও জান্নাতে যেতে পারলো না।

১১. সতর্ক ভংগি ঃ অনেক সময় রসূলে করীম (স) এমন সতর্ক ভংগিতে বক্তব্য রাখতেন, যেনো শত্রুবাহিনী এগিয়ে আসছে আর তিনি শত্রুবাহিনীকে মোকাবেলা করার জন্যে নিজ সাথিদের উদ্বুদ্ধ করছেন, সতর্ক করছেন, যুদ্ধের কৌশল নির্দেশ করছেন, তাদেরকে যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে উদ্দীপ্ত করছেন। এভাবে গুরুত্বপূর্ণ এ জরুরি বিষয়গুলো তিনি সাহাবায়ে কিরামের সামনে পেশ করতেন।

১২. ঐকান্তিকতা ও কল্যাণ কামিতা ঃ প্রিয় নবী (স) যখন বক্তব্য রাখতেন, তখন প্রতিটি শ্রোতাই হৃদয়ের গভীর থেকে অনুভব করতেন, তিনি তাদের কল্যাণ, সাফল্য এবং মুক্তি ও উন্নতির জন্যে পেরেশান। তিনি নিঃস্বার্থভাবে তাদের কল্যাণ চান। তাঁর প্রতিটি কথাই হতো আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ। ফলে তাঁর বক্তব্যে তাঁদের হৃদয় বিগলিত হয়ে যেতো, নিজেদের জানমাল ও সন্তান-সন্ততি সবকিছুর চেয়ে তারা তাঁর কথাকে বেশি প্রিয় মনে করতো এবং তাঁর নির্দেশে সবকিছু কুরবানী করতে প্রস্তুত হয়ে যেতো।

১৩. সংক্ষিপ্ত বক্তব্য ঃ দু' তিনটি দীর্ঘ বক্তৃতা ছাড়া রসূলে করীম (স)-এর গোটা জীবনের সবগুলো বক্তৃতাই ছিলো অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও স্বল্প সময়ের। বিদায় হজ্জের ভাষণসহ যে ক'টি দীর্ঘ বক্তৃতা তিনি করেছেন, সেগুলোও ততো দীর্ঘ নয়। সব সূত্র থেকে তাঁর বিদায় হজ্জের সময়কার আরাফাতের বক্তৃতাকে একত্র সংকলন করলে দেখা যায়, সে বক্তৃতায় তিনি সম্ভবত ত্রিশ মিনিট সময়ও ব্যয় করেননি। আর সাধারণভাবে তাঁর বক্তৃতাগুলো ৫, ১০ বা ১৫ মিনিট-এর বেশি সময় নিয়ে হতো না। প্রিয় রসূল (স) বলেছেন ঃ আমাকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, আমি যেনো সংক্ষিপ্ত কথা বলি। আর মূলতঃ সংক্ষেপ কথাই উত্তম।-[আবু দাউদ]

রসূলুল্লাহ (স)-এর বক্তব্য খুবই সংক্ষিপ্ত হতো আর সে কথাগুলো সাথে সাথেই ক্ষুদিত হয়ে যেতো শ্রোতাদের হৃদয়ে।

১৪. অংগ-ভংগি ঃ রসূলে করীম (স) মসজিদে ভাষণ দেয়ার সময় তাঁর হাতে একটি ছড়ি থাকতো, তাতে তিনি ভর করতেন। যুদ্ধের ময়দানে ভাষণ দেয়ার সময় ধনুকের উপর ভর দিয়ে দাঁড়াতেন। কখনো আবেগময় ভাষণ দেয়ার সময় তাঁর দু' চোখ লাল হয়ে উঠতো। কখনো মুখমণ্ডলে লালিমা ফুটে উঠতো। কখনো শরীর শিউরে উঠতো। কখনো হাত মুষ্টিবদ্ধ করতেন এবং খুলতেন। কখনো হাতের আংগুল উপরের দিকে উঠাতেন।

১৫. অনন্যতা ঃ রসূলে করীম (স)-এর বক্তৃতা ভাষণ ছিলো সর্বদিক থেকেই অনন্য। তাঁর সমস্ত বক্তৃতাই ছিলো নির্দিষ্ট লক্ষ্যানুসারী। মানুষের মনোদৈহিক সৌন্দর্য সৃষ্টি, উন্নত আচার-আচরণের অধিকারী করা, বিশ্বাস ও দৃষ্টিভংগির বিশুদ্ধতা সৃষ্টি, আল্লাহমুখী জীবন যাপন এবং পারলৌকিক সাফল্যের দিকে ধাবিত করাই ছিলো তাঁর সমস্ত ভাষণের মূল লক্ষ্য। এজন্যে তিনি সবসময় সহজ, সরল, সাবলীল, অর্থবহ ও স্পষ্ট ভাষায় বক্তব্য রাখতেন। তাঁর প্রতিটি কথায় থাকতো হৃদয় নিংড়ানো মহব্বত। তিনি বক্তৃতায় কখনো কাউকেও গালি দিতেন না। কাউকেও উপহাস করতেন না। কারো নিন্দা

করতেন না। হৃদয়গ্রাহী শালীন সুভাষণই ছিলো তাঁর বৈশিষ্ট্য। বিশাল সমাবেশ না হলে তিনি প্রত্যেক শ্রোতার প্রতিই লক্ষ্য রাখতেন। একদিন বক্তৃতার সময় তিনি লক্ষ্য করলেন, একজন লোক এসে রোদে দাঁড়িয়ে তাঁর বক্তৃতা শুনছে। তিনি তাকে ইশারা করে ছায়ায় আসতে বললেন। তিনি যখন বক্তৃতা করতেন, শ্রোতারা একদৃষ্টিতে তাঁর বক্তৃতা শুনতো। অন্য কোনো দিকেই তাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ হতো না। শ্রোতারা প্রায়ই তাঁর বক্তৃতা শুনে কাঁদতেন। তাঁর বক্তৃতায় প্রায়ই তাদের হৃদয়-মন প্রকম্পিত হতো। তিনি বক্তৃতায় প্রধানত উপদেশ দিতেন, সতর্ক করতেন এবং সুসংবাদ দিতেন। সবচেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো, সে সময় বক্তৃতা সাথে সাথে লিখে নেয়া বা রেকর্ড করার কোনো ব্যবস্থা ছিলো না, কিন্তু শ্রোতারা তাঁর প্রতিটি বক্তব্য মনে রেখেছে এবং পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌছে দিয়েছে। এমনি অনন্য ছিলো তাঁর ভাষণ।[১]

১৪. আল কুরআনের বক্তৃতা নির্দেশিকা

আল কুরআনে অনেক সুন্দর সুন্দর বক্তৃতার উদ্ধৃতি রয়েছে। সেই সাথে রয়েছে উত্তম বক্তৃতার গাইড লাইন। আসুন দেখি, বক্তৃতার ব্যাপারে কি নির্দেশিকা পাওয়া যায় আল কুরআনে ?

১. অসীম দয়াবান আল্লাহ। তিনি কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন। মানুষ সৃষ্টি করেছেন। তাকে কথা বলতে শিখিয়েছেন।–(আল কুরআন ঃ ৫৫ ঃ ১-৪)

২. মানুষের সাথে সুন্দরভাবে কথা বলো।–(আল কুরআন ঃ ২ ঃ ৮৩)

৩. হে ঈমানদার লোকেরা ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো আর কথা বলো সরল ও সঠিক।–(আল কুরআন ৩৩ ঃ ৭০)

৪. হে নবী ! আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে। আর পাঠিয়েছি আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর দিকে আহ্বানকারী ও উজ্জ্বল প্রদীপ হিসেবে।–(আল কুরআন ৩৩ ঃ ৪৫-৪৬)

৫. কার কথা ঐ ব্যক্তির কথার চেয়ে উত্তম, যে আল্লাহর দিকে ডাকে, শুদ্ধ-সংস্কৃত কাজ করে আর বলে আমি অনুগত–মুসলিম।–(৪১ ঃ ৩৩)

৬. বুদ্ধি-প্রজ্ঞা এবং মর্মস্পর্শী উপদেশের মাধ্যমে মানুষকে তোমার প্রভুর পথে ডাকো।–(আল কুরআন ১৬ ঃ ১২৫)

৭. আমি দাউদের রাষ্ট্র ক্ষমতাকে মজবুত করে দিয়েছিলাম আর তাকে দান করেছিলাম প্রজ্ঞা এবং যোগ্যতা দিয়েছিলাম স্পষ্ট ও অকাট্য বক্তব্য রাখার।–(আল কুরআন ৩৮ ঃ ২০)

---

১. রসূলুল্লাহ (স)-এর বক্তৃতার বৈশিষ্ট্যগুলো সংগ্রহ করা হয়েছে সিহাহ সিত্তার হাদীস গ্রন্থাবলী, মিশকাত শরীফ এবং বিশেষ করে শামায়েলে তিরমিযি ও শিবলী নুমানীর সীরাতুন্নবী গ্রন্থ থেকে।

৮. ফেরাউনের কাছে যাও, সে বিদ্রোহী হয়েছে। তার কাছে বক্তব্য রাখবে কোমলভাবে। এতে করে সে হয়তো উপদেশ গ্রহণ করবে, নয়তো ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়বে।-(আল কুরআন ২০ ঃ ৪৩-৪৪)

৯. মূসা বললো ঃ প্রভু ! আমার বুক প্রশস্ত করে দাও। আমার কাজ আমার জন্যে সহজ করে দাও। আর আমার যবানের জড়তা দূর করে দাও, যাতে করে লোকেরা সহজেই আমার বক্তব্য বুঝতে পারে।-(২০ ঃ ২৫-২৮)

১০. উপদেশ গ্রহণ করার জন্যে আমি কুরআনকে সহজ করে পেশ করেছি। -(আল কুরআন ৫৪ ঃ ১৭)

১১. আমি যখনই কোনো রসূল পাঠিয়েছি, সে নিজের জাতীয় ভাষায় জনগণকে আমার আহ্বান পৌছিয়েছে। এ ব্যবস্থা আমি এজন্যে করেছি, যাতে করে সে খুব সুন্দর করে পরিষ্কারভাবে তাদের বুঝাতে পারে।-(১৪ ঃ ৪)

সহজেই বুঝা গেলো, কুরআন সুন্দর বক্তব্য রাখার ব্যাপারে কতোটা গুরুত্বারোপ করেছে ? আসুন, বক্তৃতার ব্যাপারে কুরআনের নির্দেশিকাগুলো আমরা পয়েন্ট আকারে সাজাই ঃ

১. বক্তব্য হতে হবে সুন্দর, উত্তম ও কল্যাণকর। অসুন্দর কথা কাম্য নয়।

২. সরল বক্তব্য রাখতে হবে এবং সত্য, সঠিক ও যথার্থ কথা বলতে হবে।

৩. বক্তৃতার মূল লক্ষ্য হবে আল্লাহর দিকে আহ্বান, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে চেষ্টা করার আহ্বান। বক্তৃতা হবে আল্লাহমুখী।

৪. সত্যকে গ্রহণ করার শুভ পরিণতির সুসংবাদ দিতে হবে।

৫. মিথ্যা ও ভ্রান্তনীতি গ্রহণ করার অশুভ পরিণতি সম্পর্কে সতর্ক করতে হবে।

৬. বক্তার নিজের জীবন হওয়া চাই তার বক্তৃতার বাস্তব রূপ, উজ্জ্বল প্রদীপ।

৭. বক্তা দৃঢ় ও বলিষ্ঠভাবে সত্যের সাক্ষ্য দেবেন।

৮. বক্তা যে আদর্শ প্রচার করবেন, তার নিজেকে সে আদর্শের মডেল এবং অনুগত অনুসারী হতে হবে।

৯. বক্তৃতায় বুদ্ধি, বিবেক, প্রজ্ঞা, কৌশল ও বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটতে হবে।

১০. বক্তৃতা হওয়া চাই মর্মস্পর্শী, হৃদয়গ্রাহী ও প্রভাব বিস্তারকারী।

১১. বক্তব্য হওয়া চাই স্পষ্ট, অকাট্য ও সিদ্ধান্তকর।

১২. বক্তব্য বলিষ্ঠ হতে হবে, তবে তা অবশ্যি হওয়া চাই কোমল ভাষায়।

১৩. বক্তব্যের ভাষা হওয়া চাই সহজ ও বোধগম্য।

১৪. বক্তাকে অবশ্যি জনগণের মাতৃভাষা তথা জাতীয় ভাষায় বক্তব্য রাখা চাই। এটা আল্লাহ প্রদত্ত সার্বজনীন ও জনপ্রিয় পদ্ধতি।

১৫. সহজ সরল ও জড়তামুক্ত সাবলীল বক্তব্য রাখতে পারার তৌফিক চেয়ে মহান প্রভু আল্লাহর কাছে তৌফিক চাওয়া উচিত।

এ পদ্ধতিতেই নবীগণ বক্তৃতা করেছেন। মুহাম্মদ (স)-এর সমস্ত বক্তৃতাই ছিলো এই কুরআনী নির্দেশিকার বাস্তব রূপ। আবু বকর, উমর, আলী (রা) এবং অন্যান্য শ্রেষ্ঠ সাহাবীগণ নিজেদের বক্তৃতায় এ পদ্ধতিই অনুসরণ করতেন।

উমর ইবনে আবদুল আযীয, ইমাম ইবনে তাইমিয়া, মুজাদ্দিদে আলফে সানী, সাইয়েদ আহমদ ব্রেলভী, শহীদ হাসানুল বান্না, সাইয়েদ মওদূদী, জামালুদ্দীন নূরসী, ইমাম খোমেনী প্রমুখ মনিষীগণ তাঁদের বক্তৃতায় এ নির্দেশিকাগুলো অনুসরণ করতেন। আসুন, আমরা কুরআনী নির্দেশিকার আলোকে বক্তৃতা করি এবং সত্যের আলো ছড়িয়ে দিই সব মানুষের কাছে।
(রচনাকাল ঃ ১৯৯৭ইং)

৮

সুলেখক হোন পাঠকের মন জয় করুন

১. লেখা আদর্শ প্রচারের কার্যকর অস্ত্র

একা তিনি। তাঁর হাতে একটিই ছিলো অস্ত্র। সেটি একটি কলম। ১৯৩২ থেকে ১৯৪১ সাল। এ দশ বছর কলম চালান তিনি একটি উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে। এ সময় তাঁর লেখা পড়ে সারা ভারত উপমহাদেশের প্রায় সবগুলো অঞ্চলে বিরাট সংখ্যক লোক মানসিকভাবে প্রস্তুত হয়ে যায় একটি আদর্শিক সমাজ বিপ্লব ঘটাবার জন্যে। তারা গঠন করে একটি দল। গোটা দল সেই এক ব্যক্তির লেখা বই পুস্তক পৌঁছে দেয় মানুষের ঘরে ঘরে। মানুষ সচকিত হয়ে উঠে তাঁর বই পড়ে। শুরু করে আত্মবিশ্লেষণ, হয়ে পড়ে ত্বরিত কর্মী। এখন শুধু ভারত উপমহাদেশে নয়, গোটা বিশ্বের শত ভাষায় মানুষ পড়ছে তার লেখা, তাঁর বই। মানুষ জেগে উঠছে তাঁর আহ্বানে। দৈহিক মৃত্যু তাঁর হয়েছে অনেক আগেই। কিন্তু বিশ্বের কোটি কোটি মানুষের মনে তিনি দীপ্ত তাজা প্রাণ। মানুষ বইয়ের পাতায় গোগ্রাসে পড়ছে তাঁর আহ্বান। তিনি আর কেউ নন, তিনি সাইয়েদ মওদূদী রহমাতুল্লাহ আলাইহি। তাঁর লেখা আদর্শ প্রচারের কার্যকর অস্ত্র। আপনিও লিখুন। আপনার লেখাও হতে পারে আদর্শ প্রচার এবং সুসমাজ গড়ার শানিত অস্ত্র। হতে পারে মানুষকে আপনার স্বমতে আনার সম্মোহনী শক্তি। লিখতে বসুন। লেখাকে অস্ত্র বানান এবং সেই অস্ত্রে ধার দিতে থাকুন। আপনার লেখাকে সম্মোহনী শক্তিতে পরিণত করুন।

২. কেন লিখবেন ?

লেখা অন্যদের কাছে আপনার বার্তা পৌঁছাবার মাধ্যম। লেখা অন্যদের কাছে আপনার উপদেশ, আপনার আহ্বান, আপনার মনের আকুতি অবিকল পৌঁছে দেয়। আপনার মৌখিক উপদেশ ক'জনে মনে রাখে ? কিছু লোক মনে রাখলেও তাদের ক'জনেই বা তা অন্যদের কাছে পৌঁছায় ? কিন্তু লেখার ব্যাপারটাই ভিন্ন। তা সবসময় অবিকল মওজুদ থাকে। যে কেউ যে কোনো সময় তা পড়ে নিতে পারে। আপনার লেখার কোনো তত্ত্ব, কোনো তথ্য, কোনো সুখপাঠ্য বাক্য যে কেউ যে কোনো সময় দেখে নিতে পারে।

আপনার যদি কোনো মিশন থাকে, আপনি যদি মানুষকে শুদ্ধ-সংস্কৃত করতে চান, আপনি যদি সমাজ সংস্কার করতে চান, আপনি যদি মানুষকে আপনার আদর্শের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে চান, তবে লিখুন। আপনি যদি মানুষকে

আপনার পক্ষে আনতে চান, কোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে চান, কিংবা যদি চান কোনো যালিমের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ করতে, তবে লিখুন। আপনার উদ্দেশ্য হাসিলের জন্যে লেখা দারুন কার্যকর শক্তি। সুতরাং আসুন আমরা লেখি। কারণ–

১. লেখা জ্ঞানীদের শ্রেষ্ঠ জীবিকা।

২. লেখা মনের খোরাক, লেখা মানুষের মনকে সজীব রাখে।

৩. লেখা মানুষের মনকে আনন্দ দেয়।

৪. লেখা নিঃসংগির সাথি।

৫. লেখা মানুষের মন-মানসিকতা ও চিন্তাকে প্রভাবিত করে।

৬. লেখা উপদেশ প্রদানের উত্তম উপায়।

৭. লেখা দাওয়াত প্রদানের মোক্ষম হাতিয়ার।

৮. লেখা সত্য ও উত্তম আদর্শের প্রতি উদ্বুদ্ধ করবার অসীম শক্তিধর উপায়।

৯. লেখা অন্যায় অবিচার, অশ্লীলতা, অনাচার, বেহায়াপনা, নোংরামি, পাপ পংকিলতা, দুষ্কর্ম ও যাবতীয় মন্দ কাজের বিরুদ্ধে মানুষের মনে ঘৃনা ও ক্ষোভ সৃষ্টি করার শাণিত হাতিয়ার।

১০. লেখা যুলম, দুঃশাসন ও নিপীড়নের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির বলিষ্ঠ উপায়।

১১. লেখা বিশেষ লক্ষ্যে মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করবার মোক্ষম রশি।

১২. লেখা আপনার আদর্শের পক্ষে জনগণকে সংগঠিত করবার কার্যকর শক্তি।

১৩. লেখা আদর্শ জীবন গঠন ও সুন্দর সমাজ গড়ার বলিষ্ঠ হাতিয়ার।

১৪. লেখা আপনার যুক্তি বিশ্লেষণের যথার্থ মাধ্যম।

১৫. লেখা আপনার মত ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রচারের উত্তম উপায়।

১৬. লেখা শ্রেষ্ঠ যোগাযোগ মাধ্যম। লেখা লেখক ও পাঠকের মনের সংযোগ।

১৭. লেখা, জাতি, সম্প্রদায়, এমনকি বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রাখে।

১৮. লেখা প্রতিপক্ষ ও প্রতিপক্ষের দৃষ্টিভঙ্গিকে কুপোকাত করার কার্যকর শক্তি।

১৯. লেখা স্থায়ী উপদেশনামা।

২০. লেখা মানুষের কাছে আপনার সবচেয়ে উপযুক্ত প্রতিনিধি।

২১. ভালো লেখককে পাঠকরা বন্ধু, প্রিয়জন, শিক্ষক, সজ্জন, পথপ্রদর্শক ও মনের মানুষ মনে করে।

২২. সত্য ও ন্যায়ের জন্যে লেখা একটি ইবাদত।

২৩. যে লেখা মানুষকে সঠিক পথ দেখায়, সে লেখা দ্বারা লেখক মৃত্যুর পরও সওয়াব, কল্যাণ ও নেকী লাভ করতে থাকবেন।

২৪. তাই, লেখা শুধু পাঠকের নয়, লেখকেরও অফুরন্ত পুঁজি।

আপনি কি দেখেননি, ইমাম গাজ্জালি, ইবনে তাইমিয়া, ইবনুল কাইয়্যিম, ইবনে হাযম, শাহ ওলীউল্লাহ, মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব, সাইয়েদ মওদূদী, সাইয়েদ কুতুব, ইসমাঈল আল ফারুকীর লেখা মানুষকে কী চমৎকার পরিবর্তন করে দিয়েছে। এঁরা মরেও জীবন্ত পথপ্রদর্শক। আসুন, আমরা এঁদের পথ ধরি। আমরাও লেখি।

আপনার প্রতিপক্ষরা তো লেখছে ! তারা তো বসে নেই। তারা প্রচার করছে তাদের মতাদর্শ। মানুষকে টানবার চেষ্টা করছে নিজেদের স্বমতে। আপনি কি দেখেননি, কার্লমার্ক্সের দাস কাপিট্যাল কী কাণ্ডটা ঘটিয়েছিলো ? লেলিনের আগুনঝরা রচনাবলি মানুষকে পতঙ্গের মতো কোন্ গহ্বরে নিক্ষেপ করেছিলো ? তাই আসুন, কলম ধরুন। অসত্যের বিরুদ্ধে চালান শানিত অস্ত্র।

৩. কী লিখবেন ? কিভাবে শুরু করবেন ?

এমন অনেকে আছেন, যাদের লেখার সখ আছে, কিন্তু কী লিখবেন, তা খুঁজে পান না। অনেক জ্ঞানী লোকও এমন আছেন যারা লিখতে অভ্যস্ত নন। লেখার পরামর্শ দিলে তাঁরা কী লিখবেন, কিভাবে লিখবেন, কিভাবে শুরু করবেন ? তা খুঁজে পাননা। সাহস করে লিখতে বসুন এবং ধৈর্য ধরে লিখে যান।

লেখার আছে বিচিত্র ধরণ। এ যেনো খাবার টেবিলে সাজানো রকমারি খাবার। কোন্‌টি দিয়ে শুরু করবেন, তা নিজেই ঠিক করুন। তবে প্রতিটি পাত্র থেকেই কিছু কিছু খেয়ে দেখুন। তারপর মন আর রুচি যেটির দিকে ছুটে যায়, সেটিকে নিয়েই জেঁকে বসুন।

পত্রিকায় পত্র লিখুন, সংবাদ তৈরি করে পাঠান, কোনো বিষয়ে মতামত ব্যক্ত করে লিখে পাঠান। তথ্য সমৃদ্ধ ফিচার লিখুন। প্রবন্ধ লিখুন। কোনো পুস্তকের সমালোচনা লিখুন। অন্য ভাষা থেকে কিছু অনুবাদ করুন। স্মৃতি কথা লিখুন। ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখুন। কবিতা লিখুন। এভাবে হাত পাকা করুন।

তারপর আরো এগিয়ে চলুন। কোনো বিষয়কে কেন্দ্র করে নিবন্ধ রচনা করুন। পুস্তিকা লেখুন। সামাজিক সমস্যার বিবরণ ও তা সমাধানের জন্যে আপনার দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে বই লিখুন। আপনার আদর্শ ও মতবাদকে কেন্দ্র করে লিখুন। অন্যদের মতবাদকে সমালোচনা করে লিখুন। সেরা মানুষদের জীবনী লিখুন। আত্মচিন্তা ও সমাজ ভাবনাকে পুঁজি করে গল্প লিখুন। উপন্যাস লিখুন, নাটক লিখুন।

প্রবন্ধ লিখুন, নিবন্ধ লিখুন এবং বই রচনা করুন সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান ইত্যাদি শত বিষয়ের মধ্যে আপনার যেটা পসন্দ, আপনার জন্যে যেটা সুবিধে, সেটাকে নিয়ে।

এভাবে সব পাত্র থেকেই কিছু কিছু খেয়ে দেখুন, চেঁটে দেখুন। আপনার রুচিই বলে দেবে, কোন্ খাবারটি আপনার আসল পসন্দের। কোন্‌টি আপনার জন্যে অধিকতর যুৎসই!

হ্যাঁ, লিখতে থাকুন। আস্তে আস্তে লেখা আপনার ভালো লাগবে। তখন আপনার কলমই বলে দেবে, আপনি কী লিখবেন?

আপনি কী লিখবেন? এজন্যে আপনার কলমের পরামর্শই যথেষ্ট। পরামর্শ আদায়ের জন্যে কলমের পিছে লাগুন।

৪. কত যে বাধা!

তবে কলমের পেছনে লাগলেই লেখক হওয়া যায় না। লেখক হবার পথে আছে অনেক বাধা। অনেক সমস্যা। অনেক জটিলতা। আছে অনেক দুঃখ, অনেক মুসিবত। এসব কিছু ডিঙ্গিয়েই হতে হয় লেখক। এগুলো ডিঙ্গাবার দুঃসাহস কি আপনার আছে? লেখক হবার পথে কি কি বাধা আছে জানেন? আছে অন্ধকার পথ, ঢাকনাহীন ম্যানহোল, উদ্যত জগদ্দল। আছে কাঁটাবন, বিষাক্ত ফনিনী। আছে নিবীড় বন, হিংস্র নেকড়ে। আছে রাহাজন। আছে খরা, দারিদ্র, তৃষ্ণা, ক্ষুধা।

ম্যানহোলে পড়ে যেতে পারেন। জগদ্দলে হোঁচট খেয়ে রক্তাক্ত হতে পারেন। বিদ্ধ হতে পারে কাঁটা, দংশন করতে পারে ফনিনী। নেকড়ে করতে পারে তাড়া, সর্বস্ব লুটে নিতে পারে রাহাজন। তপ্ত হতে পারেন খরায়, নিষ্পিষ্ট হতে পারেন দারিদ্রে। তৃষ্ণায় ফাটতে পারে ছাতি, ক্ষুধায় জ্বলতে পারে নাড়ি। তারপরেও এ পথে জমাতে চান পাড়ি? তবে নিশ্চয়ই বাহাদুর ব্যক্তি আপনি। আসুন আমরা করি কোলাকুলি। তারপর কথাটা বলি খোলাখুলি।

হয়তো অনেক কাঠখড়ি পুড়িয়ে একটি লেখা তৈরি করেছেন। ছাপানোর জন্যে পত্রিকায় পাঠিয়েছেন। কিন্তু লেখাটি ছাপার জন্যে মনোনীত হয়নি, এমনকি লেখাটি আপনাকে ফেরতও দেয়নি। এ রকম অনেকবারই হতে পারে।

অনেক চেষ্টা সাধনা করে হয়তো আপনার দৃষ্টিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ লেখা তৈরি করেছেন। কাউকে লেখাটি দেখতে দিয়েছেন। তিনি দেখে বললেন, এটা কোনো লেখাই হয়নি। অথবা বলবেন রেখে যান, আমি দেখবো। ক'দিন পরে আপনি লেখাটি ফেরত আনতে গেলে হয়তো শুনবেন, তিনি লেখাটি খুঁজে পাচ্ছেন না। লেখাটি হারিয়ে গেছে।

অনেক সাধনা করে আপনি একটি পাণ্ডুলিপি তৈরি করলেন। এটি প্রকাশ করার জন্যে আপনার মন আনচান করছে। এটি নিয়েঃ

১. আপনি একজন, দু'জন, পাঁচজন, দশজন প্রকাশকের দ্বারে দ্বারে ঘুরলেন, কিন্তু কেউই এটি প্রকাশ করার জন্যে পসন্দ করলো না। অথবা দু'/একজন পাণ্ডুলিপিটি প্রকাশ করবেন বলে রেখেছিলেন। বছরখানেক পরে খোঁজ নিয়ে দেখলেন, সেটি লা-পাত্তা।

২. অথবা এক/দুই বছর পর প্রকাশক পাণ্ডুলিপিটি আপনাকে ফেরত দিলেন। কিংবা

৩. প্রকাশক আপনার পাণ্ডুলিপি প্রকাশ করলো, কিন্তু তাতে আপনার নাম নেই, আছে অন্য কারো নাম। অথবা

৪. বইটি প্রকাশ করা হয়েছে, চলছেও হরদম, প্রকাশক লাভবানও হচ্ছেন, কিন্তু আপনি হচ্ছেন বঞ্চিত।

৫. অথবা কোনো প্রকাশক না পেয়ে আপনি নিজেই বইটি প্রকাশ করলেন। কিন্তু ব্যবসা না জানার কারণে বিক্রি করতে পারলেন না।

৬. অথবা বিক্রয়ের জন্যে দোকানে দোকানে দিয়েছেন, কিন্তু টাকা আদায় করা আপনার পক্ষে সম্ভব হয়নি।

৭. হয়তো আপনার একটা লেখা পত্রিকায় প্রকাশ হয়েছে, তা সরকারের বিপক্ষে যাওয়ায় আপনাকে কারাদণ্ড দেয়া হলো।

এভাবে একজন লেখকের চলার পথে আসতে পারে হাজারো বাধা। এতে কি আপনি দমে যাবেন ? না, কোনো বাহাদুর লেখক কখনো দমতে পারে না নেতিয়ে পড়তে পারে না, পারে না পিছপা হতে।

আপনি কি জানেন না, বহু বড় বড় লেখকের লেখা প্রথম দিকে পত্রিকায় ছাপা হতো না ? রবীন্দ্রনাথ নিজের লেখা সংশোধন করতেন ? ইংরেজদের সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক জর্জ বার্নাড শো'র পাণ্ডুলিপি প্রথমদিকে কোনো প্রকাশকই ছাপতে রাজি হয়নি ? আপনি কি জানেন না, বাংলা সাহিত্যের অন্যতম দিকপাল ফররুখ আহমদ অনাহারে মৃত্যুব্যবরণ করেছেন ? মিশরের জননন্দিত লেখক সাইয়েদ কুতুবকে একটি বই লেখার জন্যে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলানো হয়েছে? আপনি কি জানেন না, বিশ্বনন্দিত ইসলামী চিন্তাবিদ সাইয়েদ মওদূদীকে একটি বই লেখার জন্যে ফাঁসির হুকুম দেয়া হয়েছিলো ?

কিন্তু বহু আগে মরে যাবার পরেও এঁরা সবাই বেঁচে আছেন তাঁদের লেখার মধ্যে। এঁরা বিশ্বাবাসীর প্রিয় লেখক। বহুকাল তাঁরা বেঁচে থাকবেন মানুষের হৃদয়ে। মানুষ উদ্বুদ্ধ হবে তাদের লেখা পড়ে। বিশ্ববাসী এঁদের ভক্ত অনুরক্ত।

ভয় পাবেন না, চিন্তিত হবেন না, থেমে যাবেন না, এগিয়ে চলুন। অটল হোন, সহিষ্ণু হোন, নির্ভীক হোন, ইচ্ছা শক্তিকে প্রবল করুন, সব বাধা ডিঙ্গিয়ে

চলুন। হয়তো একদিন আপনিও হতে পারেন বার্নাড শো, এলিয়ট, ইয়েটস, ইকবাল, ফররূখ, শাহ ওলীউল্লাহ, সাইয়েদ কুতুব, সাইয়েদ মওদূদী, ইসমাঈল আল ফারুকী, ইউসুফ আল কারদাভী, আবুল হাসান নদভী প্রমুখের মতো লেখক। কে জানে, কী সম্পদ লুকিয়ে আছে আপনার মাঝে?

৫. কিভাবে হবেন ভালো লেখক ?

এবার আসুন, আলোচনা করে দেখি, কিভাবে আমরা হতে পারি ভালো লেখক। অধিকাংশ বড় লেখকই সহজাত প্রতিভা দ্বারা বড় লেখক হয়েছেন। আর অনেকে হয়েছেন কঠোর সাধনা ও প্রচেষ্টার মাধ্যমে। প্রতিভাকে কাজে লাগাতে হলেও প্রয়োজন সাধনা ও প্রচেষ্টা। কাজী নজরুল ইসলামের প্রচুর প্রতিভা ছিলো। প্রতিভার জোরেই তিনি বড় কবি হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথেরও ছিলো প্রতিভা, সেই সাথে যুক্ত হয়েছে তার অগাধ সাধনা। এ দুয়ের সমন্বয়ে লেখাতে চরম উন্নতি করেছেন তিনি। সাইয়েদ মওদূদীকেও আল্লাহ তা'আলা দিয়েছিলেন অন্যন্য প্রতিভা। সেই সাথে যুক্ত হয়েছিলো তাঁর পরিকল্পিত বিরল সাধনা। এ দুয়ের সমন্বয়ে তিনি প্রতিষ্ঠিত হন কালের সেরা লেখক হিসেবে। পৃথিবীর হাজার হাজার লেখক ভালো লেখক হয়েছেন সাধনা করে। আসুন, আমরাও সাধনা করি। কি নিয়মে করবেন সাধনা? মহান স্রষ্টা অন্যদের মতো আপনাকেও কিছু না কিছু প্রতিভা দিয়েছেন। সেই সাথে আপনি নিম্নোক্ত চেষ্টা সাধনা এবং কলাকৌশল যুক্ত করুন ঃ

১. লক্ষ্য স্থির করুন ঃ কোন্ লক্ষ্যে নিবেদিত হবে আপনার লেখা, তা স্থির করে নিন। কিছু লোক নিজেদের লেখায় লক্ষ্যহীন রস ও আনন্দ পরিবেশন করেন পয়সা রোজগার করার জন্যে। কিছু লোক পয়সার জন্যে অনৈতিকতা, অপসংস্কৃতি ও নোংরামিকে লেখার উপজীব্য বানায়। অন্যরা নিজেদের ভ্রান্ত মতাদর্শ প্রচার প্রতিষ্ঠার জন্যে লেখে। সুকান্ত ভট্টাচার্য সমাজতন্ত্রের জন্যে লিখে লিখে কম বয়েসেই মারা গেছেন। সেক্যুলারিজম, নাস্তিকতা ও ধর্মদ্রোহীতার জন্যে লিখে চলেছেন অনেকেই জীবন মরণ শপথ করে। আর আপনি?

আপনিও ঠিক করে নিন, কোন্ লক্ষ্যে আপনি লিখবেন? ইসলাম যদি আপনার জীবনাদর্শ হয়ে থাকে, তবে এর চাইতে সুন্দর চমৎকার লেখার উপকরণ–আর কিছু হতে পারে না। ইসলামের প্রচার এবং ইসলামের দাওয়াত ও আহ্বানকে মানুষের মন মগজে ঢুকিয়ে দেয়াই হোক আপনার কলমের মূল লক্ষ্য। ইসলামকে সত্য সুন্দর ও কল্যাণময় জীবন ব্যবস্থা হিসেবে উপস্থাপন করতে, ইসলামকে ইহকাল ও পরকালের মুক্তিসনদ হিসেবে পেশ করতে এবং শত্রুরা ইসলামের গায়ে যেসব কালিমা লেপন করছে আর আরোপ করছে যেসব ভ্রান্তি, সেগুলো সাফ করতে আপনি কলম ধরুন। সে জন্যেই শানিত

করুন আপনার কলমকে। সে জন্যেই নিবেদিত করুন আপনার সমস্ত লেখা। আপনি যা-ই লিখুন, এই মহত লক্ষ্যকে সামনে রেখেই লিখুন। লেখাকে আপনার জীবনের মিশন সফল করার কার্যকর অস্ত্রে পরিণত করুন।

ভালো লেখক হবার জন্যে অবশ্যি লক্ষ্য স্থির করে নিন। নিজের সমস্ত প্রতিভা ও সাধনাকে সে লক্ষ্যে নিবেদিত করুন।

২. বিষয় নির্বাচন করুন ঃ কি কি বিষয় নিয়ে আপনি লিখতে চান, তা ঠিক করুন। একেকটি বিষয় চিন্তা করুন। যখনই কোনো বিষয়ে লেখা প্রয়োজন বলে অনুভব করবেন, সেটি ডাইরি বা নোট খাতায় নোট করুন। যে বিষয়ে লিখতে বসবেন, তার উপ-শিরোনামগুলো নোট করুন। তার পক্ষে কি কি যুক্তি আছে নোট করুন। উদাহরণ উপমা চিন্তা করুন। যথাসাধ্য তথ্য সংগ্রহ করুন। তারপর লেখা শুরু করুন।

৩. বক্তব্য সুবিন্যস্ত করুন ঃ কোথা থেকে শুরু করবেন, কোথায় শেষ করবেন, সেটা আগেই চিন্তা করে নিন। ভূমিকা, মূল বক্তব্য, উপসংহার, আহ্বান, বিন্যাস করুন। কোন্ বাক্যের পর কোন্ বাক্য, কোন্ কথার পর কোন্ কথা, কোন্ যুক্তির পর কোন্ যুক্তি, কোন্ তথ্যের পর কোন্ তথ্য এবং কোন্ জা'গাটায় কোন্ উদাহরণ যথার্থ হবে তা সঠিকভাবে সাজিয়ে নিন। শিরোনাম উপ শিরোনাম বিন্যাস করুন। আকর্ষণীয় সূচনা এবং আবেদনশীল সমাপ্তি ঘটান। এভাবে সঠিক বিন্যাসের উপরই নির্ভর করে আপনার লেখার সৌন্দর্য। সুবিন্যাসের অভাবে অনেক বড় পণ্ডিতের লেখাও মার খেয়ে যায়।

৪. সাবলীল ভাষায় লিখুন ঃ আপনি যা-ই লিখুন, সহজ ভাষায় লিখুন, সাবলীল ভাষায় লিখুন। আপনার বক্তব্য যত গুরুত্বপূর্ণই হোক না কেন, ভাষা অশুদ্ধ হলে তার গুরুত্ব কমে যাবে। উদ্বৃতি ছাড়া ভাষার আঞ্চলিকতা পরিহার করুন। সহজ, সাবলীল ও ঝরঝরে শব্দ ও বাক্য ব্যবহার করুন। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা বলেন ঃ 'উপদেশ গ্রহণের জন্যে আমি আল কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি।'-[আল কুরআন ৫৪ ঃ ৪০]। রসূল (স) তো মুমিনদের নির্দেশই দিয়ে দিয়েছেন ঃ 'তোমরা মানুষকে সহজ করে শিখাও, কঠিন করো না।' পরিচিত, অর্থবহ ও সহজ শব্দ ব্যবহার করুন। ছোট ছোট চমৎকার বাক্য লিখুন। মনে দাগ কাটার মতো বাক্য ব্যবহার করুন।

৫. তথ্যবহুল লিখুন ঃ আপনার লেখা যতো তথ্যবহুল হবে, ততোই তা হবে আকর্ষণীয় ও গুরুত্বপূর্ণ। তথ্য সংগ্রহ করুন। তথ্য যাচাই বাছাই করুন। অনুসন্ধান করুন। সঠিক ও নির্ভুল তথ্য দিয়ে, সরসভাবে সাজিয়ে লিখুন। লেখায় থাকবে যতো বেশি তথ্য, লেখা হবে ততো মূল্যবান, ততো দামী।

তথ্যবিহীন রসাত্মক লেখা একবার পড়লেই পড়া শেষ হয় যায়। আর তথ্যবহুল লেখা মানুষ বারবার পড়ে সযত্নে লালন করে। নোট করে, উদ্বৃত করে, প্রচার করে।

৬. পাঠক উপযোগী লিখুন ঃ আপনি যখনই কোনো বিষয়ে লিখতে বসবেন, লেখার পরিকল্পনা করবেন, লেখার চিন্তা করবেন, তখন সেই সাথে আপনার চোখের সামনে ভাসতে হবে, আপনার সেই লেখাটি যারা পড়বে, তাদের ছবি। আপনি যা-ই লিখুন, অবশ্যি চিন্তা করে নিন, কাদের জন্যে লিখছেন ? কারা পড়বে আপনার এই লেখা ? তারা কী করে ? তাদের সমস্যা কী ? তাদের যোগ্যতা কী ? তাদের শিক্ষা-দীক্ষা কী ? তাদের মানসিকতা কী? তারা কী চায় ? কিভাবে লিখলে তারা পড়তে আগ্রহী হবে ? লেখায় কি কি উপকরণ ও মালমসলা থাকলে তারা খুশি হবে ? তাদের সমস্যার সমাধান কী ? আপনার পরামর্শ ও উপদেশের কথা কী পন্থায় পেশ করলে সহজেই তাদের মন গলাতে পারবেন ? কী ধরনের ভাষা তাদের উপযোগী ? কী কথা, কী ভাষা, কি বক্তব্য তাদের উপর প্রভাব ফেলবে ? লেখার সময় একথাগুলো সামনে রেখেই লিখুন। সহজেই আপনি পাঠকদের প্রিয় লেখকে পরিণত হবেন। মনে রাখবেন, আপনি নিজের জন্যে নয়, পাঠকদের জন্যে লিখছেন। যাই লিখুন, পাঠকদের উপযোগী করে এবং পাঠকদের কথা মনে রেখে লিখুন।

৭. অনন্যতা অর্জন করুন ঃ আপনি লিখুন এবং লেখাতে অনন্যতা অর্জন করুন। অনন্যতা হলো, অন্যদের চেয়ে আপনার লেখার স্বাতন্ত্র্য, আপনার লেখাতে আপনার নিজস্বতা, আপনার স্বকীয়তা। এ স্বকীয়তা, নিজস্বতা ও সাতন্ত্র্যই একজন লেখকের স্টাইল। যতোদিন আপনি নিজস্ব স্টাইল নিয়ে অন্যদের অতিক্রম করতে না পারেন, ততোদিন পাঠকদের দৃষ্টি কেড়ে নিতে কষ্ট হবে আপনার।

আপনি লেখক হিসেবে নিজের ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুটনে, বিষয়বস্তু চয়নে ও বাচনভঙ্গিতে অনন্যতা অর্জন করুন। বিষয় বিন্যাসে, শব্দ চয়নে এবং শিল্পরস সৃষ্টিতে নিপুণতা অর্জন করুন। বিশেষ করে আপনার বাচনভঙ্গিকে নিচের সবগুলো বা অধিকাংশ অথবা অন্তত কিছুসংখ্যক পয়েন্টে স্বকীয়তা প্রদান করুন। সেগুলো হলো ঃ প্রাঞ্জলতা, শুদ্ধতা, আবেগধর্মীতা, যুক্তিসিদ্ধতা, বর্ণনাত্মক, চিত্রাত্মক, বক্তৃতাত্মক, কাব্যধর্মীতা, উপমার অজস্রতা, শব্দালংকার, রসব্যঞ্জনা, জ্ঞানঘন, বিজ্ঞান ধর্মিতা, তথ্য সমৃদ্ধতা, বচনের সাথে বিষয় ও ভাবের সুসংবদ্ধতা, ছন্দাত্মক ও প্রত্যয়দীপ্ততা।

এগুলোর মধ্যে যেগুলোকে সম্ভব ধারণ করুন এবং সেগুলোর মধ্যে নিজের স্টাইল ও অনন্যতার কলাকৌশল দেখান। এতে আপনার পাঠক মহল সৃষ্টি

হবে, আপনার লেখা পাঠক প্রিয়তা অর্জন করবে, গ্রহণযোগ্য হবে, প্রভাব সৃষ্টি করবে। Lucas বলেছেন ঃ 'Style is means by which a human being gains contact with others.'

দেখুন না, সাইয়েদ কুতুবের যুক্তিসিদ্ধ আবেগ ধর্মিতা, সাইয়েদ মওদূদীর বিজ্ঞানধর্মী যুক্তিবাদিতা, রবীন্দ্রনাথের ভাবব্যঞ্জনা ও প্রাঞ্জলতা, নজরুলের আবেগধর্মীতা, সুকুমার রায়ের রসব্যঞ্জনা, গোলাম মোস্তফার শব্দালংকার এবং জীবনানন্দ দাশের রূপ চিত্রময়তা পাঠকদের কী রকম সম্মোহিত করেছে !

৮. সার্বজনীনতা অর্জন করুন ঃ আপনি কী আপনার লেখার মাধ্যমে মানুষের কাছে পৌঁছে দিতে চান সত্যাদর্শ ? মানুষকে চিনিয়ে দিতে চান সত্য, সুন্দর ও কল্যাণের রাজপথ ? জানিয়ে দিতে চান শান্তি, মুক্তি ও সাফল্যের ঠিকানা ? তবে আপনার লেখা হতে হবে সার্বজনীন। আপনার একার কথা হওয়া চাই সর্বজনের কথা।

মানব সমাজে বিরাজমান বাস্তবতাকে আপনার চিন্তা ও ভাবের সংমিশ্রণে জীবন্ত করে তুলুন। মানুষের ভালো মন্দের কথা, কল্যাণ অকল্যাণের কথা, সুখ-দুঃখের কথা, আশা-নিরাশার কথা, চাওয়া পাওয়ার কথা, আনন্দ বেদনার কথা, বিরহ্ মিলনের কথা, জৈবিক ও আত্মিক চাহিদার কথা, বাসনা ও বঞ্চনার কথা, সমস্যা ও সমাধানের কথা, বন্ধন ও মুক্তির কথা, রুদ্ধতা ও স্বাধীনতার কথা, অন্যায় ও ন্যায়ের কথা, পরাজয় ও জয়ের কথা, ধন ও দারিদ্রের কথা, পাপ ও পূণ্যের কথা, অশুদ্ধতা ও শুদ্ধতার কথা, সত্য ও মিথ্যার কথা, স্বচ্ছতা ও কপটতার কথা, জ্ঞান ও অজ্ঞতার কথা, দয়া ও নির্দয়তার কথা, সুবিচার ও অবিচারের কথা, সৃষ্টি ও স্রষ্টার কথা, জীবন ও মরণের কথা, ইহকাল ও পরকালের কথা এবং জীবনের প্রকৃত সাফল্য ও বর্থ্যতার কথাকে হৃদয় উজাড় করে লিখুন আপনার কলমের কলা নৈপুণ্যে।

এভাবে মানুষের হৃদয়ের কথাকে আপনার হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করুন, তারপর আপনার হৃদয়ের কথাকে মানুষের হৃদয় স্পর্শী করে মানুষের কাছে সঁপে দিন। মানুষের হৃদয়ের কথাকে যখন লেখক নিজের উপলব্ধি দিয়ে ভাষার শিল্পরস যুক্ত করে পরিবেশন করেন, তখনই তা হয় সার্বজনীন লেখা। সর্বজনের কথা।

আপনার লেখাকে সার্বজনীন করুন। জনপ্রিয় লেখক হোন। আপনাকে এ সার্বজনীনতা অর্জন করতে হবে আপনার নীতি ও আদর্শকে ধারণ করেই। আপনার লেখনীর সার্বজনীনতার ভেতর দিয়েই মানুষের কাছে তুলে ধরা চাই আপনার মত, দৃষ্টিভংগি ও আদর্শকে। তবেই হবেন আপনি সার্থক লেখক।

৯. পড়ুন এবং পড়ুন : লিখতে হলে পড়তে হয় প্রচুর। সাধারণ পাঠক এবং অধ্যাপকদের চেয়ে একজন লেখককে পড়তে হয় অনেক বেশি। আপনি যদি লিখতে চান তবে অবশ্যি আপনাকে একজন সেরা পাঠক হতে হবে। ভালো খেলোয়াড় হতে চাইলে যেমন অন্য খেলোয়াড়দের খেলার কৌশল মনোযোগ দিয়ে দেখতে হয়, তেমনি ভালো লেখক হতে চাইলে ভালো ভালো লেখদের বই মনোযোগ দিয়ে পড়তে হয়। তাঁদের লেখার কৌশল পর্যবেক্ষণ করতে হয়। সাইয়েদ মওদূদী, কাজী নজরুল ইসলাম, বুদ্ধদেব বসু, জীবনানন্দ দাশ, আবুল মনসুর আহমদ, সৈয়দ মুজতবা আলী, ইকবাল, মির্জা গালিব, ফররুখ আহমদ, যাযাবর, গোলাম মোস্তফা, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, সৈয়দ আলী আহসান, শরৎচন্দ্র, সুকুমার রায়, মানিক বন্দোপাধ্যায়, মুহাম্মদ আবদুর রহীম, মুহাম্মদ আবদুল হাই, জসীমুদ্দীন, আল মাহমুদ প্রমুখ শ্রেষ্ঠ লেখক ও কবি সাহিত্যিকদের লেখা আমাকেও লেখার প্রতি প্রলুব্ধ করে তুলেছিলো। তাঁদের ভাষার প্রাঞ্জলতা, বাচনভঙ্গি, ভাবের চমৎকারিত্ব, অলংকার, শিল্পরস, শুদ্ধতা, নিপুণতা, কলাকৌশল এবং মোহনীয়তা আমাকে মোহাবিষ্ট করে।

আপনি অন্যদের ভঙ্গি দেখে স্বকীয় ভঙ্গি সৃষ্টি করুন। নিজস্বতা অর্জন করুন। এজন্যেই আপনাকে বেশি বেশি পড়তে হবে। অন্যদের বুঝতে হবে এবং নিজের জন্যে পথ তৈরি করে নিতে হবে।

১০. উপমা উদাহরণ দিয়ে লিখুন : আপনার লেখার মধ্যে প্রচুর উদাহরণ, উপমা সন্নিবেশিত করুন। একজন বিখ্যাত কবি বলেছেন, উপমাই কবিতা। কথাটা সঠিক। তবে কথাটা শুধুমাত্র কবিতার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়, বরং লেখার সব সরণিতেই প্রযোজ্য। আপনি যা-ই লিখুন তাতে উপমা উদাহরণ পেশ করুন। উপমা উদাহরণ বক্তব্যকে স্পষ্ট করে, সহজ করে এবং আকর্ষণীয় করে তোলে।

১১. নোট ও খসড়া তৈরি করুন : আপনি যখন কোনো বিষয়ে লিখতে মনস্থির করবেন, তা আজ লিখুন, কাল লিখুন, কিংবা লিখুন ক'দিন পরে, তবে সে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে শুরু করুন আজই। আপনি যেসব বিষয়ে লিখতে চান, সেসব বিষয়ের তথ্য নোট করার জন্যে খাতা বা ডাইরি ব্যবহার করুন। কল্পিত বা পরিকল্পিত বিষয়ে তথ্য নোট করুন, তথ্য সূত্র নোট করুন। স্থান, কাল, পাত্র ও ঘটনার ইঙ্গিত নোট করুন। নোট কিন্তু লেখা তৈরিতে বন্ধুর মতো সাহায্য করে। নোট লেখার কাজকে সহজ করে। নোট দ্রুত লিখতে সাহায্য করে।

যারা নিজেদের লেখাকে উন্নত করতে চান, তাদের উচিত প্রথমে লেখার সড়া তৈরি করা, লেখাকে বিন্যস্ত করা। ভূমিকা, আখ্যানভাগ বা মূল বক্তব্য,

সমস্যা, সমাধান, উপসংহার ইত্যাদি যথাযথভাবে সাজিয়ে নেয়া উচিত। উদাহরণ, উপমা, তথ্য ইত্যাদির সঠিক স্থাপনা ঠিক করে নেয়া উচিত।

এবার খসড়ার ভিত্তিতে লেখাকে চূড়ান্ত করুন। লেখা চূড়ান্ত করার সময় খসড়ার সাথে নতুন তথ্য যোগ করতে পারেন। বক্তব্য কমবেশি করতে পারেন। ভাষাকে প্রাঞ্জলতা দান করতে পারেন। সর্বোপরি গোটা লেখায় আপনার শিল্প নৈপুণ্য প্রয়োগ করতে পারেন।

মনে রাখবেন, নতুন লেখকদের জন্যে খসড়া তৈরির মূল্য অনেক বেশি। প্রবীন ও পাকা লেখকদের বেলায় খসড়া তৈরির বিষয়টি তাদের নিজস্ব দক্ষতা ও অভিজ্ঞতার সাথে সম্পর্কিত।

১২. শুদ্ধ বানান ও শুদ্ধ যতিচিহ্ন ব্যবহার করুন ঃ আপনি যাই লিখুন, যে শব্দই ব্যবহার করুন, অবশ্যি শুদ্ধ বানানে লিখুন। যথাস্থানে যথাচিহ্ন ব্যবহার করুন। অনেক সময় দেখা যায়, মস্তবড় শিক্ষিত লোকেরাও এ দু'টি ক্ষেত্রে ভুল করেন। কিন্তু আপনি ভুল করবেন কেন ? আপনি তো লেখক। এ ময়দানে দক্ষতা প্রদর্শনই আপনার কাজ।

বিশুদ্ধ ও সর্বাধুনিক বানান রীতি অনুসরণ করুন। অভিধান কাছে রাখুন। যেখানেই সন্দেহ হবে, সেখানেই অভিধান দেখে নিন। তবে, মনে রাখবেন, আপনি অভিধানের অধীন নন। অভিধান আপনার অধীন। আপনার দক্ষতা এতোটা উন্নত করতে হবে, যেনো আপনার দক্ষতার বিশুদ্ধতা ও নিপুণতা অভিধানে স্থান পায়।

একথাও মনে রাখবেন, আপনি যুগের স্রষ্টা আর অভিধান যুগের ধারক। তাই একদিকে নিজের লেখাকে যুগপোযুগী করার জন্যে আপনাকে অভিধান অনুসরণ করতে হবে, অন্যদিকে যুগসৃষ্টি করার জন্যে আপনাকে ছাড়িয়ে যেতে হবে অভিধান। এটাই সৃজনশীল লেখকের বৈশিষ্ট্য।

বাংলা একাডেমীর 'বাংলা বানান অভিধান' এবং সাহিত্য সংসদের 'সমার্থ শব্দকোষ' প্রভৃতি গ্রন্থগুলো আপনার লেখার টেবিলে থাকা চাই। সেই সাথে শ্রেষ্ঠ লেখকদের বানান রীতিও পর্যবেক্ষণ করুন। নিজেও চিন্তা গবেষণা করুন। বাংলা বানান রীতি এখনো তার গন্তব্যের দিকে এগুচ্ছে। আপনিও এগুন। অশুদ্ধ এবং প্রাচীন বানান রীতি আপনার লেখার মান ক্ষুন্ন করবে।

সতর্ক ও সচেতনভাবে যথাস্থানে যথাচিহ্ন ব্যবহার করুন। দাড়ি (।), কমা (,), কোলন (ঃ), সেমিকোলন (;), প্রশ্নবোধক চিহ্ন (?), সম্বোধন চিহ্ন (!), ইত্যাদি সঠিক স্থানে ব্যবহার করুন। এতে আপনার বক্তব্যের ভাব পরিষ্কার হবে, লেখা প্রাঞ্জল হবে। লেখার শ্রীবৃদ্ধি পাবে। লেখা শুদ্ধ হবে।

১৩. পুন পড়ুন এবং প্রুফ দেখুন ঃ লেখা শেষ হবার পর পুরো লেখার উপর একবার নজর বুলিয়ে নিন। নতুন ও উদীয়মান লেখকদের জন্যে এটা খুবই উপকারী। পাকা লেখকদের জন্যেও কম উপকারী নয়। এর ফলে কোনো কিছু বাদ পড়ে গেলো কিনা তা দেখে নিতে পারেন। কোনো ভুল হয়ে থাকলে শুদ্ধ করে নিতে পারেন। প্রয়োজনে কিছু ঘসামাজা করতে পারেন। লেখা নির্ভুল হওয়া সম্পর্কে নিশ্চিত হতে পারেন। লেখার সৌন্দর্যও কিছুটা বৃদ্ধি করতে পারেন। সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি হলো, আপনার লেখার প্রুফ রিডিং-এর কাজটা যদি আপনি নিজেই করেন। পাঠকদের সামনে নির্ভুল লেখা পৌছাবার এটাই সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি। প্রুফ রিডিং-এর কাজ নিজে করলে এর ফলে–

ক. পাণ্ডুলিপি পুণরায় পড়ার কাজ হয়ে যায়।
খ. প্রয়োজনে কোনো শব্দ রদবদল ও ঘসামাজা করা যায়।
গ. প্রয়োজনে নতুন বাক্য গঠন ও বাক্য বিন্যাস পরিবর্তন করা যায়।
ঘ. প্রয়োজনে লেখার মধ্যে কোনো তথ্য যোগ করা যায়।
ঙ. প্রয়োজনে লেখা থেকে কিছু বাদ দেয়া যায়, শুদ্ধ করা যায়।
চ. ছাপা নির্ভুল হবার ব্যাপারে নিশ্চিত থাকা যায়।

তাই সময় বের করে প্রুফ দেখার কাজটি আপনি নিজেই করুন। অন্তত, শেষ প্রুফটি আপনি নিজে দেখুন এবং নিজে প্রিন্ট অর্ডার দিন। মনে রাখবেন, নিজের লেখা নির্ভুল ও হুবহু পাঠকদের কাছে পৌছাবার এটা কার্যকর উপায়। প্রুফ দেখার পর তা ঠিক মতো কারেকশন হলো কিনা, সেদিকেও লক্ষ্য রাখবেন। লেখা প্রকাশকের কাছে হস্তান্তর করলেই লেখকের দায়িত্ব শেষ হয়ে যায় না। লেখককে তার লেখার নির্ভুল ছাপা ও প্রকাশনার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া চাই।

৬. WRITER হোন

ইংরেজিতে আমরা সরলার্থে লেখককে Writer বলতে পারি। এ শব্দটির বর্ণমালাগুলোকে যদি আমরা Vertically সাজাই, তবে তার আলোকে আমরা একজন ভালো লেখকের প্রয়োজনীয় গুণাবলী এবং তার লেখার বৈশিষ্ট্যসমূহ সহজেই মনে রাখতে পারি। দেখুন ঃ

W : Wit, Wisdom, Warm, Wonderful, Will, Worthy, Wary.
R : Research, Resourceful, Responsibility, Reform, Rouse.
I : Independence, Influence, Informative, Ideological, Intend, inspire, intimate.

T : Tactics, Tolerance, Truthfulness, Trustworthy, Topical.

E : Excellence, Exact, Ethical, Efficiency, Effective.

R : Rightful, Relevant, Revision, Revival, Reason, Real.

আপনি যদি ভালো লেখক হতে চান, তবে Writer-এর এসব গুণাবলী অর্জন করুন। এ জিনিসগুলো নিজের মধ্যে সৃষ্টি করুন। ব্যক্তি হিসেবে এ রকম হোন। এসব মনোবৃত্তি নিজের মধ্যে সৃষ্টি করুন। নিজের লেখাকে এ রকম করুন।

আপনি Writer হিসেবে নিজেকে শ্রেষ্ঠত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করুন। অর্থাৎ নিজের বোধশক্তিতে, বুদ্ধিমত্তায়, রসিকতায়, উষ্ণতায়, আন্তরিকতায়, ইচ্ছাশক্তিতে, জ্ঞানে, প্রজ্ঞায়, চমৎকারিত্বে, অনুসন্ধানে, গবেষণায়, সমৃদ্ধতায়, উদ্ভাবনে, দায়িত্বশীলতায়, সংস্কার সাধনে, স্বাধীনচেতায়, প্রভাব বিস্তারে, মুগ্ধকরণে, তথ্য সমৃদ্ধতায়, আদর্শবাতিদায়, কৌশলে, নৈপুণ্যে, পারংগমতায়, সহনশীলতায়, সত্য প্রিয়তায়, বিশ্বস্ততায়, উৎকর্ষতায়, নির্ভুলতায়, নীতিবাদিতায়, ফলপ্রদতায়, কার্যকরিতায়, যথার্থতায়, সততায়, প্রাসংগিকতায়, যুক্তিসিদ্ধতায়, জাগরণ সৃষ্টিতে, সংশোধনে, পুনরুজ্জীবনে, উৎসাহদান ও অন্তরঙ্গতায় আপনি সবাইকে ছাড়িয়ে যান।

আপনার লেখার মধ্যে এ জিনিসগুলো প্রস্ফুটিত হোক ফুলের মতো। এগুলোর সুবাসে সৌরভ ছড়াক আপনার লেখা থেকে। এগুলোর কারণে আপনার লেখা পাঠককে খুশি করবে ফুলের মতো। সুরুভিত করবে পরিবেশকে। বদলে দেবে সমাজের চিন্তাধারাকে। এগুণ বৈশিষ্ট্যগুলোকে আপনি আরো সুন্দর করে সাজান। এগুলো অর্জনের জন্যে সাধনা করুন। এর প্রতিটিকে আলাদা আলাদা ফুলের মর্যাদা দিন। কোনোটি গোলাপ, কোনোটি রজনীগন্ধা, কোনোটি বেল ফুল, কোনোটি হাসনাহেনা, কোনোটি পলাশ, কোনোটি গন্ধরাজ –এভাবে প্রতিটি গুণ বৈশিষ্ট্যের পৃথক পৃথক নাম রাখুন আর আপনার নিজেকে বানান মালঞ্চ। আপনার মধ্যে ওগুলোকে সুসজ্জিত করুন বরুণ মালীর মতো।

৭. কিভাবে লিখবেন ?

আপনি কিভাবে লিখবেন ? আপনার লেখার ধরণ আপনিই ভালো জানেন। আপনার নিশ্চয়ই জানা আছে, কোনো কিছু লিখতে হলে তিন প্রকারে লেখা যায়। যেমন ঃ

১. নিজের হাতে লেখা।

২. ডিকটেট করা বা অন্যকে দিয়ে লেখানো।

৩. সরাসরি কম্পিউটারে কম্পোজ করা।

নিজের হাতে লেখা সাধারণ রীতি। সেই প্রাচীনকাল থেকে মানুষ নিজের লেখা নিজেই লিখে আসছে। নিজের লেখা নিজে লেখার মধ্যেই থাকে মনের প্রশান্তি। নিজের কথা হুবহু লিপিবদ্ধ করার জন্যে, নিজের বানানরীতি ও বিশুদ্ধতার বিষয়ে নিশ্চিত থাকার জন্যে এবং নিজের কল্পিত যতিচিহ্ন যথাস্থানে বসানোর জন্যে নিজের হাতে লেখাই উত্তম।

বিভিন্ন কারণে কেউ কেউ অন্যকে দিয়ে লেখান। মহানবী (স) সাক্ষর ছিলেন না, তাই অন্যদের দিয়ে লেখাতেন। মহাকবি মিল্টন অন্ধ ছিলেন, তাই অন্যকে দিয়ে লেখাতেন। কবি মধুসুদন দত্ত একই সাথে একাধিক কাব্য গ্রন্থ লেখার জন্যে অন্যদের ডিকটেট করেছেন।

যাকে বা যাদের দিয়েই লেখান, তাদের যোগ্যতা, বিশ্বস্ততা, নির্ভরযোগ্যতা, বিশুদ্ধতা ও রীতি সম্পর্কে আপনাকে নিশ্চিত হতে হবে। লেখা শেষ হবার পর পড়িয়ে শুনে নেয়া উচিত। বানান সম্পর্কেও নিশ্চিত হওয়া উচিত।

সময় পাল্টে যাচ্ছে। লেখকদের হাতে লিখে তারপর কম্পোজ করার দিন ফুরিয়ে আসছে। এসেছে কম্পিউটারের যুগ। ঘরে ঘরে, অফিসে আদালতে এখন কম্পিউটার। কম্পিউটার ছাড়া এখন আর কিছুই চলে না। পুরানোরা অনেকেই এখন সেকেলে হয়ে গেছেন। নতুনরা কম্পিউটারের পোকা। এখন লেখকরা কাগজে পাণ্ডুলিপি তৈরি না করে সরাসরি কম্পিউটারেই লেখেন। আগের তুলনায় এখন কাজ অনেক সহজ হয়ে গেছে। আপনিও কম্পিউটার শিখুন। সরাসরি কম্পিউটারে কম্পোজ করুন। লেখার ঝামেলা শেষ। কম্পিউটারের সুবিধা হলো ঃ

১. কাগজে লিখে পাণ্ডুলিপি তৈরিতে যে সময় ব্যয় হয়, এতে তা হয় না।

২. আলাদা প্রুফ দেখে সময় নষ্ট করতে হয় না।

৩. কম্পিউটারেই সংশোধন, সংযোজন, রদবদল করা যায়। বিশুদ্ধ প্রকাশনার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

৪. নিজের ইচ্ছে মতো ইম্পোজ দেয়া যায়।

৫. কম্পোজকৃত লেখা ডিস্কে সংরক্ষণ করা যায় এবং যতোদিন পরে ইচ্ছা সংশোধন ও রদবদল করা যায়।

৬. লেখার কাগজ কলমের পয়সা সেভ করা যায়।

৭. নিজেই কম্পোজ করায় কম্পোজের পয়সা বাঁচানো বা আয় করা যায়।

৮. লেখার টেবিল ও কক্ষ সাজান

আপনি যদি সত্যিই ভালো লেখক হতে চান, তবে আপনার একটি টেবিল এবং একটি কক্ষ থাকা চাই। অবশ্য অনুন্নত ও উন্নয়নশীল বিশ্বের সব লেখকের

পক্ষে একটি কক্ষ যোগাড় করা কঠিন। লেখার জন্যে যদি আপনার আলাদা কক্ষ না থাকে তবে আপনি যেখানেই অবস্থান করেন, যেখানেই বসবাস করেন, সে ঘর বা কক্ষকেই আপনার লেখার কক্ষ বানান। আপনার কক্ষকে সাজান। লেখার উপযোগী করে সজ্জিত করুন। আপনার লেখার কক্ষে যথাক্রমে এই গুরুত্বপূর্ণ জিনিসগুলো থাকা প্রয়োজন ঃ

১. একটি টেবিল।
২. একটি চেয়ার।
৩. এক বা একাধিক বইয়ের আলমিরা/বুকশেলফ।
৪. একটি ক্যালেণ্ডার।
৫. একটি দেয়াল ঘড়ি।

লেখকের সামর্থে কুলালে আরো কতিপয় জিনিস ঃ
৬. কম্পিউটার, প্রিন্টার ও আনুষঙ্গিক জিনিসপত্র।
৭. টেলিফোন।
৮. ওয়েভ সাইট, ইন্টারনেট/ফ্যাক্স সংযোগ।
৯. একটি টেলিভিশন। এতে আপনি শিক্ষণীয় প্রোগ্রাম দেখতে পারেন।
১০. অডি-ভিডিও রেকর্ড প্লেয়ার।

আপনার টেবিলটি সেক্রেটারিয়েল টেবিল হলে ভালো হয়। তাতে যেনো কয়েকটি ড্রয়ার থাকে, অন্তত একটি। আপনার টেবিলের উপর এবং ড্রয়ারে নিম্নোক্ত জিনিসগুলো রাখুন ঃ

১. লেখার কলম ঃ একাধিক কলম রাখুন। কালো এবং লাল কলম রাখুন। কালো কলম দিয়ে লিখুন। লাল কলম দিয়ে প্রয়োজনীয় চিহ্ন দিন।
২. লেখার কাগজ।
৩. নোট বই/ডায়েরি।
৪. প্রয়োজনীয় অভিধান, শব্দকোষ, পরিভাষা কোষ, বিভিন্ন ধরনের কোষ।
৫. পাণ্ডুলিপি ফাইল।
৬. স্টাপলার, পাঞ্চ মেশিন, পেন্সিল, ক্লিপ, পিন, কাগজ কাটার, ছুরি, মার্কার, স্কেল, কাঁচি, গাম, কস্টেপ এবং ফ্লুয়েড বা ইরেজার ইত্যাদি।
৭. টেলিফোন, ফ্যাক্স, ইন্টারনেট ইনডেক্স।
৮. স্ক্রেফ ফাইল।
৯. অন্যান্য।

আপনার বইয়ের আলমারীকে যথাসাধ্য সাজান। সামর্থানুযায়ী রেফারেন্স গ্রন্থাবলী সংগ্রহ করুন। শ্রেষ্ঠ লেখকদের বই দিয়ে আলমারী ও শেলফকে সমৃদ্ধ করুন।

৯. লেখকের সময় স্বাস্থ্য ও পরিবেশ

একজন লেখককে তার লেখা ও পড়ার জন্যে প্রচুর সময় ব্যয় করতে হয়। সময় ব্যয় করা ছাড়া লেখা সম্ভব নয়। লেখার জন্যে পড়া, চিন্তাভাবনা করা, লেখার প্রস্তুতি গ্রহণ এবং লেখার কাজে যে সময় দরকার, লেখক যদি সে সময় দিতে না পারেন, তবে তার পক্ষে ভালো লেখক হয়ে ওঠা কঠিন। আপনি পরিকল্পিতভাবে সময় বের করুন। সময় আপনাকে দিতেই হবে।

একজন লেখককে দীর্ঘসময় ধরে চেয়ারে বসে পড়তে হয়, লিখতে হয়, চিন্তা-ভাবনা করতে হয়। ফলে এ দীর্ঘ সময় ধরে বসে থাকাটা তার স্বাস্থ্যের জন্যে ক্ষতিকর। এতে শরীর আড়ষ্ট হয়ে পড়ে। রক্ত চলাচলের গতি শ্লথ হয়ে যায়। তার চোখে, মস্তিষ্কে, হার্টে, রক্তে, গিটায় গিটায় বিভিন্ন রোগ দেখা দিতে পারে। কোষ্টকাঠিন্য হতে পারে। শুধুমাত্র বসে বসে পড়ালেখা করার কারণে যেনো এসব রোগ না হয়, সে জন্যে একজন লেখককে নিয়মিত ব্যায়াম করা উচিত। সকালে বা সন্ধ্যায় কিছু সময় হাঁটাহাটি করা উচিত। এ ব্যাপারে স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নিয়ে আপনি নিজেকে সুস্থ রাখার ব্যবস্থা করুন। একজন লেখকের লেখার পরিবেশ হওয়া চাই শান্ত, সুন্দর, পরিচ্ছন্ন, সুশৃংখল ও নিরিবিলি। আপনি লেখক হিসেবে ঃ

১. নিজেকে টেনসনমুক্ত রাখুন।
২. পরিবারে শান্তি ও সুখময় পরিবেশ সৃষ্টি করুন।
৩. আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও অন্যান্যদের সাথে সু-সম্পর্ক রাখুন।
৪. আপনার ঘর দোর ও কক্ষ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখুন।
৫. আপনার টেবিল ও কক্ষ সাজিয়ে রাখুন, সুশৃঙ্খল রাখুন, সুবিন্যস্ত রাখুন।
৬. লেখার সময়টা নিরিবিলি থাকার চেষ্টা করুন।
৭. অন্যদের জন্যেও কিছু সময় রাখুন, মিশুন, হাসি খুশি থাকুন।

১০. শেষের ক'লাইন

কথা আর বেশি বাড়িয়ে লাভ কি ? তবে শেষের ক'লাইন না লিখলেই নয়। সে ক'লাইন হলো ঃ

১. লক্ষ্যে পৌছার জন্যে লিখুন। লেখাকে সুনিশ্চিত লক্ষ্যগামী করুন। লক্ষ্যহীন হবার কারণে আপনার কোনো লেখাই যেনো ব্যর্থ হয়ে না যায়। লেখার ফল নির্ভর করে লক্ষ্যের উপর।

২. আল্লাহর খলিফা হিসেবে লিখুন। পৃথিবীতে আল্লাহ্ আপনাকে তাঁর প্রতিনিধি বানিয়েছেন। আল্লাহর প্রতিনিধি হিসেবে আপনার দায়িত্ব হলো, মানুষকে আল্লাহর দিকে ডাকা এবং আল্লাহর বিধান ও তাঁর পসন্দ মাফিক সুসমাজ গড়ার চেষ্টা করা। আপনার কলমকে এ কাজে নিয়োজিত করুন।

৩. আপনি কলম দিয়ে মানুষকে শুদ্ধ ও সংশোধন করার কাজ করুন। মানুষের ভালো প্রবণতাগুলোকে জাগ্রত করুন। কল্যাণের প্রতি উদ্বুদ্ধ করুন। মন্দ ও অন্যায়ের ব্যাপারে মানুষকে নিস্পৃহ করে তুলুন।

৪. কলমের সাহায্যে মানুষের মনে আল্লাহর ভয় ও ভালোবাসা জাগিয়ে তুলুন।

৫. লেখার সাহায্যে মানুষের মাঝে মানবতাবোধ ও ভ্রাতৃবোধ জাগিয়ে তুলুন। মনুষ্যত্বকে চাঙ্গা করে তুলুন। পশুত্বকে ম্রীয়মান করে দিন।

৬. মানুষের অন্তরে একটি ভালো কথার আবেদন সৃষ্টি করা একটি বিরাট দান। এর জন্যে আপনি পাবেন অফুরন্ত প্রতিদান।

৭. কলমকে শানিত করুন। ধারালো অস্ত্র বানান একে। ক্ষুরধার করুন। এর দ্বারা মন্দের বিনাশ আর কল্যাণের নির্মাণ কাজ করুন।

৮. প্রিয় নবী (স) বিশুদ্ধ ও ব্যাপক অর্থবহ কথা বলার প্রতি তাকিদ করেছেন। আপনার লেখাকে বিশুদ্ধ করুন, ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ ব্যবহার করুন।

৯. মহান আল্লাহ্ বলেছেন, তিনি মানুষকে কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়েছেন। আপনিও আপনার কলমের সাহায্যে শিক্ষা বিস্তারের অঙ্গীকার করুন।

১০. মনে রাখবেন, আপনি মরে যাবেন, কিন্তু আপনার লেখা বেঁচে থাকবে। লেখা মৃত্যুর পরও আপনার যাতনার কারণ হতে পারে, কিংবা হতে পারে আপনার অনন্ত কল্যাণের কারণ। তাই ভেবে চিন্তে লিখুন। সিদ্ধান্ত নিন, আপনার লেখাকে আপনি নিজের জন্যে কিসের কারণ বানাতে চান?

১১. আমি, আপনি, আমরা সবাই আল্লাহর দয়া ও সাহায্যের মুখাপেক্ষী। আমরা যা লিখতে চাই তা যেনো লিখতে পারি, আমরা লেখা দিয়ে যা করতে চাই তা যেনো করতে পারি, এবং আমরা লেখার মাধ্যমে যে প্রতিফল পেতে চাই, তা যেনো পেয়ে যাই, সে জন্যে আসুন আমরা ধরণা দিই দয়াময়ের দরবারে !(রচনাকাল ঃ ১৯৯৮)

৯

ব্যবসা করুন উপার্জন করুন আয় করে ব্যয় করুন

১. আয় করে ব্যয় করুন

আপনি কি সুস্থ সবল ও বিবেক-বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষ ? যদি তাই হয়ে থাকুন, তবে অলস ও নিষ্কর্মা হয়ে বসে থাকবেন না। উপার্জন করুন। উপার্জনের জন্যে ব্যবসা বাণিজ্য করুন। চাকুরি বাকুরি করুন। কর্মঠ ও বুদ্ধিমানের জন্যে আল্লাহর যমীনে উপার্জনের উপায় খুঁজে বের করা মোটেও কঠিন নয়।

উপার্জন করুন। উপার্জন করুন নিজের জন্যে, স্ত্রীর জন্যে, সন্তান-সন্ততির জন্যে, বাবা-মা ও ভাই বোনের জন্যে। আত্মীয় স্বজনের জন্যে, গরীব দুঃখীদের দান করার জন্যে। আল্লাহর পথে ব্যয় করার জন্যে। এদের সকলের জন্যে আপনাকে উপার্জন করতে হবে। আপনার উপর এদের সকলের অধিকার আছে। এদের কাউকেও আপনি তার অধিকার থেকে বঞ্চিত করতে পারেন না।

নিজ দেশে উপার্জন করুন। বিদেশে গিয়ে উপার্জন করুন। পূঁজি খাটিয়ে উপার্জন করুন। অভিজ্ঞতা বিনিয়োগ করে উপার্জন করুন। দক্ষতা ও কৌশল খাটিয়ে উপার্জন করুন। বুদ্ধি ও বিবেক খাটিয়ে উপার্জন করুন।

উপার্জন করুন। বাবা, মা, ভাই, বোন, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব কারো উপর বোঝা হয়ে থাকবেন না। স্বনির্ভর হোন, বিত্তবান হোন। মানব সেবা করুন, পরোপকার করুন, হকদারদের অধিকার আদায় করুন। সে জন্য ব্যবসা করুন, উপার্জন করুন। আয় করে ব্যয় করুন।

২. উপার্জন করার নির্দেশ

আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে পাঠাবার সময় বলে দিয়েছেন, পৃথিবীতে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তোমাদের থাকতে হবে আর সেখানেই তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। হ্যাঁ, এ পৃথিবীতেই মানুষের জীবিকা রয়েছে, তবে তা পরিশ্রম ও প্রচেষ্টা ছাড়া এমনি এমনি মানুষের অধিকারে আসে না। আল্লাহ তা'আলা এ প্রাকৃতিক বিধানও কার্যকর করে দিয়েছেন যে, জীবিকা মানুষকে উপার্জন করতে হবে, সংগ্রহ করতে হবে। এজন্যে তাকে শ্রম দিতে

হবে, চেষ্টা চালাতে হবে। বিবেক বুদ্ধি খাটাতে হবে। এভাবে সম্পদ ও জীবিকা উপার্জন করার জন্যে আল্লাহ মানুষকে নির্দেশ দিয়েছেন।

মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্য ও চাকরি-বাকরি ইত্যাদি শ্রমের মাধ্যমে যে অর্থ সম্পদ উপার্জন করে তা আল্লাহর কাছে খুবই পসন্দনীয়। এ ধরনের উপার্জন আল্লাহর অতি প্রিয় এবং এরূপ উপার্জনকারীরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কাছে সম্মানিত ও মর্যাদাবান। অলসরা আল্লাহর অপ্রিয় আর উপার্জনকারীরা আল্লাহর অতিপ্রিয়।

মানুষ ব্যবসা-বাণিজ্য, চাকরি-বাকরি ও শ্রমের মাধ্যমে যে অর্থ সম্পদ উপার্জন করে, সেটাকে আল্লাহ তা'আলা আল কুরআনে 'আল্লাহর অনুগ্রহ' (ফাদলুল্লাহ) বলে অভিহিত করেছেন। তিনি বলেন ঃ

১. (তোমার প্রভু জানেন) তোমাদের কিছু লোক 'আল্লাহর অনুগ্রহ' সন্ধানে যমীনে ভ্রমণ করবে। আর কিছু লোক আল্লাহর পথে লড়াই করবে।" –(সূরা ৭৩ মুযযাম্মিল ঃ ২০)

২. যখন নামায পড়া শেষ হবে, তখন তোমরা যমীনে বেরিয়ে পড়ো আর 'আল্লাহর অনুগ্রহ' সন্ধান করো এবং আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করো, আশা করা যায় তোমরা সফল হবে।"–(সূরা ৬২ আল জুমুয়া ঃ ১০)

৩. তুমি দেখতে পাও পানির বক্ষ বিদীর্ণ করে নৌযান চলাচল করছে। এ ব্যবস্থা এজন্যে করে দিয়েছি, যাতে করে তোমরা সহজেই 'আল্লাহর অনুগ্রহ' সন্ধান করতে পারো, আর যেনো তোমরা তাঁর শোকর আদায় করো।"–(সূরা ৩৫ ফাতির ঃ ১২)

৪. হে ঈমানদার লোকেরা ! তোমরা পরস্পরের অর্থ সম্পদ অন্যায় পন্থায় গ্রহণ (আত্মসাত) করো না, তবে পরস্পরের সম্মতিক্রমে কেনা-বেচার (ব্যবসায়ের) মাধ্যমে গ্রহণ করো।"–(সূরা ৪ আন নিসা ঃ ২৯)

৫. "হজ্জের সময় (ব্যবসায়ের মাধ্যমে) 'আল্লাহর অনুগ্রহ' সন্ধান করলে তোমাদের কোনো দোষ হবে না।"–(সূরা ২ আল বাকারা ঃ ১৯৮)

৬. "এমন বহুলোক আছে যাদেরকে ব্যবসা এবং কেনা-বেচা আল্লাহর স্মরণ থেকে, সালাত কায়েম করা থেকে এবং যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না।"–(সূরা ২৪ আন নূর ঃ ৩৭)

৭. "আল্লাহ ব্যবসা-বাণিজ্যকে হালাল করে দিয়েছেন আর নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন সুদ খুরীকে।"–(সূরা ২ আল বাকারা ঃ ২৭৫)

৮. "পুরুষরা যা কিছু উপার্জন করবে, তাদের অংশ হবে সে অনুযায়ী আর নারীরা যা কিছু উপার্জন করবে, তাদের অংশ হবে সে অনুযায়ী। তোমরা আল্লাহর কাছে জীবিকা চাও।"–(সূরা ৪ আন নিসা ঃ ৩২)

আল কুরআনের এ আয়াতগুলো পরিষ্কারভাবে ব্যবসা বাণিজ্য ও শ্রমের মাধ্যমে উপার্জন করার নির্দেশ দিচ্ছে, উৎসাহিত করছে এবং এর বৈধতা ঘোষণা করছে। তাছাড়া এক্ষেত্রে একটি বিশেষ নীতিমালা অনুসরণের প্রতিও নির্দেশ প্রদান করছে।

বিশ্বনবী মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা) ব্যবসার এবং শ্রমের মাধ্যমে উপার্জন করাকে এবং উপার্জন কারীদেরকে সুসংবাদ দিয়েছেন। তিনি নিজেও একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। বড় ব্যবসায়ী ছিলেন তিনি। তাঁর ছিলো আন্তদেশীয় বাণিজ্য (International Trade)। ব্যবসায়িক সাফল্য ও সুনামের মাধ্যমে তাঁর আদর্শ ব্যক্তিত্ব ও সামাজিক নেতৃত্ব বিপুল জনপ্রিয়তা লাভ করে। তিনি কেবল সৎ ও বিশ্বস্ত ব্যবসায়ীই ছিলেন না, বরং সেই সাথে তিনি ছিলেন সুদক্ষ ব্যবসায়ী। তিনি বলেছেন ঃ

১. "সত্যবাদী বিশ্বস্ত ব্যবসায়ী নবী, সিদ্দীক ও শহীদদের সাথি হবে।"
   –(মুসতাদরকে হাকিম, জামে তিরমিযি)
২. "বিশ্বস্ত সত্যাশ্রয়ী ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন শহীদদের সাথি হবে।"
   –(সুনানে ইবনে মাজাহ)
৩. "সর্বোত্তম উপার্জন হলো আল্লাহর পসন্দনীয় পন্থায় ব্যবসা করা এবং গায়ে খেটে উপার্জন করা।"–(মিশকাত)

এ হাদীসগুলো থেকে ব্যবসা বাণিজ্য এবং ব্যবসায়ীদের মর্যাদা পরিষ্কার হয়ে যায়। আল্লাহ তা'আলা বলেছেন ঃ

"পৃথিবীর সবকিছু আমি তোমাদের জন্যে সৃষ্টি করেছি।"
–(আল কুরআন ২ ঃ ২৯)

অন্যত্র বলেছেন ঃ "আমি পৃথিবীতেই তোমাদের জীবিকার ব্যবস্থা রেখেছি।
–(আল কুরআন ঃ ৭ ঃ ১০)।

সুতরাং এ পৃথিবী থেকে সম্পদ আহরণ করা, আয় উপার্জন করা এবং এ উদ্দেশ্যে ব্যবসা বাণিজ্য করা স্বয়ং স্রষ্টার ইচ্ছারই বাস্তবায়ণ।

৩. ব্যবসা বাণিজ্যে ইসলামী দৃষ্টিভংগি

বিশ্বের সব মানুষই ব্যবসা বাণিজ্য এবং অন্যান্য উপায়ে অর্থ সম্পদ উপার্জন করে থাকে। প্রত্যেক ব্যক্তিই উপার্জন প্রক্রিয়ায় নিজস্ব ধ্যান-ধারণা,

দৃষ্টিভংগি, নীতি-আদর্শ, মতবাদ ও স্বার্থ চিন্তা প্রয়োগ করে থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি মুসলিম, যিনি ইসলামী নীতিমালা ও দৃষ্টিভংগির ভিত্তিতে ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা করতে চান, তিনি কিভাবে তা করবেন ? এ ক্ষেত্রে প্রথমেই জানা দরকার, ইসলামী দৃষ্টিভংগি বলতে কি বুঝায় ?

ইসলামী দৃষ্টিভংগি বলতে বুঝায়, এ বিশ্বজগত এমনি এমনি সৃষ্টি হয়নি। এর একজন স্রষ্টা রয়েছেন। তিনি এক, একক ও অনন্য। তাঁর সত্তা, ক্ষমতা, গুণাবলী ও অধিকার অবিভাজ্য। নিখিল বিশ্বজগতের তিনি কেবল স্রষ্টাই নন, তিনি এর একচ্ছত্র মালিক, শাসক এবং পরিচালকও বটে। পৃথিবী নামক এই গ্রহটি তাঁর সৃষ্টির একটি অতিক্ষুদ্র অংশ। এ পৃথিবীতে তিনি মানুষকে তাঁর দাস ও প্রতিনিধি হিসেবে সৃষ্টি করেছেন। মানুষকে তিনি ইচ্ছার ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবার স্বাধীনতা দিয়েছেন। এজন্যে তাকে বুদ্ধি বিবেকও দিয়ে দিয়েছেন। একথাও বলে দিয়েছেন, মানুষ যদি তাঁর ইচ্ছা মাফিক জীবন যাপন করে এবং তাঁর দাসত্ব ও আনুগত্যের বন্ধনে নিজেকে আবদ্ধ রাখে, তবেই রয়েছে তার জন্যে কল্যাণ আর কল্যাণ। নইলে রয়েছে তার জন্য অকল্যাণ আর অপমান।

তিনি একথাও জানিয়ে দিয়েছেন, এ পৃথিবীর জীবনই মানুষের জীবনের শেষ নয়। মরণের পর তাকে আবার পুনর্জীবিত করা হবে। সেখানে তাকে এক কঠিন বিচারের সম্মুখীন হতে হবে। পৃথিবীর জীবনে সে তার পরম দয়াময় স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহর ইচ্ছা, আনুগত্য ও দাসত্বের জীবন যাপন করেছিলো কিনা, সুস্পষ্ট ও অকাট্য দলিল প্রমাণের ভিত্তিতে সেখানে এ বিষয়ের হিসাব নেয়া হবে। করেছে বলে প্রমাণিত হলে তাকে অফুরন্ত সুখ ও স্বাচ্ছন্দের জান্নাতে থাকতে দেয়া হবে। সে জীবন অনন্ত। আর আল্লাহর ইচ্ছা মাফিক জীবন যাপন করেনি বলে প্রমাণিত হলে কঠিন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির জাহান্নামে তাকে ফেলে রাখা হবে। সেখানে সে থাকবে অনন্তকাল।

মানুষ যেনো পরজীবনে এই কঠিন বিপদে না পড়ে, সে যেনো মহাসুখের জান্নাতের পথেই চলতে পারে, সে জন্যে দয়াময় রহমানুর রহীম আল্লাহ তা'আলা মানুষকে জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর ইচ্ছা অনিচ্ছা, তাঁর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টির পথ। জান্নাত ও জাহান্নামের পথ। এজন্যে তিনি মানুষের মধ্য থেকে নবী-রসূল নিযুক্ত করেছেন। তাঁদের মাধ্যমে মানুষের জন্যে নিজের মনোনীত জীবন যাপনের বিধান পাঠিয়েছেন।

মুহাম্মদ (স) সর্বশেষ রসূল। তাঁর মাধ্যমে কিয়ামত পর্যন্ত সমস্ত মানুষের জন্যে জীবন পরিচালনার বিধান পাঠিয়েছেন। আল্লাহ প্রদত্ত বিধানকে কুরআনের ভাষায় 'আদ দীনুল ইসলাম' বা ইসলামী জীবন বিধান বলা হয়। জীবনের

সমস্ত দিক ও বিভাগ এবং জীবনের সমস্ত কর্মপরিচালনার বিধি বিধান ইসলামে রয়েছে। ইসলামের বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করা ও জীবনের সমস্ত কর্মপরিচালনার মধ্যেই নিহিত রয়েছে মানুষের পার্থিব ও পরকালীন জীবনের সাফল্য, কল্যাণ ও মুক্তি।

–এই আকীদা বিশ্বাস ও ধ্যান ধারণা পোষণ করার নামই ইসলামী দৃষ্টিভংগি। এ দৃষ্টিভংগির ভিত্তিতে যে কাজই করা হবে, তাই হবে আল্লাহর আনুগত্য ও দাসত্বের কাজ। আর এ দৃষ্টিতে যখন কোনো কাজ করা হয়, সেটাকেই বলা হয় ইবাদত।

মানুষ তার জীবন যাপন, জীবন নির্বাহ, জীবনের উন্নতি ও সুখ সমৃদ্ধি লাভ এবং সমাজ পরিচালনা ও মানব কল্যাণের জন্যে যা কিছু করে, যদি তা আল্লাহর ইচ্ছা ও বিধান মতো করে, তবে তা সবই ইবাদত। একইভাবে ব্যবসা বাণিজ্য এবং উপার্জনও ইবাদত, যদি তা পরিচালিত হয় আল্লাহর বিধান মাফিক। ব্যবসা বাণিজ্য ইবাদত হবার জন্যে শর্ত হলো ঃ

ক. ইবাদতের তথা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য থাকতে হবে।
খ. আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নিষেধ করা পণ্যের ব্যবসা করা যাবে না।
গ. আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নিষেধ করা নিয়ম পদ্ধতিতে ব্যবসা করা যাবে না।
ঘ. সততা, সত্যবাদিতা, ন্যায়পরায়নতা, সুবিচার, বিশ্বস্ততা ও মানব কল্যাণ হতে হবে ব্যবসায়ের আদর্শ।
ঙ. অর্থ সম্পদের মূল মালিক মানতে হবে আল্লাহকে, নিজেকে মনে করতে হবে রক্ষক ও আমানতদার। সুতরাং আয় ও ব্যয় করতে হবে মালিকের ইচ্ছা মাফিক।

৪. সুদী কারবার নয়, ব্যবসা করুন

সেই প্রাচীনকাল থেকেই সুদী কারবার চলে আসছে। আধুনিক কালের পুঁজিবাদী অর্থ ও বাণিজ্য ব্যবস্থা তো সুদের ভিত্তির উপরই দাঁড়িয়ে আছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা সুদকে হারাম করে দিয়েছেন এবং ব্যবসায়ের মাধ্যমে উপার্জন করতে বলেছেন।

সত্যিকার মুসলমানরা সুদী কারবার করেন না। সুদের ভিত্তিতে উপার্জন করেন না। তাঁরা ইসলামী মূলনীতির আলোকে ব্যবসা করেন। কারণ, তারা তো পার্থিব ও পরকালীন উভয় জীবনের সাফল্য চান। যাদের মধ্যে পরকালের অনন্ত জীবনকে আল্লাহর আযাব থেকে বাঁচাবার তীব্র চেতনা নেই, তারাই সুদের সাথে জড়িয়ে পড়ে। এদের অনেকেই আবার মনে করে, সুদ আর ব্যবসার মধ্যে পার্থক্য কি ? এরা বলে ঃ 'ব্যবসা তো সুদেরই মতো।' (আল

কুরআন ২ ঃ ২৭৫)। অথচ আল্লাহ্ তা'আলা ব্যবসাকে বৈধ করেছেন আর সুদকে করেছেন নিষিদ্ধ। (আল কুরআন ২ ঃ ২৭৫)।

শুধু তাই নয়, সুদী কারবার থেকে যারা বিরত হয় না, তাদের ব্যাপারে আল্লাহর ঘোষণা হলো, "যদি তোমরা সুদ থেকে ফিরে না আসো, তবে জেনে রাখো, আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষিত হলো।"–(আল কুরআন ২ ঃ ২৭৯)।

এই হলো সুদের বিরুদ্ধে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলার কঠোর হুঁশিয়ারী। রসূলে করীম (স) সুদের দাতা, গ্রহীতা, লেখক ও সাক্ষীদের অভিসম্পাত করেছেন। তিনি সুদকে ব্যভিচারের পাপের মতো জঘন্য পাপের কাজ বলে ঘোষণা দিয়ে গেছেন।

তাই কোনো মু'মিন ব্যক্তি নিজেকে সুদের সাথে জড়িত করতে পারেন কি? আল্লাহ ও রসূলের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হতে পারেন কি ? এর মতো জঘন্য পাপের মধ্যে নিজেকে লিপ্ত করতে পারেন কি ?

না, সুদী কারবার নয়, মুসলমানদের ব্যবসা করতে হবে। ব্যবসায়ে উন্নতি করতে হবে। সুদ মুক্ত ব্যবসাকে বিশ্বের বুকে প্রতিষ্ঠিত ও বিজয়ী করতে হবে। সুদের অকল্যাণ থেকে বিশ্ববাসীকে মুক্ত করতে হবে।

৫. ব্যবসা কি ?

ব্যবসা সমাজের সব মানুষেরই অতি পরিচিত একটি বিনিময় প্রক্রিয়া। নিজের পণ্য দ্রব্যকে অপরের পণ্য দ্রব্যের সাথে পারস্পরিক সদিচ্ছা ও আগ্রহের ভিত্তিতে বিনিময় করে নেয়াই হলো ব্যবসা। প্রাচীনকালে একটি পণ্যের বিনিময়ে আরেকটি পণ্য গ্রহণ করা হতো। আধুনিককালে মুদ্রা প্রবর্তিত হওয়ায় মুদ্রার বিনিময়ে পণ্য দ্রব্য ক্রয় বিক্রয় করা হয়।

সুতরাং 'লাভের আশায় লাভ লোকসানের ঝুঁকি নিয়ে মুদ্রার বিনিমিয়ে মাল ক্রয়-বিক্রয় করাকেই ব্যবসা বলা হয়।'

ইসলামী মূলনীতি অনুযায়ী ব্যবসায়ে লাভ লোকসানের ঝুঁকি থাকতে হবে এবং তা উভয় পক্ষের সম্মতি ও সন্তুষ্টির ভিত্তিতে হতে হবে।

ব্যবসায়ের অনেক প্রকারভেদ আছে। বিভিন্ন প্রকার ব্যবসায়ের ইসলামী পরিভাষাও রয়েছে। ব্যবসা ও বিনিয়োগের কয়েকটি ইসলামী পরিভাষা এখানে উল্লেখ করা হলো ঃ

ক. বাইয়ে মতলক ঃ এটা হলো সাধারণভাবে মূল্যের বিনিময়ে পণ্য ক্রয় বিক্রয় করা।

খ. বাইয়ে মুরাবাহা : লাভ যুক্ত করে বিক্রয় করা। পণ্যের ক্রয় মূল্যের সাথে অন্যান্য খরচ যুক্ত করে তার উপর লাভে বিক্রয় করাকে বাইয়ে মুরাবাহা বলা হয়। এ পদ্ধতিতে বিক্রয় মূল্য নির্ধারিত হতে হবে এবং মূল্য মুদ্রাকারে পরিশোধ করতে হবে।

গ. বাইয়ে মুআজ্জল : এর মানে বাকীতে বিক্রয় করা। এ ক্ষেত্রে পূর্বেই মূল্য নির্ধারিত হবে এবং মূল্য পরিশোধের কিস্তি বা সময়ও নির্ধারিত হবে। এটা মূলত 'বাইয়ে মুরাবাহা মুআজ্জল।'

ঘ. বাইয়ে সালাম : মানে অগ্রিম বিক্রি করা। এ পদ্ধতিতে মূল্য আগেই পরিশোধ করা হয় আর পণ্য সরবরাহ করা হয় ভবিষ্যতে নির্ধারিত সময়ে।

ঙ. বাইয়ে মুদারাবা : এটা হচ্ছে শ্রম ও মূলধনের ভিত্তিতে যৌথ ব্যবসা। এক পক্ষের মুলধন আর অপর পক্ষের শ্রম ও অভিজ্ঞতা।

চ. বাইয়ে মুশারাকা : এটা হচ্ছে মুলধনের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে যৌথ কারবার।

এসব ব্যবসা ও বিনিয়োগের বিভিন্ন রকম শর্ত শরায়েত আছে এবং বিভিন্ন প্রকারভেদও আছে। এখানে স্বল্প পরিসরে সেগুলো আলোচনার সুযোগ নেই : তবে সব ধরনের ব্যবসাতেই ইসলামের মূলনীতিগুলোকে অনুসরণ করতে হবে।

৬. ব্যবসা বাণিজ্যের নিষিদ্ধ পদ্ধতি

১. সর্বপ্রকার সুদী লেনদেন ও সুদ ভিত্তিক কায়কারবার নিষিদ্ধ। এ ব্যাপারে আল্লাহর নির্দেশ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

২. বিনিময় ও সমঝোতা ছাড়া কারো মাল হস্তগত করা যাবে না : হে লোকেরা যারা ঈমান এনেছো ! তোমরা নিজেদের মধ্যে অন্যায় উপায়ে একে অপরের সম্পদ ভক্ষণ করো না, তবে পারস্পরিক সন্তুষ্টি ও সমঝোতার ভিত্তিতে ব্যবসা করতে পারো।"–(সূরা ৪ : ২৯)

৩. ওজন ও পরিমাপে কম বেশি করা নিষিদ্ধ : ধ্বংস তাদের জন্যে যারা মাপে কম দেয়। এদের অবস্থা হলো, মানুষের কাছ থেকে নেবার সময় তারা পুরো মাত্রায় নেয় আর তাদেরকে ওজন করে বা মেপে দেবার সময় কম করে দেয়।"–(আল কুরআন ৮৩ : ১-৫)

"ন্যায়ভাবে ওজন করো। দাঁড়িপাল্লাকে ক্ষতিগ্রস্ত করো না।"
–(আল কুরআন ৫৫ : ৯)

৪. বেশ্যাবৃত্তির ব্যবসা নিষিদ্ধ : "ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না, ওটা অত্যন্ত খারাপ কাজ এবং জঘন্য পথ।"(আল কুরআন ১৭ : ৩২)

৫. যে কোনো প্রকার অশ্লীলতা প্রসারকারী ব্যবসা বাণিজ্য নিষিদ্ধ। অর্থাৎ উপার্জনের সেসব উপায় নিষিদ্ধ, যেগুলো দ্বারা সমাজে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা ছড়ায় ঃ "যারা চায় যে, ঈমানদার লোকদের মাঝে অশ্লীলতার প্রসার ঘটুক, তাদের জন্যে পৃথিবীর জীবনে এবং পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।(আল কুরআন ২৪ ঃ ১৯)

৬. মাদক দ্রব্যের উৎপাদন ও ব্যবসা বাণিজ্য নিষিদ্ধ।

৭. জুয়া নিষিদ্ধ।

৮. মূর্তি উৎপাদন ও মূর্তির ব্যবসা নিষিদ্ধ।

৯. ভাগ্য গণনার ব্যবসা নিষিদ্ধ।

"হে ঈমানদার লোকেরা ! মদ, জুয়া, মূর্তি পূজার বেদী, ভাগ্য নির্ণায়ক শর (পাশা খেলা) এসবই ঘৃণ্য শয়তানী কাজ। এগুলো থেকে দূরে থাকো। আশা করা যায় তোমরা সফলতা লাভ করবে।"(আল কুরআন ঃ ৫ ঃ ৯০)

১০. জবরদখল, লুণ্ঠন ও আত্মসাত নিষিদ্ধ ঃ আর যে (মানুষের) অর্থ সম্পদ আত্মসাত করবে, কিয়ামতের দিন সে অবশ্যি এ আত্মসাতসহ হাজির হবে।"-(আল কুরআন ৩ ঃ ১৬১)

১১. সাক্ষী বিহীন ও অলিখিত চুক্তি করা যাবে না। যাবতীয় ঋণ বিনিয়োগ ও ব্যবসায়িক চুক্তি লিখিত হতে হবে এবং সাক্ষী রাখতে হবে।-(দেখুন আল কুরআন ২ ঃ ২৮২)

১২. কারো সম্পদে যুল্‌ম করা যাবে না।-(আল কুরআন ৪ ঃ ১০)

১৩. হারাম জিনিসের ব্যবসা নিষিদ্ধ। নবী করীম (সা) বলেছেন ঃ আল্লাহ যখন কোনো জিনিসকে হারাম করেন তখন তার বেচাকেনাকেও হারাম করেন।-(আবু দাউদ)

১৪. বাজারে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে দাম বাড়ানোর উদ্দেশ্যে মওজুদদারী নিষিদ্ধ।-(সহীহ মুসলিম)

১৫. ধোঁকা প্রতারণা নিষিদ্ধ। নবী করীম (স) বলেছেন ঃ কেউ যখন কোনো মাল বিক্রয় করবে, তখন সে যেনো মালের প্রকৃত অবস্থার বিবরণ দেয়। মালের কোনো ত্রুটি গোপন রাখা তার জন্যে বৈধ নয়।-(মুসতাদরকে হাকিম)

নবী করীম (স) আরো বলেছেন ঃ যে প্রতারণা করলো, সে আমার লোক নয়।"-(সহীহ মুসলিম)

১৬. চোরাই মাল ক্রয় বিক্রয় করা নিষেধ। রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ যে চোরাই মাল কিনলো, সে চোরের সমতুল্য অপরাধ করলো।"-(বায়হাকী)

১৭. ব্যবসায়ের শর্ত ভংগ করা নিষিদ্ধ।-(সহীহ্ বুখারী)

১৮. অনিশ্চিত পণ্য ক্রয় বিক্রয় করা নিষেধ।

১৯. যৌথ কারবারে অবিশ্বস্ততা ও খিয়ানত জঘন্য অপরাধ।-(হাদীস)

২০. ভালো মালের স্থলে খারাপ মাল, কিংবা ভালো মালের সাথে ভেজাল মাল মিশিয়ে বিক্রয় করা নিষিদ্ধ। আল্লাহ্ বলেন ঃ মানুষকে পরিমাপে কম, বা খারাপ দ্রব্য, কিংবা ত্রুটিযুক্ত জিনিস দিও না। পৃথিবীতে বিপর্যয়সৃষ্টিকারী হয়ো না।(আল কুরআন ২৬ ঃ ১৮৩)

৭. ব্যবসায়ের কতিপয় শর্ত শরায়েত

উপরোক্ত মূলনীতিগুলো ছাড়াও ফকীহ্গণ ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে কুরআন হাদীসের আলোকে কতিপয় অবশ্য পালনীয় শর্ত শরায়েত নির্ধারিত করে দিয়েছেন। সেগুলো হলো ঃ

১. ক্রয় বিক্রয়ের ক্ষেত্রে দু'টি সুনির্দিষ্ট পক্ষ থাকতে হবে। অর্থাৎ ক্রেতা ও বিক্রেতা। নিজেই ক্রেতা ও বিক্রেতা হওয়া যাবে না।

২. পক্ষদ্বয়কে বালিগ ও জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন হতে হবে। নাবালিগ, পাগল ও নির্বোধ কোনো পক্ষ হতে পারবে না। তবে তাদের পক্ষে তাদের অভিভাবক উকীল হিসেবে বেচাকেনা করতে পারবে।

৩. পণ্য নির্দিষ্ট ও মূল্য নির্ধারিত হতে হবে। অর্থাৎ এই মাল/পণ্য এই মূল্যে উভয় পক্ষ বেচাকেনায় সম্মত হয়েছে-এমন হতে হবে।

৪. উভয় পক্ষের সম্মতি/সমঝোতা/সন্তুষ্টি থাকতে হবে।

৫. বিক্রিত মালের উপর বিক্রেতার পূর্ণ মালিকানা থাকতে হবে।

৬. বিক্রিত মালের উপর বিক্রেতা ছাড়া অপর কারো অধিকার বা দাবি থাকতে পারবে না।

৭. বিক্রিত মাল ক্রেতার কাছে হস্তান্তর যোগ্য হতে হবে।

৮. বিক্রিত পণ্য কোনো হারাম দ্রব্য হবে না।

৯. অগ্রিম বিক্রি ও বাকি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী নির্ধারিত হবে।

১০. ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে প্রচলিত অন্যান্য বৈধ শর্ত যোগ করা যাবে।

১১. ইসলামী নীতিমালা ও দৃষ্টিভংগির খেলাপ কোনো শর্তারোপ করা যাবে না।

১২. এমন কোনো শর্তারোপ করা যাবে না, যাতে কোনো পক্ষ ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।

১৩. নগদ বিক্রি ছাড়া বাকি ও অগ্রিম বিক্রি এবং অন্যান্য বিনিয়োগের ক্ষেত্রে লিখিত চুক্তি সম্পাদন করতে হবে।

৮. আদর্শ ও সফল মুসলিম ব্যবসায়ীর বৈশিষ্ট্য

এ যাবত আমরা যা কিছু আলোচনা করলাম, তা থেকে ইসলামের আলোকে ব্যবসা পরিচালনা করার একটি মৌলিক ও মোটামুটি ধারণা নিশ্চয়ই আপনি লাভ করেছেন। এ লেখায় যেহেতু বিস্তারিত ও ব্যাখ্যামূলক আলোচনার উদ্দেশ্য নেই, তাই এখানে আদর্শ ও সফল মুসলিম ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও উদ্যোক্তার কতিপয় প্রয়োজনীয় গুণবৈশিষ্ট্যের কথা নোট করে দিচ্ছি ঃ

১. হালাল উপার্জনের নিয়ত করুন এবং এ ব্যাপারে পাকা সিদ্ধান্ত নিন।

২. পসন্দসই ও সুবিধাজনক ব্যবসা নির্বাচন করুন।

৩. পুঁজি বিনিয়োগের আগে ভালোভাবে জেনেশুনে নিন।

৪. অধিক বিনিয়োগের আগে অভিজ্ঞতা অর্জন করুন।

৫. গোটা কারবার নিজের নিয়ন্ত্রণে রাখুন, নিজে তদারকী করুন এবং নিজের দৃষ্টির আওতায় রাখুন।

৬. প্রয়োজন মতো দক্ষ ও বিশ্বস্ত কর্মচারী নিয়োগ করুন।

৭. কম খরচে ভালো জিনিস বাজারে ছাড়ুন।

৮. কম লাভে বেশি বিক্রি করুন।

৯. উৎপাদন ও সরবরাহের খরচ কমান।

১০. সততা ও সত্যবাদীতার নীতি অবলম্বন করুন।

১১. বিশ্বস্ততার প্রতীক হোন। আমানতদার হোন। কখনো খিয়ানত করবেন না।

১২. ক্রেতা ও ভোক্তাদের সুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখুন।

১৩. ক্রেতা ও ভোক্তাদের ভালোবাসুন। তাদের অসুবিধার প্রতিও লক্ষ্য রাখুন। তাদের প্রতি ইহ্সান করুন।

১৪. সহজ সরল ব্যবহার করুন। হাসিমুখে কথা বলুন।

১৫. সহজ সরল জীবন যাপন করুন।

১৬. মিতব্যয়ী হোন। অপব্যয় করবেন না। অপচয়কারী ব্যবসায়ী হতে পারে না। অপচয়কারী শয়তানের ভাই।

১৭. কখনো মিথ্যা বলবেন না।

১৮. কখনো প্রতারণা করবেন না। ক্রেতা ও ভোক্তাদের প্রতারিত করবেন না। নিজেও প্রতারিত হবেন না।

১৯. কখনো চুক্তি ও প্রতিশ্রুতি ভংগ করবেন না।

২০. কখনো শর্ত ভংগ করবেন না।

২১. কখনো মিথ্যা শপথ করবেন না। কসম খাওয়ার প্রয়োজন নেই।

২২. বিক্রয়ের সময় পণ্যের সঠিক গুণাগুন বলে দেবেন।

২৩. বাজারে সংকট সৃষ্টির উদ্দেশ্যে পণ্য মওজুদ করবেন না। সংকটকালে ভোক্তাদের পাশে দাঁড়ান।

২৪. পণ্যের যথার্থ ওজন ও পরিমাণ নিশ্চিত করুন।

২৫. নিজ কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সাথে সহজ সরল ও সুন্দর ব্যবহার করুন। তাদের শ্রমের মর্যাদা দিন। তাদের প্রতি অন্যায় ও যুল্‌ম করবেন না।

২৬. কঠোর পরিশ্রম করুন। বিলাসিতা বর্জন করুন।

২৭. কষ্ট সহিষ্ণু ও ধৈর্যশীল হোন।

২৮. উদ্যোগী হোন, উদ্দমী হোন।

২৯. সাহসী হোন, সতেজ হোন।

৩০. চমৎকার চরিত্রের অধিকারী হোন। চরিত্র মাধুর্য দিয়ে সকলকে মুগ্ধ করুন এবং মুগ্ধ রাখুন।

৩১. পরিকল্পিতভাবে কাজ করুন।

৩২. সময়ের সদ্ব্যবহার করুন। সময় কাজে লাগান।

৩৩. স্বাস্থ্য, ব্যবসায়, পণ্য সামগ্রী, আসবাবপত্র সহ প্রতিটি প্রয়োজনীয় জিনিসের প্রতি যত্নবান হোন।

৩৪. পাকা হিসেব নিকেষ রাখুন।

৩৫. বাণিজ্যিক আইন সম্পর্কে অবহিত থাকুন। আইনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হোন। আইন ভংগ করবেন না।

৩৬. সবসময় সমস্যা সম্পর্কে অবহিত থাকুন। সমস্যার মধ্য দিয়েই চলুন। সমস্যায় জড়িয়ে পড়বেন না। যতোটা সম্ভব সমস্যা সমাধান করে নিন।

৩৭. প্রয়োজনীয় রেকর্ডপত্র ও দলিল দস্তাবিজ সংরক্ষণ করুন।

৩৮. সঠিক লোক দিয়ে সঠিক কাজ করান।

৩৯. উন্নতির সিঁড়ি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা রাখুন।

৪০. লাভ ও লোকসান উভয়টাকেই মেনে নিন। বেশি বেশি লোকসান যেনো না হয়, সে জন্য অভিজ্ঞতা কাজে লাগান।

৪১. দেনা পরিশোধে অগ্রগামী হোন। পাওনাদারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন। অকারণে দেনাদার হবেন না।

৪২. নিজের পাওনা আদায়ে কোমল ও সহানুভূতিশীল হোন। প্রয়োজন হলে সাধ্য মতো সুযোগ দিন।

৪৩. ব্যবসা বাণিজ্য ও চাকরি বাকরি যেনো কোনো অবস্থাতেই আপনাকে নামায, রোযা ও আল্লাহর স্মরণ থেকে বিন্দুমাত্র গাফিল না করে। অবশ্যি সঠিক হিসাব করে যাকাত আদায় করুন।

৪৪. মনে রাখবেন, আল্লাহর ভয় ব্যবসায়ীর ভূষণ।

৪৫. মনে রাখবেন, দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা অর্জন সাফল্যের সোপান।

৪৬. প্রশিক্ষণ নিন, ভ্রমণ করুন, অন্যদের জানুন।

৪৭. সর্বোত্তম প্রযুক্তি ও ব্যবস্থাপনার অধিকারী হোন।

৪৮. মন দেহ, পোশাক ও পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখুন।

৪৯. সৌন্দর্য প্রিয় হোন।

৫০. জ্ঞানার্জন করুন, উদার হোন, উপকারী হোন।

৫১. সতর্ক হোন, চৌকস হোন।

৫২. দানশীল হোন। মানবিক ব্যবহার করুন।

৫৩. High product, good quality, low cost-এই নীতি অবলম্বন করুন।

৯. উপার্জিত সম্পদ কী করবেন ?

মানুষ তার যাবতীয় শ্রমের মাধ্যমে বৈধ পন্থায় যে অর্থ উপার্জন করে, তা বৈধ পন্থায় ব্যয় করাও ইবাদত। মানুষ তার উপার্জিত অর্থ তিনটি পন্থায় ব্যবহার করে ঃ

১. মওজুদ বা সঞ্চয় করে ;

২. বিনিয়োগ করে ;

৩. ব্যয় বা খরচ করে।

অর্থ সম্পদ নিশ্চল সঞ্চয় বা জমা করে রাখাকে আল্লাহ তা'আলা পসন্দ করেন না। বৈধ পন্থায় লাভের উদ্দেশ্যে বিনিয়োগ বা ব্যবসা করাকে আল্লাহ পসন্দ করেন এবং উৎসাহিত করেছেন।

ব্যয় বা খরচ দুই প্রকার। এক প্রকার ব্যয় ইবাদত। যেমন, নিজের প্রয়োজনে ব্যয় করা। সন্তান সন্ততি ও স্ত্রীর জন্যে ব্যয় করা। পিতা-মাতা, ভাই বোন ও অন্যান্য নিকটাত্মীয়দের জন্যে ব্যয় করা। অভাবীদের দান করা। আল্লাহর দীনের কাজে ব্যয় করা। মেহমানদারি করা ইত্যাদি।

আরেক প্রকার ব্যয় ইবাদত তো নয়ই, বরং তা গুনাহ ও পাপের কাজ। যেমন, যে কোনো হারাম কাজে ব্যয় করা, অশ্লীল কাজে ব্যয় করা। হারাম খাদ্য ক্রয়ে ব্যয় করা। ইসলামের ক্ষতি সাধনের কাজে ব্যয় করা। অপচয় অপব্যয় করা ইত্যাদি।

জমা করা ও বিনিয়োগ করা অর্থের যাকাত দেয়া অপরিহার্য ফরয।

১০. শেষের কথা

শেষ কথায় পয়লা কথাটি স্মরণ করিয়ে দিতে চাই। সেটা হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ এবং পরকালের মুক্তি ও সাফল্য লাভের কথা। পার্থিব জীবনে আমি যতো অর্থ সম্পদই উপার্জন করি না কেন, যদি পরকালে জাহান্নাম থেকে মুক্তি না পাই, জান্নাত লাভ করতে না পারি, তবে তো আমার সবই ব্যর্থ।

পক্ষান্তরে আমি যদি আল্লাহর পসন্দনীয় পন্থায় পৃথিবীতে সম্পদশালী হই এবং এ সম্পদ উপার্জন ও ব্যয় বিনিয়োগ উভয় ক্ষেত্রেই যদি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের দেয়া বিধানের অনুসরণ করতে পারি, তবে পৃথিবীতে সম্পদশালী হবার সাথে সাথে আখিরাতেও দয়াময় আল্লাহ আমাকে সৌভাগ্যবান ও সাফল্যমণ্ডিত করবেন।

মূলত দুনিয়া ও আখিরাতের সার্বিক সাফল্যের চাবিকাঠি হলো দু'টি ঃ

১. জীবনের সকল কাজে আল্লাহকে ভয় করা এবং

২. কর্মকৌশল ও কর্ম দক্ষতা অর্জন করা।

রসূলে করীম (স) বলেছেন ঃ

১. সমস্ত জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞার চূড়া হলো আল্লাহর ভয়।"–(মিশকাত)

২. কর্মকৌশলের চাইতে বড় কোনো বুদ্ধিমত্তা নেই।"–(ইবনে হিব্বান)

আসুন, আমরা যে যে কাজ করি, দক্ষতার সাথে করি আর সকল কাজে সর্বশক্তিমান আল্লাহকে ভয় করি এবং তাঁর সাহায্য চাই।–(রচনাকাল ঃ ১৯৯৫ইং)

১০

আল কুরআনের আয়নায় শ্রেষ্ঠ জীবনের কাঙ্ক্ষিত মান

১. চাই শ্রেষ্ঠ জীবন

শ্রেষ্ঠ জীবন বলতে কি বুঝায় ? শ্রেষ্ঠ জীবনের পরিচয় কি ? কোন্ জীবনকে বলা হয় শ্রেষ্ঠ জীবন ? শ্রেষ্ঠ জীবনের বৈশিষ্ট্যই বা কি কি ?

আসলে শ্রেষ্ঠ জীবনের পরিচয় দিতে গিয়ে আমরা যেসব শব্দ ব্যবহার করি এবং যেসব বাক্যে তা প্রকাশ করার চেষ্টা করি, তাতে কিন্তু শ্রেষ্ঠ জীবনের পূর্ণতা প্রকাশ পায় না। যদি বলা হয়, শ্রেষ্ঠ জীবন মানে উন্নত জীবন, মহত জীবন, সুন্দর জীবন, পবিত্র জীবন, অনন্য জীবন, তবে এসব শব্দ দ্বারা কি শ্রেষ্ঠ জীবনের পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটে ?

সত্যি কথা হলো, শ্রেষ্ঠ জীবন মানে সেই জীবন, যে জীবনে জীবনদাতার সন্তুষ্টি ও শুভেচ্ছার প্রকাশ ও বিকাশ ঘটে। আর স্রষ্টার সন্তুষ্টি ও শুভেচ্ছার জীবন মানে, ব্যক্তির নিজের মধ্যে এমন সব কাংখিত গুণ-বৈশিষ্ট প্রতিপালন ও প্রস্ফুটিত করা, যেগুলো তার মানবীয় মর্যাদাকে মহিমা মণ্ডিত করবে। এটি হবে সেই কাংখিত জীবন, যে জীবনে এমন কোনো আবিলতা, অশুদ্ধতা, অশূচি ও বিচ্যুতি থাকবে না, যা তার উঁচু মানবীয় মর্যাদাকে নিচু করে দেবে।

যে জিনিসগুলো মানবীয় মর্যাদাকে উঁচু করে এবং নিচু করে, সেগুলো কি? মানুষ গবেষণা ও জরীপ করে সেগুলোর তালিকা প্রণয়ন করতে পারে। তবে দৃষ্টিভংগির তারতম্যের কারণে মানুষের তৈরি তালিকাতেও তারতম্য থেকে যেতে পারে। এটা স্বাভাবিক। তাইতো দেখা যায়, কোনো ব্যক্তি বা সমাজের দৃষ্টিতে একটি কাজ ঘৃণিত নিন্দিত। কিন্তু সে কাজটিই দৃষ্টিভংগির তারতম্যের কারণে অপর ব্যক্তি বা সমাজের দৃষ্টিতে নন্দিত কিংবা নিন্দনীয় নয়।

তাই যে জিনিসগুলো মানুষের মর্যাদাকে উঁচু ও নিচু করে সেগুলোর নিখাদ পরিচয় জানার নির্ভুল উপায় হলো মানুষের স্রষ্টা ও প্রতিপালক মহান আল্লাহর বাণী আল কুরআন। সেই সাথে রসূলের বাণী হাদীস ও তাঁর সীরাত বা জীবনাদর্শ।

এখানে আমরা প্রথমে আল কুরআনের এমন কিছু আয়াতের অনুবাদ পেশ করবো, যেগুলোতে মানুষ হিসেবে আমাদের উঁচুতম মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবার

জন্যে অর্জনীয় ও বর্জনীয় গুণ ও বৈশিষ্ট্যসমূহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এ সংক্রান্ত সবগুলো আয়াতই এখানে উল্লেখ করা সম্ভব নয়। তবে যে ক'টিই উল্লেখ করবো, সেগুলোই আপনার জীবনে এমন প্রদীপের কাজ দেবে, আপনি ইচ্ছে করলেই তার আলোতে মনুষ্যত্বের সেই উঁচু স্তরে উঠে যেতে পারেন।

অর্জনীয় ও বর্জনীয় দু' ধরনের গুণবৈশিষ্ট্যের কথাই আয়াতগুলোতে থাকবে। আপনি সেখান থেকে বেছে বেছে অর্জনীয়গুলো বরণ করার জন্যে অবিরাম প্রচেষ্টা চালাবেন আর বর্জনীয়গুলো আপনার জীবন থেকে বহিষ্কার করার জন্যে বদ্ধপরিকর হবেন। এটাই উন্নত জীবনের চূড়ায় উঠার পথ। তবে মনে রাখবেন, মানুষের স্বভাব প্রকৃতি হলো, নিচে নামাটা তার জন্যে সহজ আর উপরে উঠাটা কঠিন ও কষ্টসাধ্য। এই কষ্টসাধ্য কাজটি করারই দুর্জয় শপথ আপনাকে নিতে হবে।

২. কাংখিত মানে পৌছার পথ

১. আল্লাহর সাথে অপর কাউকেও ইলাহ্ বানিয়ো না। এমনটি করলে লাঞ্ছিত ও নিন্দিত হবে।–(সূরা ১৭ ঃ ২২)

২. তোমার প্রভু নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা কেবল তাঁর ছাড়া আর কারো দাসত্ব, আনুগত্য ও হুকুম পালন করো না।–(সূরা ১৭ ঃ ২৩)

৩. মা বাবার সাথে সুন্দরতম আচরণ করো। তাদের সাথে দয়ার্দ্র, কোমল ও বিনম্র হও।–(সূরা ১৭ ঃ ২৩)

৪. আত্মীয়-স্বজনকে তার অধিকার দাও।–(সূরা ১৭ ঃ ২৬)

৫. দরিদ্র এবং পথিকদের তাদের অধিকার প্রদান করো।–(সূরা ১৭ ঃ ২৬)

৬. বাজে ও বাহুল্য খরচ করো না। যারা বাজে খরচ করে তারা শয়তানের ভাই।–(সূরা ১৭ ঃ ২৬-২৭)

৭. অসামর্থের কারণে কাউকেও দান বা সাহায্য করতে না পারলে, তাকে কোমলভাবে জবাব দাও।–(সূরা ১৭ ঃ ২৮)

৮. তোমার হাত গলায় বেঁধে রেখো না (অর্থাৎ কৃপণতা করো না), আবার পূরোটা খুলে দিও না (অর্থাৎ সবকিছু দান করে ফেলো না।–(সূরা ১৭ ঃ ২৯)

৯. দারিদ্রের আশংকায় নিজেদের সন্তান হত্যা করো না।–(সূরা ১৭ ঃ ৩১)

১০. যেনা-ব্যভিচারের কাছেও যেয়ো না। ওটা জঘন্য খারাপ কাজ এবং একটা নোংরা পন্থা।–(সূরা ১৭ ঃ ৩১)

১১. আল্লাহর নিষেধ করা প্রাণকে বধ করো না। তবে বিচারে মৃত্যুদণ্ড যোগ্য অপরাধ প্রমাণিত হলে ভিন্ন কথা।-(সূরা ১৭ ঃ ৩৩)

১২. এতীমের অর্থসম্পদ অপহরণ করো না।-(সূরা ১৭ ঃ ৩৪)

১৩. অংগীকার পালন করো। অবশ্যি অংগীকার সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে।-(সূরা ১৭ ঃ ৩৪)

১৪. মেপে দেবার সময় পূর্ণ মাপ দাও আর ওজন করে দেবার সময় দাঁড়ি সুষম করো।-(সূরা ১৭ ঃ ৩৫)

১৫. যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই, সেটার পেছনে লেগে পড়ো না। কারণ চোখ, কান, অন্তর সবকিছুকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।-(সূরা ১৭ ঃ ৩৬)

১৬. দম্ভ ও অহংকারের সাথে চলাফেরা করো না।-(সূরা ১৭ ঃ ৩৭)

১৭. আমার দাসদের বলো, তারা যেনো এমন কথা বলে যা সুন্দরতম। -(সূরা ১৭ ঃ ৫৩)

একথাগুলো আল কুরআনের ১৭শ সূরা অর্থাৎ সূরা বনি ইসরাঈল থেকে উল্লেখ করা হলো। এখানে উল্লেখিত সতেরটি নির্দেশের মধ্যে কিছু হলো 'না' সূচক আর কিছু হলো 'হ্যাঁ' সূচক। যিনি শ্রেষ্ঠ জীবনের কাংখিত মানে পৌঁছতে চান, তাকে আল্লাহর নির্দেশগুলো পালন করতে হবে এবং আল্লাহর নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে পুরোপুরি বিরত থাকতে হবে।

৩. মু'মিনের শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে সিঁড়ি

১. আল্লাহ মু'মিনদের থেকে তাদের জানমাল কিনে নিয়েছেন। বিনিময়ে তাদের জান্নাত দান করবেন। (অর্থাৎ তারাই প্রকৃত মু'মিন, যারা জান্নাত পাবার জন্যে নিজেদের জীবন ও সম্পদ নিয়োজিত করে আল্লাহর পথে কাজ করে।-(সূরা ৯ ঃ ১১১)১

২. তারা আল্লাহর পথে লড়ে এবং মারে ও মরে।-(সূরা ৯ ঃ ১১১)

৩. তারা বারবার আল্লাহর দিকে ফিরে আসে, তাওবা করে। -(সূরা ৯ ঃ ১১২)

৪. তারা আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকে।-(সূরা ৯ ঃ ১১২)

৫. তারা আল্লাহর প্রশংসা ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকে। -(সূরা ৯ ঃ ১১২)

৬. তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে দৌড় ঝাঁপ করে।-(সূরা ৯ ঃ ১১২)

৭. তারা (অহর্নিশি) রুকূ ও সিজদাকারী।-(সূরা ৯ ঃ ১১২)

---

১. সূরা ৯ হলো সূরা আত তাওবা।

৮. তারা ভালো কাজের আদেশ দেয়।-(সূরা ৯ ঃ ১১২)

৯. তারা মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।-(সূরা ৯ ঃ ১১২)

১০. তারা আল্লাহর নির্ধারিত সীমা (আইন ও শরীয়া) সংরক্ষণ করে, লংঘন করে না।-(সূরা ৯ ঃ ১১২)

১১. হে ঈমানদার লোকেরা ! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো।
-(সূরা ৯ ঃ ১১৯)

১২. তোমরা সত্যবাদী ও সত্যপন্থীদের সাথি হও।-(সূরা ৯ ঃ ১১৯)

১৩. (কাংখিত মানে পৌছুতে ব্যর্থ হয় সেসব মানুষ) যেসব লোক ছোট আত্মার এবং সংকীর্ণমনা।-(সূরা ৭০ ঃ ১৯)২

১৪. তারাও ব্যর্থ যারা বিপদ এলে ঘাবড়ে যায়।-(সূরা ৭০ ঃ ২০)

১৫. তারাও ব্যর্থ, যারা স্বচ্ছলতার সময় কৃপণতা করে।-(সূরা ৭০ ঃ ২২)

১৬. তবে সফল লোক তারা, যারা রীতিমতো সালাত আদায় করে।
-(সূরা ৭০ ঃ ২২-২৩)

১৭. যাদের অর্থ সম্পদে ভিক্ষুক ও বঞ্চিতদের জন্য অংশ নির্ধারিত থাকে।-(সূরা ৭০ ঃ ২৪-২৫)

১৮. যারা বিচার ও প্রতিফল দিবসকে সত্য বলে মানে।
-(সূরা ৭০ ঃ ২৬)

১৯. যারা তাদের প্রভুর শাস্তির (Torment) ভয়ে ভীত কম্পিত থাকে।
-(সূরা ৭০ ঃ ২৭)

২০. যারা স্বামী-স্ত্রী ছাড়া অন্যদের কাছ থেকে নিজেদের যৌন জীবনকে হিফাযত ও সংরক্ষণ করে।-(সূরা ৭০ ঃ ২৯-৩০)

২১. যারা আমানত (বিশ্বস্ততা) রক্ষা করে।-(সূরা ৭০ ঃ ৩২)

২২. যারা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।-(সূরা ৭০ ঃ ৩২)

২৩. যারা সত্য সাক্ষ্যদানের ব্যাপারে অটল থাকে।-(সূরা ৭০ ঃ ৩৩)

২৪. এবং যারা নিজেদের সালাতের হিফাযত করে।-(সূরা ৭০ ঃ ৩৩)

এরা সম্মানের সাথে জান্নাতসমূহে অবস্থান করবে।-(সূরা ৭০ ঃ ৩৪)

২৫. সফল হলো সেইসব মু'মিন, যারা নিজেদের নামাযে নম্র ও বিনয়ী হয়। -(সূরা ২৩ ঃ ১-২)৩

২৬. যারা বাজে ও বাহুল্য কথা-কাজ থেকে দূরে থাকে।-(সূরা ২৩ ঃ ৩)

---

২. সূরা ৭০ হলো সূরা আল মায়ারিজ।

৩. সূরা ২৩ হলো সূরা আল মু'মিনুন।

২৭. যারা শুদ্ধতার পথ অবলম্বন করে।−(সূরা ২৩ ঃ ৪)

২৮. যারা স্বামী-স্ত্রী ছাড়া যৌন সংযোগ স্থাপন করে না।
−(সূরা ২৩ ঃ ৫৬)

২৯. যারা নিজেদের আমানত (বিশ্বস্ততা) রক্ষা করে।−(সূরা ২৩ ঃ ৮)

৩০. যারা নিজেদের অংগীকার রক্ষা করে।−(সূরা ২৩ ঃ ৮)

৩১. এবং যারা নিজেদের সালাতের হিফাযত করে।−এরা উত্তরাধিকারী হবে জান্নাতুল ফেরদাউসের।−(সূরা ২৩ ঃ ৯-১১)

৩২. কল্যাণ ও সাফল্য অর্জনকারী লোক তো তারা, যারা নিজেদের মনিব (আল্লাহর) ভয়ে ভীত কম্পিত থাকে।−(সূরা ২৩ ঃ ৫৭)

৩৩. যারা নিজেদের প্রভুর আয়াতের প্রতি ঈমান রাখে।−(সূরা ২৩ ঃ ৫৮)

৩৪. যারা নিজেদের প্রভুর সাথে শিরক করে না।−(সূরা ২৩ ঃ ৫৯)

৩৫. তারা দান ও অর্পণের সময় ভীত কম্পিত থাকে এই বলে যে, আমাকে আমার প্রভুর কাছে ফিরে যেতে হবে।−(সূরা ২৩ ঃ ৬০)

৩৬. এরা সেইসব লোক, যারা ভালো কাজে দৌড়ায় এবং তাতে সবার আগে থাকে।−(সূরা ২৩ ঃ ৬১)

৪. প্রভুর কাছের লোক যারা

১. যারা ঈমানের পথে সত্য ও কল্যাণের কাজে সবার আগে আগে থাকে, তারাই হবে আল্লাহর নিকটবর্তী লোক। তারা থাকবে পরম সুখের জান্নাতে।−(সূরা ৫৬ ঃ ১০-১২)[৪]

২. আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা ও মহাপ্রতিদান লাভ করবে তারা, যারা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণকারী পুরুষ ও নারী।−(সূরা ৩৩ ঃ ৩৫)[৫]

৩. আল্লাহর প্রতি প্রত্যয় অর্জনকারী পুরুষ ও নারী। (ঐ)

৪. আল্লাহর অনুগত, বাধ্যগত ও তাঁর প্রতি বিনয়ী পুরুষ ও নারী। (ঐ)

৫. সত্যবাদী পুরুষ ও নারী। (ঐ)

৬. ধৈর্য ও দৃঢ়তা অবলম্বনকারী পুরুষ ও নারী। (ঐ)

৭. আল্লাহর প্রতি ভীত ও বিনীত পুরুষ ও নারী। (ঐ)

৮. আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে দান করে, এমন পুরুষ ও নারী। (ঐ)

৯. সিয়াম পালনকারী পুরুষ ও নারী। (ঐ)

১০. নিজেদের যৌন জীবন হিফাযতকারী পুরুষ ও নারী। (ঐ)

১১. আল্লাহর স্মরণে সদা নিরত পুরুষ ও নারী। (ঐ)

---

৪. সূরা ৫৬ হলো সূরা ওয়াকিয়া।

৫. সূরা ৩৩ হলো সূরা আহযাব।

১২. মহোত্তম প্রতিদানের অধিকারী হলো তারা, যারা তাদের প্রভুর আহ্বানে সাড়া দেয়।–(সূরা ১৩ ঃ ১৮)৬

১৩. যারা আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করে।–(সূরা ১৩ ঃ ২০)

১৪. যারা কখনো অংগীকার ভংগ করে না।–(সূরা ১৩ ঃ ২০)

১৫. যারা আল্লাহর নির্দেশিত সম্পর্ক অক্ষুণ্ন রাখে।–(সূরা ১৩ ঃ ২১)

১৬. যারা তাদের প্রভুর ভয়ে ভীত থাকে।–(সূরা ১৩ ঃ ২১)

১৭. যারা কঠিন হিসাব দিতে হবে বলে কম্পিত থাকে।–(সূরা ১৩ ঃ ২১)

১৮. যারা তাদের প্রভুর সন্তুষ্টির পথে সবর অবলম্বন করে। –(সূরা ১৩ ঃ ২২)

১৯. যারা সালাত কায়েম করে।–(সূরা ১৩ ঃ ২২)

২০. যারা আমার দেয়া জীবিকা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে দান করে। –(সূরা ১৩ ঃ ২২) এবং

২১. যারা ভালো দিয়ে মন্দ দূর করে। এরাই হবে পরকালের চিরস্থায়ী প্রাসাদের মালিক।–(সূরা ১৩ ঃ ২২)

২২. দয়াময় রহমানের (সফল ও প্রিয়) দাস হলো তারা, যারা পৃথিবীতে বিনয়ী হয়ে চলাফেরা করে।–(সূরা ২৫ ঃ ৬৩)৭

২৩. যাদের সাথে মূর্খরা বিতর্ক করতে চাইলে বলে দেয় ঃ তোমাদের সালাম (অর্থাৎ যারা অভদ্র অশালীন কুতর্কে লিপ্ত হতে চায়, এরা তাদের সেই কুতর্কে জড়িয়ে পড়ে না)।–(সূরা ২৫ ঃ ৬৩)

২৪. তারা প্রভুর সামনে সিজদাবনত হয়ে এবং দাঁড়িয়ে থেকে রাত কাটিয়ে দেয়। –(সূরা ২৫ ঃ ৬৪)

২৫. তারা সবসময় দু'আ করে ঃ প্রভু ! জাহান্নামের সর্বনাশা আযাব থেকে আমাদের বাঁচাও।–(সূরা ২৫ ঃ ৬৫)

২৬. তারা ব্যয়ের ক্ষেত্রে সীমালংঘন করে না।–(সূরা ২৫ ঃ ৬৭)

২৭. তারা কার্পণ্যও করে না।–(সূরা ২৫ ঃ ৬৭)

২৮. তারা ব্যয়ের ক্ষেত্রে ভারসাম্যপূর্ণ নীতি অবলম্বন করে। –(সূরা ২৫ ঃ ৬৭)

২৯. তারা আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য মানে না।–(সূরা ২৫ ঃ ৬৮)

৩০. সংগত কারণ (অর্থাৎ যুদ্ধের ময়দান কিংবা বিচারে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হওয়া) ছাড়া তারা কোনো নিষিদ্ধ প্রাণ বধ করে না।–(সূরা ২৫ ঃ ৬৮)

---

৬. সূরা ১৩ হলো সূরা আর রাআদ।

৭. সূরা ২৫ হলো সূরা আল ফুরকান।

৩১. তারা যিনা-ব্যভিচারে লিপ্ত হয় না।-(২৫ ঃ ৬৮)

৩২. তারা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয় না।-(২৫ ঃ ৭২)

৩৩. তারা বাহুল্য জিনিসের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় ভদ্রলোকের মতো অতিক্রম করে যায়।-(২৫ ঃ ৭২)

৩৪. তাদের প্রভুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হলে তারা অন্ধ বধির হয়ে পড়ে থাকে না। (বরং তাঁর ভয়ে কেঁপে উঠে এবং তাঁর নির্দেশ পালনে ঝাঁপিয়ে পড়ে)।-(২৫ ঃ ৭৩)

৩৫. তারা দু'আ করে ঃ হে প্রভু ! আমার স্ত্রী/স্বামী এবং সন্তানদের আমার চক্ষুশীতলকারী বানাও আর তুমি দয়া করে আমাদের বানাও সৎকর্মশীলদের অগ্রগামী।-(২৫ ঃ ৭৪)

৩৬. ঐ ব্যক্তির পরিণাম কিছুতেই মুশরিকদের মতো হবে না, যে আল্লাহর বিনীত হুকুম পালনকারী,

৩৭. যে সিজদাবনত হয়ে এবং দাঁড়িয়ে রাত কাটায়,

৩৮. যে আখিরাতকে ভয় করে,

৩৯. আর তার প্রভুর রহমতের প্রত্যাশা করে।-(সূরা ৩৯ যুমার ঃ ৯)

৪০. (আখিরাতে) আল্লাহভীরু সৎকর্মশীলরা জান্নাত ও ঝর্ণাধারার মধ্যে অবস্থান করবে।-(সূরা ৫১ ঃ ১৫)৮

৪১. পৃথিবীর জীবনে তারা হয়ে থাকে সর্বোত্তম পূণ্যবান-পরোপকারী মানুষ।-(সূরা ৫১ ঃ ১৬)

৪২. রাতের বেলা তারা খুব কমই ঘুমাতো (অর্থাৎ তারা রাত্রে উঠে নামায পড়তো)।-(সূরা ৫১ ঃ ১৭)

৪৩. রাতের শেষ প্রহরে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতো।-(সূরা ৫১ ঃ ১৮)

৪৪. তাদের সম্পদে ভিক্ষুক ও বঞ্চিতদের অধিকার ছিলো।
-(সূরা ৫১ ঃ ১৯)

৪৫. পূণ্যবান লোকেরা (জান্নাতে) প্রবহমান ঝর্ণাধারা থেকে পাত্র ভরে কাফুর সংমিশ্রিত শরাব পান করবে। সেই ঝর্ণাধারাকে তারা যেদিকে ইচ্ছে প্রবাহিত করতে পারবে।-(সূরা ৭৬ ঃ ৫-৬)৯

৪৬. তারা আল্লাহর প্রিয় দাস।-(সূরা ৭৬ ঃ ৬)

৪৭. তারা মানত পূর্ণ করে (অর্থাৎ তারা কর্তব্য পূর্ণ করে এবং যাকিছু কর্তব্য বলে মেনে নেয়, তা সমাধা করে)।-(সূরা ৭৬ ঃ ৭)

---

৮. সূরা ৫১ হলো সূরা যারিয়াত।

৯. সূরা ৭৬ হলো সূরা আদ দাহার। এই সূরাটিকে সূরাতুল ইনসানও বলা হয়।

৪৮. পরকালের বিপদের ভয়ে তারা সবসময় ভীত থাকে। –(সূরা ৭৬ ঃ ৭)

৪৯. তারা আল্লাহর ভালোবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে দরিদ্র, এতীম ও বন্দীদের পানাহার করায়।–(সূরা৭৬ ঃ ৮-৯)

৫০. তারা বলে, আমরা (পরকালের) কঠিন শাস্তির দীর্ঘ বিপদের দিনকে ভয় করি। তাই আল্লাহ তাদেরকে সেদিনের বিপদ থেকে রক্ষা করবেন এবং পরম সুখ ও আনন্দ দান করবেন।–(সূরা৭৬ ঃ১০-১১)

৫১. সত্য-ন্যায়ের পথে ধৈর্য ও দৃঢ়তা অবলম্বন করার কারণে সেদিন তাদের পুরস্কার দেয়া হবে জান্নাত আর রেশমী পোশাক।–(সূরা৭৬ ঃ ১২)

৫২. সেদিন তাদের বলা হবে, তোমাদের পৃথিবীর জীবনের কর্মতৎপরতা সঠিক ও উত্তম বলে গৃহীত হয়েছে। সে কারণেই তোমাদের দেয়া হলো এসব পুরস্কার।–(সূরা ৭৬ ঃ ২২)

৫৩. আমি তোমার প্রতি এ কুরআন অবতীর্ণ করেছি, এর মধ্যে তোমার প্রভু যে বিধান দিয়েছেন, তা পালনে দৃঢ়তা অবলম্বন করো।–(সূরা ৭৬ ঃ ২৩-২৪)

৫৪. কোনো অপরাধী পাপিষ্ট, কিংবা আল্লাহর হুকুম অমান্যকারীর আনুগত্য করো না।–(সূরা ৭৬ ঃ ২৪)

৫৫. সকাল সন্ধ্যায় তোমার প্রভুর নাম স্মরণ করো, তাঁর বিষয়ে আলোচনা করো।–(সূরা ৭৬ ঃ ২৫)

৫৬. রাত্রে তাঁর সামনে সিজদায় অবনত হও।–(সূরা ৭৬ ঃ ২৬)

৫৭. দীর্ঘ রাত ধরে তাঁর তাসবীহ করো।–(সূরা ৭৬ ঃ ২৬)

৫৮. (ঈমানদার লোকেরা)! তোমরা তোমাদের প্রভুকে ডাকো কেঁদে কেঁদে এবং চুপে চুপে।–(সূরা ৭ ঃ ৫৫)[১০]

৫৯. হে আদম সন্তান ! মসজিদে যাবার সময় সুন্দর পরিধেয় গ্রহণ করো।–(সূরা ৭ ঃ ৩১)

৬০. তোমরা পানাহার করো, অপচয় করো না। আল্লাহ অপচয়কারীদের পসন্দ করেন না।–(সূরা ৭ ঃ ৩১)

৬১. বলো, আমার প্রভু নিষিদ্ধ করেছেন যাবতীয় অশ্লীল কাজ, তা গোপনে হোক কিংবা প্রকাশ্যে।–(সূরা ৭ ঃ ৩৩)

৬২. তিনি নিষিদ্ধ করেছেন সব ধরনের দুষ্কর্ম-পাপ কর্ম।(ঐ)

৬৩. তিনি নিষিদ্ধ করেছেন সত্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।–(সূরা ৭ ঃ ৩৩)

---

১০. সূরা ৭ হলো সূরা আল আরাফ।

৬৪. তিনি নিষিদ্ধ করেছেন কাউকেও তাঁর অংশীদার, সমকক্ষ ও প্রতিপক্ষ বানানোকে।-(সূরা ৭ ঃ ৩৩)

৬৫. যারা সততা ও শুদ্ধতার সাথে কাজ করবে, তাদের কোনো ভয়ও থাকবে না, দুশ্চিন্তাও থাকবে না।-(সূরা ৭ ঃ ৩৫)

৬৬. সুন্দর পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।-(সূরা ৭ ঃ ৫৬)

৬৭. ভয় আর আশা নিয়ে আল্লাহকে ডাকো। আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীলদের খুব নিকটে।-(সূরা ৭ ঃ ৫৬)

৬৮. আমি জাহান্নাম সৃষ্টি করেছি জিন ও মানবজাতির অনেকের জন্যে। এসব জাহান্নামী হবে তারা, যাদের অন্তর আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা (সত্য) উপলব্ধি করে না। তাদের চোখ আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা (সত্য ও ন্যায়) দেখতে পায় না। তাদের কান আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা (সত্য ও ন্যায় কথা) শুনতে পায় না। এরা পশু, বরং পশুর চাইতেও অধম।-(সূরা ৭ ঃ ১৭৯)

৬৯. ক্ষমা ও কোমলতার নীতি অবলম্বন করো।-(সূরা ৭ ঃ ১৯৯)

৭০. মানুষকে ভালো কাজে সম্পৃক্ত করো।-(সূরা ৭ ঃ ১৯৯)

৭১. অজ্ঞ-বোকা লোকদের সাথে জড়িয়ে পড়ো না।-(সূরা ৭ ঃ ১৯৯)

৭২. নিজেদের মধ্যে শয়তানের প্ররোচনা অনুভব করলে (আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম বলে) আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাও।-(সূরা ৭ ঃ ২০০)

৭৩. সত্যপন্থী আল্লাহভীরু লোকেরা শয়তানের প্ররোচনা অনুভব করার সাথে সাথে সতর্ক হয়ে উঠে, তারপর তারা নিজেদের সঠিক পথ ও করণীয় পরিষ্কার দেখতে পায়।-(সূরা ৭ ঃ ২০১)

৭৪. আর যারা শয়তানের ভাই-বন্ধু, শয়তান তাদের বাঁকা পথে হাঁকিয়ে নিয়ে যায় এবং তাদের বিভ্রান্ত করার ব্যাপারে সে কোনোই ত্রুটি করে না।-(সূরা ৭ ঃ ২০২)

৭৫. তোমার প্রভুকে স্মরণ করো সকাল সন্ধ্যায়, মনে মনে, কান্না বিজড়িত হয়ে, ভীত বিহ্বল চিত্তে এবং অনুচ্চ কণ্ঠে।-(সূরা ৭ ঃ ২০৫)

৭৬. তুমি গাফিল অচেতন লোকদের একজন হয়ো না।-(সূরা ৭ঃ ২০৫)

৭৭. তোমার প্রভুর নিকটবর্তীরা নিজেদের শ্রেষ্ঠত্বের অহংকারে তাঁর ইবাদত ও দাসত্ব থেকে বিরত হয় না, বরং প্রতিনিয়ত তাঁরই মহিমা ঘোষণা করে এবং তাঁর সামনে সিজদায় বিনত থাকে।-(সূরা ৭ ঃ ২০৬)

৫. প্রভুর প্রিয়তম দাস যারা

১. তারাই প্রভুর নির্দেশিত পথে আছে এবং সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে, যারা না দেখেও আল্লাহকে বিশ্বাস করে,

২. যারা সালাত কায়েম করে,

৩. যারা আমার দেয়া অর্থ সম্পদ (আমার সন্তুষ্টির পথে) ব্যয় করে।−(সূরা ২ ঃ ৩)১১

৪. যারা হে মুহাম্মদ ! তোমার প্রতি অবতীর্ণ (কিতাব ও জীবন বিধান) এর প্রতি ঈমান রাখে এবং তোমার পূর্বেকার নবীদের উপর অবতীর্ণ (কিতাবের) প্রতিও ঈমান রাখে।

৫. আর যারা পরকালের প্রতি একীন রাখে।−(সূরা ২ ঃ ৩-৫)

৬. সুসংবাদ দাও তাদের, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ ও পরিশুদ্ধির কাজ করেছে।−(সূরা ২ঃ ২৫)

৭. ক্ষতিগ্রস্ত ও ব্যর্থ লোক হলো তারা, যারা আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা ও অংগীকার ভেংগে ফেলে,

৮. আল্লাহ যেসব সম্পর্ক জুড়ে রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন (অর্থাৎ−যাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখতে বলেছেন), সেসব সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং

৯. পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করে।−(সূরা ২ ঃ ২৭)

১০. তোমরা শুধুমাত্র আমাকেই ভয় করো।−(সূরা ২ ঃ ৪০)

১১. পার্থিব স্বার্থে আমার আয়াত (হুকুম) অমান্য করো না।(সূরা২ ঃ ৪১)

১২. আমার পাকড়াওর ব্যাপারে সতর্ক হও।−(সূরা ২ ঃ ৪১)

১৩. সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশিয়ে ফেলো না এবং

১৪. জেনে বুঝে সত্য গোপন করো না।−(সূরা ২ ঃ ৪২)

১৫. সালাত কায়েম করো,

১৬. যাকাত দিয়ে দাও আর

১৭. যারা আমার সামনে মস্তক অবনত করে, তাদের সাথে অবনত হও।−(সূরা ২ ঃ ৪৩)

১৮. সবর ও সালাতের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা করো,

১৯. যারা আমার প্রতি বিনীত-অনুগত তাদের জন্যে সালাত কঠিন নয়, সহজ। অন্যদের জন্যে কঠিন।−(সূরা ২ ঃ ৪৫)

২০. তোমরা এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাসত্ব করো না,

২১. বাবা-মার সাথে পরম সুন্দর ব্যবহার করো, তাদের সর্বোত্তম সেবা যত্ন করো,

---

১১. সূরা ২ হলো সূরা আল বাকারা।

২২. আত্মীয়-স্বজনের সাথে ভালো ব্যবহার করো,

২৩. এতীমদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করো,

২৪. দরিদ্রদের সাথে উত্তম আচরণ করো এবং

২৫. সব মানুষের সাথে সুন্দর কথা বলো।-(সূরা ২ ঃ ৮৩)

২৬. যে নিজেকে আল্লাহর কাছে সঁপে দেয় এবং

২৭. অতীব নিষ্ঠাবান সৎকর্মশীল হয়, তার প্রভুর কাছে তার প্রতিদান রয়েছে। তার কোনো ভয় এবং দুশ্চিন্তার কারণ নেই।-(সূরা ২ ঃ ১১২)

২৮. তোমরা আমাকে স্মরণ করো, আমিও তোমাদের স্মরণ করবো (উত্তম প্রতিদান দেবো)।-(সূরা ২ঃ ১৫২)

২৯. তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও, অকৃতজ্ঞ হয়ো না।(সূরা ২ ঃ ১৫২)

৩০. হে মানুষ ! তোমরা পৃথিবীতে হালাল ও পবিত্র জিনিস খাও,

৩১. তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না।-(সূরা ২ ঃ ১৬৮)

৩২. হে বিশ্বাসীরা ! তোমরা আমার দেয়া পবিত্র জীবিকা থেকে খাও,

৩৩. আল্লাহর শোকর আদায় করো,

৩৪. কেবল আল্লাহরই আনুগত্য ও দাসত্ব করো।-(সূরা ২ ঃ ১৭২)

৩৫. আল্লাহ তোমাদের খাবার হিসেবে হারাম করেছেন মৃত প্রাণী,

৩৬. রক্ত,

৩৭. শুয়োরের গোশ্ত এবং

৩৮. সেসব প্রাণীর গোশ্ত যেগুলো আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে যবাই করা হয়েছে।-(সূরা ২ ঃ ১৭৩)

৩৯. আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য সৎকর্ম হলো, আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা,

৪০. পরকালের প্রতি ঈমান আনা,

৪১. ফেরেশতাদের প্রতি ঈমান আনা,

৪২. আল কিতাব (আল কুরআন)-এর প্রতি ঈমান আনা,

৪৩. নবীদের প্রতি ঈমান আনা। তাছাড়া

৪৪. আল্লাহর ভালোবাসায় অনুপ্রাণিত হয়ে আত্মীয়-স্বজনের জন্যে অর্থসম্পদ ব্যয় করা,

৪৫. এতীমদের জন্যে ব্যয় করা,

৪৬. অভাবী ও দরিদ্রদের জন্যে ব্যয় করা,

৪৭. পথিকদের জন্যে ব্যয় করা,

৪৮. ভিক্ষুকদের জন্যে ব্যয় করা,

৪৯. মানুষকে দাসত্ব থেকে মুক্তির জন্যে ব্যয় করা,

৫০. সালাত কায়েম করা,

৫১. যাকাত পরিশোধ করা,

৫২. অংগীকার করলে অংগীকার পূরণ করা এবং

৫৩. বিপদ-আপদ, অভাব অনটন ও সত্য মিথ্যার সংগ্রামে ধৈর্য ও দৃঢ়তা অবলম্বন করা।−(সূরা ২ ঃ ১৭৭)

৫৪. তোমরা আল্লাহর পথে সেইসব লোকদের বিরুদ্ধে লড়াই করো, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে আসে। তবে বাড়াবাড়ি করো না। কারণ আল্লাহ্ সীমালংঘনকারীদের পসন্দ করেন না।−(সূরা২ঃ ১৯০)

৫৫. তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করো,

৫৬. নিজেদের ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিয়ো না,

৫৭. মানুষের কল্যাণ ও উপকার করো, আল্লাহ্ অবশ্যি উপকারীদের ভালোবাসেন।−(সূরা ২ ঃ ১৯৫)

৫৮. যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির কাজে নিজেদের সমর্পণ করে দেয়, আল্লাহ্ তাঁর এমন দাসদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল দয়াপরবশ।−(সূরা ২ ঃ ২০৭)

৫৯. তোমরা ইসলামে পুরোপুরি প্রবেশ করো,

৬০. শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না, সে তো তোমাদের সুপরিচিত শত্রু।−(সূরা ২ ঃ ২০৮)

৬১. জেনে রাখো, আল্লাহ্ তোমাদের মনের খবরও জানেন, তাই তাঁর ব্যাপারে সতর্ক হও।−(সূরা ২ঃ ২৩৫)

৬২. তোমরা পরস্পরের ব্যাপারে দয়াশীল, উদার ও সহৃদয় হতে ভুলে যেয়ো না।−(সূরা ২ ঃ ২৩৭)

৬৩. যারা ঈমান আনে তাদের বন্ধু ও সাহায্যকারী হলেন আল্লাহ্। তিনি তাদের অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে আসেন।−(সূরা ২ ঃ ২৫৭)

৬৪. যাকে হিকমাহ্ (বুঝ, প্রজ্ঞা, অন্তরদৃষ্টি, বিজ্ঞতা) দেয়া হয়েছে, সে বিশাল কল্যাণের অধিকারী হয়েছে।−(সূরা ২ ঃ ২৬৯)

৬৫. আল্লাহ্ ব্যবসা-বাণিজ্যকে বৈধ করেছেন আর নিষিদ্ধ করেছেন সুদ।−(সূরা ২ ঃ ২৭৫)

৬৬. যেদিন তোমাদের আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে আনা হবে, সেদিনের বিপদ ও লাঞ্ছনা থেকে নিজেদের বাঁচাও।−(সূরা ২ ঃ ২৮১)

৬৭. তোমরা যখন পরস্পরের মধ্যে ঋণ লেনদেন করবে, তখন তা সাক্ষী রেখে লিখিত করো ------ ।-(সূরা ২ ঃ ২৮২)
৬৮. সাথি-সহকর্মীদের সাথে কোমল আচরণ করো,
৬৯. তাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করে দাও,
৭০. তাদের সাথে পরামর্শ করে কাজ করো,
৭১. আর যখন কোনো কাজের সিদ্ধান্ত নাও, তখন আল্লাহর উপর ভরসা করে তা করো ।-(সূরা ৩ ঃ ১৫৯)১২
৭২. হে বিশ্বাসীরা ! তোমরা সবর অবলম্বন করো,
৭৩. শত্রুদের বিরুদ্ধে দৃঢ়তা অবলম্বন করো,
৭৪. তাদের বিরুদ্ধে দুর্ভেদ্য ব্যূহ রচনা করো এবং
৭৫. আল্লাহকে ভয় করো। এটাই সাফল্য অর্জনের পথ।(সূরা ৩ ঃ ২০০)
৭৬. আল্লাহকে ভয় করো এবং সরল ও ন্যায় কথা বলো ।-(সূরা ৪ ঃ ৯)১৩
৭৭. স্ত্রীদের সাথে সদাচরণ করো ।-(সূরা ৪ ঃ ১৯)
৭৮. তোমরা একে অপরের অর্থ সম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ো না।
৭৯. এবং আত্মহত্যা করো না ।-(সূরা ৪ ঃ ২৯)
৮০. তোমরা আল্লাহর দাসত্ব করো,
৮১. তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করো না,
৮২. মহোত্তম আচরণ করো মা-বাবার সাথে,
৮৩. আত্মীয়দের সাথে,
৮৪. এতীমদের সাথে,
৮৫. অভাবী ও দরিদ্রদের সাথে,
৮৬. আত্মীয় প্রতিবেশীদের সাথে,
৮৭. অনাত্মীয় প্রতিবেশীদের সাথে,
৮৮. পাশের লোক ও সাথীদের সাথে,
৮৯. পথিকদের সাথে এবং
৯০. অধীনস্থদের সাথে ।-(সূরা ৪ ঃ ৩৬)
৯১. আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার প্রকৃত অধিকারীদের হাতে অর্পণ করতে এবং

১২. সূরা ৩ হলো সূরা আলে ইমরান।
১৩. সূরা ৪ হলো সূরা আন নিসা।

৯২. যখন বিচার করো সুবিচার করো।–(সূরা ৪ ঃ ৫৮)

৯৩. হে বিশ্বাসীরা ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য করো,

৯৪. তাঁর রসূলের আনুগত্য করো এবং

৯৫. তোমাদের কর্মের দায়িত্বশীলদের আনুগত্য করো।–(সূরা ৪ ঃ ৫৯)

৯৬. আল্লাহর পথে লড়াই করা সেইসব লোকদের কাজ, যারা আখিরাতের জন্যে দুনিয়ার জীবন বিকিয়ে দেয়।–(সূরা ৪ ঃ ৭৪)

৯৭. যে ব্যক্তি কোনো খারাপ কাজ করে ফেললো, কিংবা নিজের উপর যুলম করে ফেললো, অতপর অনুতপ্ত হয়ে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইলো, সে অবশ্যি আল্লাহকে ক্ষমাশীল দয়াময় পাবে।–(সূরা ৪ ঃ ১১০)

৯৮. হে ঈমানদার লোকেরা ! তোমরা মুমিনদের বাদ দিয়ে কাফিরদের বন্ধু ও সাহায্যকারী বানিয়ো না।–(সূরা ৪ ঃ ১৪৪)

৯৯. যারা ঈমান আনে এবং সৎ ও শুদ্ধ কাজ করে তারা এর প্রতিদান তো লাভ করবেই, সেই সাথে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদের আরো অনেক দান করবেন।–(সূরা ৪ ঃ ১৭৩)

১০০. যারা আল্লাহর ইবাদত-বন্দেগি ও দাসত্বকে লজ্জাকর মনে করে এবং অহংকার ও হঠকারিতায় নিমজ্জিত হয়, আল্লাহ তাদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন।–(সূরা ৪ ঃ ১৭৩)

১০১. মুনাফিক পুরুষ ও নারীরা পরস্পরের সহযোগী, তারা মানুষকে মন্দ কাজে সম্পৃক্ত করে,

১০২. তারা মানুষকে ভালো কাজ থেকে বিরত রাখে,

১০৩. তারা দান করা থেকে হাত গুটিয়ে রাখে,

১০৪. তারা আল্লাহকে ভুলে থেকেছে, তাই আল্লাহও তাদের উপেক্ষা করেছেন।–(সূরা ৯ ঃ ৬৭)[১৪]

১০৫. মুমিন পুরুষ ও মহিলারা পরস্পরের সাহায্যকারী বন্ধু,

১০৬. তারা মানুষকে ভালো কাজে সম্পৃক্ত করে,

১০৭. তারা মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে,

১০৮. তারা সালাত কায়েম করে,

১০৯. তারা যাকাত পরিশোধ করে দেয়,

১১০. তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনুগত হয়ে জীবন যাপন করে। অচিরেই আল্লাহ তাদের প্রতি করুণা বর্ষণ করবেন।–(সূরা ৯ ঃ ৭১)

---

১৪. সূরা ৯ হলো সূরা আত তাওবা।

১১১. যে সীমালংঘন করে খোদাদ্রোহী হয়েছে এবং

১১২. দুনিয়ার জীবনের প্রতি ঝুঁকে পড়েছে, জাহান্নামই হবে তার চিরস্থায়ী ঠিকানা।-(সূরা ৭৯ ঃ ৩৭-৩৯)১৫

১১৩. আর যে ব্যক্তি (মৃত্যুর পর) তার প্রভুর সামনে দাঁড়াতে হবে বলে ভীত ও সতর্ক ছিলো এবং

১১৪. মন্দ কামনা বাসনা থেকে নফসকে নিয়ন্ত্রণ করেছিলো, জান্নাতই হবে তার চিরস্থায়ী আবাস।-(সূরা ৭৯ ঃ ৪০-৪১)

১১৫. সাফল্য মণ্ডিত হলো ঐ ব্যক্তি, যে (মানসিক, নৈতিক ও চারিত্রিক) পরিশুদ্ধি অর্জন করেছে,

১১৬. তার প্রভু প্রতিপালকের নাম যিকর করেছে আর

১১৭. সালাত আদায় করেছে।১৬

১১৮. যে (আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে) দান করেছে,

১১৯. মন্দ কাজ থেকে আত্মরক্ষা করেছে এবং

১২০. কল্যাণকর কাজ করাকে সঠিক বলে মেনে নিয়েছে, তাকে আমি সহজ পথে চলার সুবিধা দেবো।-(সূরা ৯২ ঃ ৫-৭)১৭

১২১. যে কৃপণতা ও সংকীর্ণ মনের পরিচয় দিয়েছে,

১২২. বেপরোয়া হয়ে নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হয়েছে আর

১২৩. কল্যাণকর কাজ করতে অস্বীকার করেছে, তাকে আমি কঠিন পথে চলার সুবিধা দেবো।-(সূরা ৯২ ঃ ৮-১০)

১২৪. কালের শপথ ! অবশ্যি মানুষ ক্ষতি ও ধ্বংসের মধ্যে রয়েছে, তবে তারা নয়, যারা ঈমান আনে,

১২৫. যারা আমলে সালেহ করে,

১২৬. যারা পরস্পরকে ন্যায় ও সত্য কথা বলতে ও ন্যায় ও সত্যের পথে চলতে উপদেশ দেয় এবং

১২৭. যারা পরস্পরকে (সত্যের উপর) অটল হয়ে থাকার উপদেশ দেয়।-(সূরা ১০৩ আল আসর)

১২৮. অতএব, তোমার প্রভুর প্রশংসা ও শোকর আদায় করো এবং তাঁর তাসবীহ করো,

---

১৫. সূরা ৭৯ হলো সূরা আল নাযিআত।

১৬. সূরা ৮৭ আল আ'লা ঃ ১৪-১৫ আয়াত।

১৭. সূরা ৯২ হলো সূরা আল লাইল।

১২৯. আর তাঁর কাছে ক্ষমা চাও।−(সূরা ১১০ আন নাসর)

১৩০. যে ঈমান এনে সৎ ও শুদ্ধতার কাজ করবে, সে পুরুষ হোক কিংবা নারী হোক, তাকে আমি সুন্দর ও পবিত্র জীবন যাপন করাবো। −(সূরা ১৬ ঃ আন নাহল ৯৭)

১৩১. যারা ঈমান আনার পর ঈমানের সাথে যুলমের (শিরকের) সংমিশ্রণ ঘটায়নি, তারা নিরাপত্তা পাবে এবং তারাই সঠিক পথ প্রাপ্ত। −(সূরা ৬ আল আনআম ঃ ৮২)

১৩২. হে ঈমানদার লোকেরা ! তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য করো, তবে তিনিও তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের কদমকে মজবুত করে দেবেন।−(সূরা ৪৭ মুহাম্মদ ঃ ৭)

১৩৩. যারা ঈমান আনে এবং সৎ ও শুদ্ধ কাজ করে, দয়াময় রহমান মানুষের অন্তরে তাদের জন্যে মহব্বত ও ভালোবাসা সৃষ্টি করে দেন।−(সূরা ১৯ মরিয়ম ঃ ৯৬)

১৩৪. যারা ঈমান আনে আর আমলে সালেহ করে, বড়ই সৌভাগ্যবান তারা। তাদের জন্যে রয়েছে অতীব উত্তম ফিরে যাবার স্থান। −(সূরা ১৩ আর রাআদ ঃ ২৯)

১৩৫. যারা বলে ঃ আল্লাহই আমাদের রব−অতপর এ ঘোষণার উপর অটল অবিচল থাকে, তাদের কাছে ফেরেশতা এসে বলে ঃ তোমাদের কোনো ভয়ও নেই, চিন্তাও নেই।−(সূরা ৪১ হামীম আস সাজদা ঃ ৩০)

আল কুরআনের বিভিন্ন সূরা ও আয়াত থেকে আমরা এখানে কয়েকটি (পুনরুল্লেখসহ ২৫৫টি পয়েন্ট) উল্লেখ করলাম। আল কুরআন মানুষকে যে কাঙ্ক্ষিত মানে পৌছাতে চায়, এ পয়েন্টগুলোতে আপনি অবশ্যি তার একটি জীবন্ত ছবি পাবেন। এখানে অর্জনীয় ও বর্জনীয় দুই ধরনের গুণ বৈশিষ্ট্যেরই উল্লেখ আছে। তাছাড়া প্রত্যেকটি হ্যাঁ সূচক বা অর্জনীয় গুণের নেগেটিভ বা বর্জনীয় দিকটাও আমাদের সামনে রাখতে হবে। এই ২৫৫টি পয়েন্টকে আমরা অর্জনীয় ও বর্জনীয় শিরোনামে এভাবে সাজাতে পারি ঃ

অর্জনীয়/কাংখিত	বর্জনীয়/অনাকাংখিত
১. কেবল আল্লাহকে ইলাহ মানবো।	১. আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও ইলাহ মানবো না।
২. কেবল আল্লাহরই দাসত্ব করবো।	২. আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাসত্ব করবো না।

৩. মা বাবার সাথে ভালো ব্যবহার করবো।	৩. মা বাবার সাথে কখনো খারাপ ব্যবহার করবো না।
৪. আত্মীয়দের অধিকার প্রদান করবো।	৪. আত্মীয়দেরকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করবো না।
৫. আমার অর্থ সম্পদে দরিদ্রদের অধিকার আছে।	৫. আমার অর্থ সম্পদ থেকে দারিদ্রদের বঞ্চিত করবো না।
৬. আমানত রক্ষা করবো।	৬. কখনো খিয়ানত করবো না।
৭. নিয়মিত সালাত আদায় করবো।	৭. আমি কখনো সালাত ত্যাগ করবো না।
৮. সর্বদা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করবো।	৮. আমি কখনো প্রতিশ্রুতি ভংগ করবো না।
৯. আল্লাহকে সর্বাধিক ভালবাসবো।	৯. কাউকেও আল্লাহর চাইতে বেশী ভালো বাসবো না।
১০. সবসময় কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য কাজ করবো।	১০. আল্লাহকে অসন্তুষ্ট করে কাউকে সন্তুষ্ট করার কাজ করবো না।

এভাবে আপনার ডাইরি বা নোট খাতায় সবগুলো পয়েন্ট সাজিয়ে নিন। সেই সাথে এগুলো অর্জন আর ওগুলো বর্জনের সিদ্ধান্ত নিন। প্রতিটি পয়েন্টকে কাঙ্ক্ষিত মানে পৌঁছার সিড়ির এক একেকটি ধাপ মনে করুন। এবার সিঁড়ি বেয়ে উঠতে থাকুন। এমনভাবে পাথেয় সংগ্রহ করে এবং অটল সিদ্ধান্ত ও মজবুত প্রস্তুতি নিয়ে উপরে উঠুন, যাতে করে আপনি যতোটুকু উপরে উঠেন তার থেকে আপনাকে নিচে নামাবার শক্তি ও সাহস কোনো শয়তানের না থাকে।

আসুন এভাবে আমরা কাঙ্ক্ষিত মানে পৌছি এবং আমাদের প্রভু মহান আল্লাহর প্রিয় দাস হই।-(রচনাকাল ঃ মে ১৯৯৯ ইং)

১১

হাদীসে রসূলের আয়নায় শ্রেষ্ঠ জীবনের কাঙ্ক্ষিত মান

১. শ্রেষ্ঠ জীবনের মিনার

হাদীস হলো আল্লাহর প্রিয় রসূল বিশ্বনেতা হযরত মুহাম্মদ (স)-এর জীবন ছবি। হাদীসে তাঁর মহোত্তম বাণী, কর্ম ও জীবনাদর্শ প্রতিবিম্বিত হয়েছে। আল কুরআন আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে জীবন যাপনের গাইড বুক। মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (স) এ পথের জীবন্ত গাইড। আর হাদীস হলো এ গাইডের জীবন চিত্র, জীবন্ত ছবি। ব্যাপারটি এ রকম ঃ

ক. আল কুরআন (আল্লাহ্ প্রদত্ত গাইড বুক বা নির্দেশনামা)

খ. মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সা. (আল্লাহর মনোনীত গাইড বা পথপ্রদর্শক)

গ. হাদীস ও সুন্নাহ (পথ প্রদর্শকের জীবন চরিত, বাণী কর্মনীতি, কর্মপদ্ধতি ও কর্মলিপি বা জীবন ছবি)

মুহাম্মদ (স) আল্লাহর ইচ্ছা ও আল কুরআনের বাস্তব নমুনা। হাদীস সেই নমুনারই সোনালি রেকর্ড ও প্রতিচ্ছবি। কেউ কেউ কথাটা এভাবে বলেন, মুহাম্মদ (স)-এর জীবন কুরআনেরই ব্যাখ্যা। আর হাদীস হলো সেই ব্যাখ্যারই গ্রন্থ। আল কুরআনের মৌলিক নির্দেশসমূহের ছবি হাদীসে সমুজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে।

আল কুরআনের প্রতিটি নির্দেশিকা যেনো একেকটি সুরভিত ফুল। আর হাদীস হলো সেই ফুলেরই বিশ্লেষিত অঙ্গ-প্রত্যংগ, পাপড়ি, পরাগ, কেশর, বৃন্ত।

হাদীসে মানুষের যেসব অর্জনীয় ও বর্জনীয় গুণবৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ হয়েছে, সেগুলো যদিও বিমূর্ত বাণী, কিন্তু সেগুলো রসূল (স) এবং তাঁর সাথিদের বাস্তব জীবনে ছিলো একেবারেই মূর্ত। হাদীস সেই মূর্ত গুণাবলীর বিমূর্ত বর্ণনা হবার কারণে বিশ্বাসীদের মনে মূর্ত ছবিই চিত্রিত করে।

হাদীসে যখন পড়ি, রসূলুল্লাহ (স) সবসময় হাসিমুখে কথা বলতেন, সবার সাথে সুন্দর আচরণ করতেন, সাথিদের পরম ভালোবাসতেন, রোগীর সেবা করতেন, শত্রুকে ক্ষমা করে দিতেন, সবসময় আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকতেন, দীর্ঘ রাত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নামায পড়তেন, মানুষের কল্যাণের জন্যে পেরেশান

হতেন, কারো কষ্ট দেখলে ব্যথিত হতেন। তিনি কখনো কাউকে গালি দেননি, কারো সাথে খারাপ ব্যবহার করেননি। কারো প্রতি অবিচার করেননি, কখনো অসত্য কথা বলেননি। কাউকেও প্রতারণা করেননি, কখনো প্রার্থীকে খালি হাতে ফেরাননি। তিনি বলেছেন, তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, পরকালের পাথেয় সংগ্রহ করো, মানুষের সাথে ভালো ব্যবহার করো, দরিদ্রদের দান করো, বড়দের সম্মান করো, ছোটদের স্নেহ করো, স্ত্রীর সাথের সুন্দর ব্যবহার করো। মানুষকে কষ্ট দিয়ো না। কারো প্রতি যুলম করো না। বিশ্বাসঘাতকতা করো না, অশ্লীল কাজ করো না, অট্টহাসি হেসো না, লোভ লালসায় মত্ত হয়ো না, প্রতিশ্রুতি ভংগ করো না, মিথ্যা কথা বলো না। হ্যাঁ এসব কথা যখন আমরা হাদীসে পড়ি, তখন প্রিয় রসূলের জীবনে এগুলোর মূর্তরূপই যেনো আমরা দেখতে পাই।

শ্রেষ্ঠ জীবনের, আল্লাহর নির্দেশিত জীবনের অনন্য অনুপম নমুনা ছিলেন মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাই শ্রেষ্ঠ জীবনের কাংখিত মানে পৌছার জন্যে তাঁর অনুসরণ, অনুকরণ ও অনুবর্তন অনিবার্য। স্বয়ং আল্লাহই তাঁকে অনুসরণীয় ও অনুকরণীয় নমুনা ঘোষণা করেছেন। সুতরাং তিনি কেবল ঐতিহাসিকভাবে শ্রেষ্ঠ মানুষ হবার কারণেই অনুসরণীয় নন, বরং সেই সাথে তাঁর শ্রেষ্ঠ জীবনের মহোত্তম আদর্শ স্বয়ং আল্লাহ কর্তৃক স্বীকৃত ও অনুসরণের জন্যে নির্দেশিত হবার কারণেই তাঁকে অনুসরণ ও অনুকরণ করে আদর্শ জীবনের উচ্চাসনে উঠার প্রচেষ্টা চালাবার বিকল্প নেই।

একজন মুমিনকে শ্রেষ্ঠ জীবনের কাংখিত মানে পৌছুতে হলে আজীবন তাকে এজন্যে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তাকে সচেতন থাকতে হবে, জীবনের কোনো এক পর্যায়ে এসে যেনো তার প্রচেষ্টার মুষ্টি শিথিল হয়ে না পড়ে। তাকে প্রতিনিয়ত খেয়াল রাখতে হবে, তার প্রচেষ্টা নামক গাড়ির চাকা যেনো কোথাও গর্তে পড়ে আঁটকে না যায়, কিংবা তাতে জং ধরে নিশ্চল হয়ে না পড়ে।

একজন মুমিনকে শ্রেষ্ঠ জীবন গড়ার এবং জীবনের মনযিলে মাকসুদে পৌছুবার জন্যে অবশ্যি তার পূর্ণাংগ জীবনকে বিকশিত করতে হবে। জীবনের কোনো একটি দিক উজ্জ্বল আর অন্যান্য দিক অন্ধকারে নিমজ্জিত করে ইনসানে কামিল বা ঈমানের পথে শ্রেষ্ঠ জীবনের কাংখিত মানে পৌছা যায় না। এখানে প্রয়োজন জীবনের প্রতিটি দিকের যথাসাধ্য বিকাশ। এ বিকাশ ঘটতে হবে–

–ঈমান-আকীদার দিক থেকে।

–মহান আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ ও আত্মনিবেদনের দিক থেকে।

–চিন্তাচেতনা, ধ্যান-ধারণা ও দৃষ্টিভংগির অনাবিল শুদ্ধতা ও উদারতা অর্জনের দিক থেকে।

-ঈমান আকীদা ভিত্তিক দৃষ্টিভংগির আলোকে জীবন ও জগতের যে কোনো কিছু গ্রহণ ও বর্জনের ক্ষেত্রে যথার্থ যোগ্যতা অর্জনের দিক থেকে।

–সভ্যতা ভব্যতা, শিক্ষা সংস্কৃতি এবং শুচিতা অর্জনের দিক থেকে।

–উদ্ভাবনী ও বিশ্লেষণী ক্ষমতা অর্জনের দিক থেকে।

–জ্ঞান বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার শিখরে আরোহণের দিক থেকে।

–জ্ঞানের সাথে দক্ষতা ও বুদ্ধিমত্তার সমন্বয় সাধনের দিক থেকে।

–মহত ও মৌলিক মানবীয় গুণাবলী অর্জনের দিক থেকে।

–আত্মার সংকীর্ণতা থেকে মুক্তি এবং অসৎ ও নিন্দিত গুণাবলী থেকে দূরে অবস্থানের দিক থেকে।

–আত্মার উন্নতি ও নৈতিক পবিত্রতা অর্জনের দিক থেকে।

–মানবতার কল্যাণ সাধনে অগ্রগামিতা অর্জনের দিক থেকে।

–মানব সমাজকে সত্য, সুন্দর, শুদ্ধতা ও শান্তির সাথে সম্পৃক্ত করার কাজে দক্ষতা অর্জন করার ক্ষেত্রে।

–মানব সমাজকে যুলম অত্যাচার, অন্যায় অবিচার, পাপ পংকিলতা, অপরাধ অরাজকতা, উদ্ধতা ও উচ্ছৃংখলা থেকে বিরত রাখার কাজে দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে।

–সর্বোপরি মহান স্রষ্টা আল্লাহ প্রভুর সন্তুষ্টি এবং নিজের অনন্ত জীবনের সাফল্য অর্জনের ক্ষেত্রে।

এখানে আমরা কিছু হাদীস উল্লেখ করবো। এসব হাদীসে বিশ্বনবী (স) তাঁর অনুসারীদের জন্যে অর্জনীয় মানবিক ও নৈতিক চারিত্রিক গুণাবলীর কথা বলেছেন। নিজেকে উন্নত করে স্রষ্টার সান্নিধ্য লাভের উপযোগী গুণাবলী অর্জনের কথা বলেছেন। যাকিছু বর্জনীয় সেগুলোর কথা উল্লেখ করেছেন। কোনো কোনো হাদীসে স্বয়ং রসূলে করীমের শ্রেষ্ঠতম জীবনের মহোত্তম গুণাবলীর কথা উল্লেখ হয়েছে। এ হাদীসগুলোর আলোকে আমরা নিজেদের জন্যে মহোত্তম গুণাবলী নির্ণয় করবো। আবার যাকিছু নিন্দনীয় গুণাবলীর কথা উল্লেখ হয়েছে, সেগুলো চিহ্নিত করবো বর্জনের জন্যে, পরিত্যাগের জন্যে।

২. শ্রেষ্ঠ জীবনের ভিত

১. বলো ঃ আমি আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি–অতপর একথার উপর অটল অবিচল থাকো।–(সহীহ মুসলিম ঃ সুফিয়ান বিন আবদুল্লাহ)১

২. ঐ ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পেয়েছে যে সন্তুষ্টির সাথে–

১. বন্ধনীতে গ্রন্থসূত্র এবং হাদীসটি বর্ণনাকারীর নাম উল্লেখ করা হবে।

ক. আল্লাহকে রব (মালিক, প্রভু, পরিচালক ও অভিভাবক মেনে নিয়েছে)

খ. ইসলামকে জীবন যাপনের পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করেছে আর

গ. মুহাম্মদকে আল্লাহর রসূল হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে।-(সহীহ মুসলিম ঃ আব্বাস (রা)।)

৩. যার মধ্যে এ তিনটি জিনিস থাকবে, সে ঈমানের মজা লাভ করবে ঃ

ক. তার কাছে সবকিছুর চাইতে আল্লাহ ও তাঁর রসূল হবেন প্রিয়তর,

খ. সে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে অপরকে ভালোবাসে এবং

গ. আল্লাহ তাকে কুফরী থেকে মুক্তি দেয়ার পর সে পুণরায় কুফরীতে ফিরে যাওয়াকে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবার মতোই চরম অপসন্দ করে।-(সহীহ বুখারি ঃ আনাস (রা)।)

৪. ইসলামের (ঘর) নির্মিত হয়েছে পাঁচটির (ভিত, ভিম বা স্তম্ভের) উপর। সেগুলো হলো ঃ

ক. আল্লাহ ছাড়া কোনো 'ইলাহ' নেই বলে ঘোষণা দেয়া এবং মুহাম্মদকে আল্লাহর দাস ও রসূল বলে সাক্ষ্য দেয়া,

খ. সালাত কায়েম করা,

গ. যাকাত প্রদান করা,

ঘ. হজ্জ করা এবং

ঙ. রমযান মাসে রোযা রাখা।-(বুখারি ঃ আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রা)।)

৫. জিজ্ঞাসা করা হলো, সর্বোত্তম মুসলিম কে ? রসূল (স) জবাব দিলেনঃ সর্বোত্তম মুসলিম সে, যে তার কথা ও কাজের অনিষ্ট থেকে মানুষকে নিরাপদ রেখেছে।-(সহীহ মুসলিম ও ইবনে হিব্বান ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা)।

৬. তোমরা আমাকে প্রতিশ্রুতি দাও যে, তোমরা–

–আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকেই শরীক বানাবে না,

–চুরি করবে না,

–ব্যভিচার করবে না,

–সন্তান হত্যা করবে না,

–কাউকেও (মিথ্যা) অপবাদ দেবে না এবং

–ভালো কাজে অবাধ্য হবে না।-(বুখারি ঃ উবাদা বিন সামিত রা।)

৭. সর্বোত্তম সৎকাজ হলো আল্লাহর (সন্তুষ্টির) জন্যে বন্ধুতা ও শত্রুতা করা।-(আবু দাউদ ঃ আবু যর রা)

৮. যার মধ্যে বিশ্বস্ততা নেই, তার ঈমানও নেই। আর যার মধ্যে প্রতিশ্রুতির পরোয়া নেই তার ধর্মও নেই।–(বায়হাকী ঃ আনাস (রা)

৯. যখন তোমার ভালো কাজ তোমাকে আনন্দ দেবে, আর তোমার মন্দ কাজ তোমাকে পীড়া দেবে, তখনই হবে তুমি মুমিন।–(মুসনাদে আহমদ ঃ আবি উমামা রা)

১০. যে কাজ করতে গেলে তোমার বিবেকে বাধে, সেটা ত্যাগ করো (কারণ, সেটাই পাপ কাজ)। (মুসনাদে আহমদ ঃ আবু উমামা)

১১. যার মধ্যে চারটি স্বভাব থাকবে, সে পাকা মুনাফিক। আর যার মধ্যে চারটির একটিও থাকবে, সে একটি মুনাফেকীর মধ্যে লিপ্ত বলে গণ্য হবে– যতোক্ষণ না তা ত্যাগ করবে। সেই চারটি মুনাফেকী স্বভাব ওয়ালা ব্যক্তি হলো ঐ ব্যক্তি ঃ

ক. যার কাছে আমানত রাখা হলে খিয়ানত করে,

খ. যে কথা বলার সময় মিথ্যা বলে,

গ. যে ওয়াদা করলে তা ভংগ করে,

ঘ. যে বিবাদ বিতর্কের সময় সীমা লংঘন করে।–(বুখারি ও মুসলিম ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)

১২. তাদের প্রশ্নের জবাবে রসূলুল্লাহ (স) বললেন ঃ

–তোমরা আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করো না,

–চুরি করো না,

–ব্যভিচার করো না,

–আইনগত সিদ্ধতা ছাড়া কাউকেও হত্যা করো না,

–নিরপরাধকে মারার জন্যে ক্ষমতাবানের কাছে নিয়ে যেয়ো না,

–যাদু করো না,

–সুদ খেয়ো না

–কোনো সতী সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করো না এবং

–শত্রুর সাথে মোকাবেলার সময় পলায়ন করো না,–(তিরমিযি ঃ সফওয়ান বিন আসসাল)

১৩. মুয়ায বিন জাবাল (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন, হে মুয়ায !

–আল্লাহর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করো না যদি তোমাকে হত্যাও করা হয় কিংবা আগুনে পোড়ানোও হয়।

–বাবা-মার অবাধ্য হয়ো না।

–ইচ্ছাকৃত কোনো ফরয নামায ত্যাগ করো না।

–শরাব খেয়ো না।

–আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হয়ো না।

–যুদ্ধ থেকে পলায়ন করো না।

–মহামারী পীড়িত জনগণের নিকট থেকে পলায়ন করো না, তাদের মধ্যে অবস্থান করে তাদের সেবা ও চিকিৎসা করো।

–সাধ্যমতো নিজ পরিবার পরিজনের জন্যে ব্যয় করো,

–তাদের সুশিক্ষা দানের শাসন থেকে কখনো বিরত হয়ো না এবং

–আল্লাহর ব্যাপারে তাদের সচেতন ও সতর্ক করো।–(মুসনাদে ইমাম আহমদ ঃ মুয়াব বিন জাবাল (রা)

এই তেরটি হাদীসে আমরা চার প্রকার কাজের নির্দেশিকা পাই। এর দুই প্রকার হলো অবশ্য করণীয় আর বাকী দুই প্রকার হলো অবশ্য বর্জনীয়। অবশ্য করণীয় কাজ হলো ঃ

১. ঈমান আনা এবং ইসলামকে জীবন পদ্ধতি হিসেবে গ্রহণ করা।

২. ইসলামের স্তম্ভ স্বরূপ মৌলিক কাজসমূহ পালন করা।

আর অবশ্য বর্জনীয় কাজসমূহ হলো ঃ

১. মুনাফেকীর স্বভাবসমূহ বর্জন করা।

২. বড় বড় নিষিদ্ধ কাজ বা কবীরা গুনাহসমূহ বর্জন করা।

৩. পারস্পরিক অধিকার, সদাচার ও সুসম্পর্ক

নিজেকে সেরা মানুষ এবং প্রিয় ব্যক্তিত্ব ও প্রিয় নেতৃত্বে পরিণত করার জন্যে আপনাকে অবশ্যি অন্যদের অধিকারের ব্যাপারে সচেতন থাকতে হবে। মানুষের সাথে সুন্দর ব্যবহার করতে হবে। সকলের সাথে বজায় রাখতে হবে সুসম্পর্ক। প্রিয় নবী (স) বলেন ঃ

১. তোমাদের কারো যখন তার (মুসলিম) ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত হয়, তখন সে যেনো তাকে সালাম (অর্থাৎ আস্‌সালামু আলাইকুম) বলে।–(আবু দাউদ ঃ আবু হুরাইরা (রা)।

২. আল্লাহর অধিক নিকটে সে ব্যক্তি, যে প্রথমে সালাম দেয়।–(তিরমিযিঃ আবি উসামা (রা)

৩. একজন মুমিনের উপর আরেকজন মুমিনের ছয়টি অধিকার রয়েছে। সেগুলো হলো ঃ

–রোগ গ্রস্ত হলে সেবা-চিকিৎসা করবে।

–মৃত্যুবরণ করলে জানাযা ও দাফন কাপনের ব্যবস্থা করবে।

–ডাকলে বা দাওয়াত দিলে সাড়া দেবে।

–সাক্ষাত হলে সালাম দেবে।

–হাঁচি দিলে (ইরহামকাল্লাহ্–আল্লাহ্ আপনাকে রহম করুন) বলবে।

–সামনে পেছনে সবসময় তার কল্যাণ কামনা করবে।–(মিশকাতুল মাসাবীহ্ ঃ আবু হুরাইরা (রা)

৪. তোমাদের সালামের পূর্ণতা হলো মুসাফাহা করা।–(মুসনাদে আহমদঃ আবি উমামা (রা)

৫. আবু জাহলের পুত্র ইকরামা (রা) বলেন ঃ (মক্কা বিজয়ের পর আমি পলাতক অবস্থা থেকে) রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট উপস্থিত হলে তিনি আমাকে মারহাবা (স্বাগতম) বলে অভ্যর্থনা জানান।–(তিরমিযি ঃ ইকরামা (রা)

৬. উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) বলেন ঃ একবার নবী করীম (স)-এর কোলে একটি শিশু তুলে দেয়া হলে তিনি ওকে চুম্বন করেন।
–(মিশকাত ঃ আয়েশা রা।)

৭. কোনো মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসেকী আর তাকে হত্যা করা কুফরী।–(বুখারি ও মুসলিম ঃ আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রা)

৮. কোনো সত্যপন্থী ব্যক্তির অভিশাপ দানকারী হওয়া উচিত নয়।–(সহীহ মুসলিম ঃ আবু হুরাইরা রা)

৯. কিয়ামতের দিন সবচে' নিকৃষ্ট দেখতে পাবে ঐসব লোককে যারা দ্বিমুখী। যারা এদের কাছে আসে একমুখে আর ওদের কাছে যায় আরেক মুখে।–(বুখারি ও মুসলিম ঃ আবু হুরাইরা (রা)

১০. ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যে পরনিন্দা করে বেড়ায়।
–(বুখারি ও মুসলিম ঃ হুযাইফা (রা)

১১. যে মানুষের মাঝে সমঝোতা সৃষ্টি ও সুসম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা করে, সে মিথ্যাবাদী নয়। মূলত সে কল্যাণের কথাই বলে এবং কল্যাণের দিকেই নিয়ে যায়।–(বুখারি ও মুসলিম ঃ উম্মে কুলসুম রা)

১২. যখন অধিক প্রশংসাকারী লোক দেখবে, তখন তাদের মুখে মাটি নিক্ষেপ করো (অর্থাৎ বাধা দাও)।–(মুসলিমঃমিকদাদ বিন আসওয়াদ)

১৩. মুমিন ব্যক্তি কটাক্ষকারী, অভিশাপদানকারী, অশ্লীল ভাষী ও নির্লজ্জ হতে পারে না।–(তিরমিযি ঃ ইবনে মাসউদ রা)

১৪. আমার সাহাবীদের কেউ যেনো অপর কারো সম্পর্কে কোনো মন্দ কথা আমার কাছে না পৌছায়। কারণ, আমি তোমাদের সামনে এমন অবস্থায় উপস্থিত হতে চাই যে, সকলের ব্যাপারে আমার অন্তর সুন্দর-অনাবিল।–(আবু দাউদ ঃ ইবনে মাসউদ রা)

১৫. তোমার কোনো (মুসলিম) ভাইকে বিপদগ্রস্ত দেখে আনন্দ প্রকাশ করো না। এমনও হতে পারে যে, আল্লাহ তার প্রতি দয়া করবেন আর তোমাকে সেই পরীক্ষায় ফেলবেন।–(তিরমিযি ঃ ওয়াছেল র)

১৬. তোমরা নিজেদের ব্যাপারে ছয়টি জিনিসের জামিন হও, আমি তোমাদের জান্নাতের জামিন হবো। সেগুলো হলো ঃ

–যখন কথা বলবে সত্য বলবে।

–যখন ওয়াদা করবে, তা পূর্ণ করবে।

–আমানত রাখা হলে তা হিফাযত করবে ও আদায় করবে।

–যৌনাঙ্গের পবিত্রতা রক্ষা করবে।

–দৃষ্টি নত রাখবে।

–নিজের হাতকে (অন্যায় অবিচার থেকে) নিয়ন্ত্রণে রাখবে।–(মুসনাদে আহমদ ঃ উবাদা বিন সামিত রা)

১৭. নিকৃষ্ট লোক তারা–

–যারা একজনের দোষ আরেকজনের কাছে বলে বেড়ায়।

–যারা প্রিয়জনদের মাঝে বিবেদ সৃষ্টি করে দেয়।

–যারা পবিত্র লোকদের চরিত্রে অপবাদ আরোপ করে।–(বায়হাকি ঃ আসমা বিনতে ইয়াযীদ রা)

১৮. গীবত যিনার চাইতেও গুরুতর।–(বায়হাকী ঃ জাবির রা)

১৯. আল্লাহ তা'আলা আমার প্রতি অহী করেছেন ঃ

–তোমরা পরস্পরের প্রতি বিনয়ী হও।

–তোমরা পরস্পরের সাথে গর্ব অহংকার করো না।

–তোমরা একে অপরের প্রতি বাড়াবাড়ি করো না।–(সহীহ মুসলিম ঃ ইয়ায বিন হিমার মুজাশেয়ী)

২০. আসমা বিনতে আবু বকর (রা) বলেন, হুদাইবিয়ার সন্ধি হবার পর আমার মা আমার কাছে আসেন। তিনি মুশরিক ছিলেন এবং ইসলামের প্রতি

বীতশ্রদ্ধ ছিলেন। এমতাবস্থায় আমি তার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখবো কিনা –সে কথা রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ হ্যাঁ, তাঁর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখো এবং সদ্ব্যবহার করো।–(বুখারি ও মুসলিম ঃ আসমা রা)

২১. আমর ইবনুল আস (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, অমুক লোকেরা আমার বন্ধু নয়, আমার বন্ধু হলেন আল্লাহ এবং পূণ্যবান মুমিনেরা। তবে ঐলোকগুলোর সাথে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক আছে। আমি সদ্ব্যবহার দ্বারা সে সম্পর্ক তাজা রাখি।–(বুখারি ও মুসলিম)

২২. পিতার অবর্তমানে পিতার বন্ধুদের সাথে উত্তম আচরণ করা শ্রেষ্ঠ পূণ্য কাজসমূহের একটি।–(সহীহ্ মুসলিম ঃ ইবনে উমর রা)

২৩. উপকার করে খোঁটাদানকারী, পিতামাতার অবাধ্য এবং মদ্যপ জান্নাতে প্রবেশ করবে না।–(মিশকাত)

২৪. যে মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহ্ তার প্রতি দয়া করেন না।–(বুখারি ও মুসলিম ঃ জারীর বিন আবদুল্লাহ রা)

২৫. পারস্পরিক দয়া-সহানুভূতি, বন্ধুত্ব, ভালোবাসা ও মমতা-কোমলতার দিক থেকে মুমিনদের উপমা হলো, একটি দেহ। তুমি দেখবে, দেহের একটি অংগ বেদনাগ্রস্ত হলে গোটা দেহই ব্যথিত ও জ্বরাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।–(বুখারি ও মুসলিম ঃ নুমান ইবনে বশীর রা)

২৬. তোমার ভাইকে সাহায্য করো সে যালিম হোক কিংবা মযলুম। একথা শুনে এক ব্যক্তি উঠে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল ! মযলুম হলে তো আমার (দীনি) ভাইকে অবশ্যি সাহায্য করবো। কিন্তু সে যালিম হলে কিভাবে তাকে সাহায্য করবো ? তিনি বললেন, তাকে যুলম করা থেকে বিরত রাখো। এটাই তাকে সাহায্য করা।–(বুখারি ও মুসলিম ঃ আনাস (রা)

২৭. মুসলমান মুসলমানের ভাই ১. সে তার প্রতি যুলম করবে না, ২. তাকে ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেবে না, ৩. যে ব্যক্তি প্রয়োজনের সময় তার ভাইয়ের সাহায্য করবে, তার প্রয়োজনের সময় আল্লাহ তাকে সাহায্য করবেন, ৪. যে তার মুসলমান ভাইয়ের একটি কষ্ট লাঘব করবে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার একটি কষ্ট লাঘব করবেন, ৫. যে তার মুসলিম ভাইয়ের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখে, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার ভুল-ত্রুটি গোপন রাখবেন।–(বুখারি ও মুসলিম ঃ ইবনে উমর রা)

২৮. মুসলমান মুসলমানের ভাই ১. সে তার ভাইয়ের প্রতি অবিচার করে না, ২. ভাইয়ের মানহানি করে না এবং ৩. তাকে খাটোও করে না, ৪. জেনে রাখো, তাকওয়া অন্তরের জিনিস, ৫. কোনো ব্যক্তির মন্দ লোক হবার জন্যে এতোটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইকে হেয় করে, ৬. একজন মুসলমানের জন্যে তার ভাইয়ের জান, মাল ও ইজ্জত নষ্ট করা হারাম।–(সহীহ মুসলিম ঃ আবু হুরাইরা রা)

২৯. তিন ধরনের (মুমিন) ব্যক্তি জান্নাতে যাবে। তারা হলো ঃ

–ন্যায়পরায়ণ, দানশীল ও সুযোগ্য ক্ষমতাশালী।

–আত্মীয়স্বজন ও মুসলমানদের প্রতি ভালোবাসা পোষণকারী ব্যক্তি।

–বহুসংখ্যক পোষ্য পরিজন থাকা সত্ত্বেও আদর্শবান মুখাপেক্ষাহীন ব্যক্তি।

পাঁচ প্রকারের লোক জাহান্নামে যাবে। তারা হলো ঃ

–যে জ্ঞান-বুদ্ধি ও বিশ্বাসের দুর্বলতার কারণে নিজেকে অন্যায় অপকর্ম থেকে বাঁচাতে পারে না।

–সেই অবিশ্বস্ত ব্যক্তি, যার লোভ-লালসা থেকে কোনো গোপনীয় জিনিসও রক্ষা পায় না।

–যে দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা ধোকাবাজি ও প্রতারণার ফিকিরে থাকে।

–কৃপণ ও মিথ্যাবাদী।

–অশ্লীলতা প্রসারকারী।–(সহীহ মুসলিম ঃ ইয়ায বিন হিমার)

৩০. কোনো ব্যক্তি মুমিন হতে পারবে না, যতোক্ষণ না সে নিজের জন্যে যা পসন্দ করে, তার (দীনি) ভাইয়ের জন্যেও তাই পসন্দ করবে।–(বুখারি ও মুসলিম ঃ আনাস রা)

৩১. যখন তোমরা তিনজন একত্রে থাকবে, তখন একজনকে বাদ দিয়ে দু'জন চুপে চুপে কোনো কথা বলো না। কারণ এতে অপরজন চিন্তাগ্রস্ত হবে।–(বুখারী ও মুসলিম ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা)

৩২. সে ব্যক্তি আমাদের লোক নয়, যে ছোটদের স্নেহ করে না, বড়দের সম্মান করে না, মানুষকে ভালো কাজে সম্পৃক্ত করে না এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে না।–(তিরমিযি ঃ ইবনে আব্বাস রা)

৩৩. বাবা মা তাদের সন্তানকে উত্তম আদব কায়দা শিক্ষাদানের চাইতে ভালো কিছু দান করতে পারে না।–(তিরমিযি ঃ আইয়ুব বিন মূসা)

৩৪. যে ব্যক্তি কোনো মুসলমানের দোষ জেনেও তা প্রচার না করে গোপন রাখলো, সে যেনো জীবন্ত প্রোথিত একটি কন্যা সন্তানকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করলো।–(মুসনাদে আহমদ ঃ উকবা ইবনে আমের রা)

৩৫. যে ব্যক্তি তার কোনো (মুসলিম) ভাইয়ের অনুপস্থিতিতে তার মাংস খাওয়া (গীবত করা) থেকে অন্যকে প্রতিহত করলো, তাকে দোযখের আগুন থেকে রক্ষা করা আল্লাহর দায়িত্ব হয়ে পড়লো।-(বায়হাকী ঃ আসমা বিনতে ইয়াযীদ রা)

৪. আকর্ষণীয় চমৎকার ব্যক্তিত্ব অর্জন

জনগণের প্রিয় নেতা হবার জন্যে চাই চমৎকার আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব। এ রকম ব্যক্তিত্ব অর্জনের জন্যে সর্বকালের শ্রেষ্ঠতম নেতা মুহাম্মদ (সা)-এর বাণী থেকে নির্দেশিকা গ্রহণ করুন ঃ

১. আমি রসূল (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ আমাকে আদেশ দেয়া হয়েছে, আমি যেনো আমার বক্তব্য সংক্ষেপ করি, দীর্ঘ না করি। কেননা সংক্ষিপ্ত বক্তব্যই উত্তম।-(আবু দাউদ ঃ আমর ইবনুল আস রা)

২. লজ্জাশীলতা এবং কম কথা বলা ঈমানের দু'টি শাখা।-(তিরমিযি ঃ আবি উমামা (রা)

৩. তোমাদের মাঝে যারা সুন্দরতম চরিত্রের অধিকারী, কিয়ামতের দিন তারাই হবে আমার প্রিয়তম ও নিকটতম।-(তিরমিযি ঃ জাবির রা)

৪. কিয়ামতের দিন আমার নিকট সর্বাধিক ঘৃণিত ও আমার থেকে অধিকতর দূরে অবস্থানকারী হবে তোমাদের মধ্যকার সেইসব লোক, যারা মন্দ চরিত্রের অধিকারী, যারা কথার খই ফোটায়, যারা চোয়াল বাঁকিয়ে বিদ্রূপাত্মক কথা বলে, যারা দম্ভপূর্ণ কথা বলে।-(বায়হাকী ঃ আবি সালাবা খুশানী)

৫. অধিকহারে মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে আল্লাহ ভীতি ও উত্তম চরিত্র।-(তিরমিযি ঃ আবু হুরাইরা)

৬. অধিকহারে মানুষকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবে যবান ও যৌনাঙ্গ। -(তিরমিযি ঃ আবু হুরাইরা)

৭. যে কম কথা বললো, সে রক্ষা পেলো।-(মুসনাদে আহমদ ঃ আবদুল্লাহ ইবনে আমর রা)

৮. ইসলামের সৌন্দর্য হলো অর্থহীন কথাবার্তা পরিত্যাগ করা।-(মুআত্তাঃ আলী ইবনে হুসাইন রা)

৯. নিলর্জ্জলতা কলুষিত করে, আর লজ্জাশীলতা সৌন্দর্যমণ্ডিত করে। -(তিরমিযি ঃ আনাস রা)

১০. দয়াবানদের প্রতি আল্লাহ দয়া করেন।-(আবু দাউদ ঃ ইবনে আমর)

১১. মানুষের সাথে তাদের মর্যাদা রক্ষা করে আচরণ করো-(আবু দাউদঃ আয়েশা রা)

১২. মুমিন হলো ভালোবাসার কেন্দ্রস্থল। ঐ ব্যক্তির মধ্যে কোনো কল্যাণ নেই, যে অন্যদের ভালোবাসে না এবং অন্যদের ভালোবাসা পায়ও না।

১৩. সমস্ত সৃষ্টি আল্লাহর পরিবার। সুতরাং সৃষ্টির মাঝে আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা প্রিয় সে, যে আল্লাহর পরিবারের সাথে উত্তম আচরণ করে। -(বায়হাকী ঃ আনাস রা)

১৪. কোনো ব্যক্তি যখন তার কোনো ভাইকে ভালোবাসবে, তখন এ ভালোবাসার খবর যেনো সে তাকে জানিয়ে দেয়।-(তিরমিযি ঃ মেকদাম বিন মাদী করব)

১৫. কোনো ব্যক্তি যখন অপর কারো সাথে বন্ধুত্ব-ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করবে, তখন সে যেনো তার নাম, পিতার নাম এবং অন্যান্য পরিচয় জিজ্ঞেস করে। কারণ এতে তাদের বন্ধুতা গভীরতর হবে।-(তিরমিযি ঃ ইয়াযীদ বিন নাআমা)

১৬. যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্যে অপর ব্যক্তিকে ভালোবাসলো, সে যেনো তার মহান প্রভুকে সম্মান দান করলো।-(আহমদ ঃ আবু উমামা)

১৭. তোমাদের মাঝে উত্তম লোক তারা, যাদের দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়।-(ইবনে মাজাহ ঃ আসমা বিনতে ইয়াযীদ)

১৮. রসূলুল্লাহ (স) আমাকে একথাগুলোর উপর আমল করতে এবং অন্যদের শিক্ষা দিতে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

-আল্লাহকে ভয় করো, সবচে' বড় আবেদ হতে পারবে।

-আল্লাহ তোমাকে যা দিয়েছেন তার উপর সন্তুষ্ট থাকো, সর্বাধিক প্রাচুর্যবান হতে পারবে।

-প্রতিবেশীর সাথে সুন্দর ব্যবহার করো, মুমিন হতে পারবে,

-নিজের জন্যে যা পসন্দ করবে, অন্যদের জন্যেও তাই পসন্দ করো, মুসলিম হতে পারবে।

-অধিক হাসাহাসি করো না, কারণ এতে মানুষের অন্তর মরে যায়।

(যাদে রাহ ঃ আবু হুরাইরা রা)

১৯. আমার প্রভু আমাকে নয়টি কাজের নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

-গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহকে ভয় করতে।

-সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি উভয় অবস্থাতে ন্যায় কথা বলতে।

–দারিদ্র এবং প্রাচুর্য উভয় অবস্থাতে মধ্যপন্থা অবলম্বন করতে।

–যে আমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে তার সাথে সম্পর্ক জুড়তে।

–যে আমাকে বঞ্চিত করে, তাকে প্রদান করতে।

–যে আমার প্রতি অবিচার করে তাকে ক্ষমা করে দিতে।

–আমার নীরবতা যেনো চিন্তা গবেষণায় কাটে।

–আমার কথাবার্তা যেনো হয় উপদেশমূলক।

–আমার প্রতিটি দৃষ্টি যেনো হয় শিক্ষাগ্রহণকারী।

এছাড়া আমার প্রভু আমাকে আরো দু'টি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছেন। সেগুলো হলো ঃ

–আমি যেনো ভালো কাজের আদেশ-নির্দেশ দান করি এবং

–মন্দ কাজ থেকে যেনো বারণ করি।–(বুখারি ঃ আবু হুরাইরা রা)

২০. আমি কি তোমাদের বলবো কোন্ জিনিস মানুষের মর্যাদা বাড়ায় ? সাহাবাগণ বললেন, অবশ্যি বলুন হে আল্লাহর রসূল ! তখন তিনি বললেন ঃ

–যে তোমার সাথে মূর্খের মতো ব্যবহার করবে, তুমি তার সাথে বিজ্ঞের মতো আচরণ করো।

–যে তোমার প্রতি অবিচার করবে, তুমি তাকে ক্ষমা করে দেবে।

–যে তোমাকে বঞ্চিত করবে, তুমি তাকে প্রদান করবে।

–যে তোমার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করবে, তুমি তার সাথে সম্পর্ক জুড়বে। (তারগীব ও তারহীব ঃ উবাদা বিন সামিত রা)

২১. হে মুয়ায ! আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, তুমি সবসময় ঃ

–আল্লাহকে ভয় করবে।

–সত্য কথা বলবে।

–প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করবে।

–আমানত আদায় করবে।

–খিয়ানত করবে না।

–এতীমের প্রতি দয়া করবে।

–প্রতিবেশীর অধিকার রক্ষা করবে।

–রাগ দমন করবে।

–কোমল-নম্র ভাষায় কথা বলবে।

–সালাম বিনিময় করবে।

–ইসলামী নেতৃত্বের অনুগত থাকবে।–(তারগীব ও তারহীব ঃ মুয়ায বিন জাবাল (রা)

২২. তোমাদের মাঝে আমার সবচে' প্রিয় হলো সে ব্যক্তি ঃ

–যে সর্বোত্তম নৈতিক চরিত্রের অধিকারী।

–যে নম্র আচরণকারী,

–যে মানুষকে ভালোবাসে এবং

–মানুষও যাকে ভালোবাসে।

আর তোমাদের মাঝে আমার কাছে সবচে' ঘৃণিত ব্যক্তি সে ঃ

–যে একজনের দোষ আরেকজনের কাছে বলে বেড়ায়,

–যে মানুষের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করে এবং

–যে নিষ্পাপ লোকদের দুর্ণাম রটনা করে।–(তারগীব ও তারহীব ঃ আবু হুরাইরা রা)

২৩. দাউদ আলাইহিস সালাম একবার তাঁর প্রভুকে সম্বোধন করে বলেছিলেন, আমার প্রভু ! তোমার বান্দাদের মাঝে কোন্ বান্দা তোমার সবচেয়ে প্রিয়–যাকে তোমার সন্তুষ্টির জন্যে আমিও ভালোবাসতে পারি ?

তার প্রভু বললেন, হে দাউদ ! মানুষের মাঝে আমার সবচেয়ে প্রিয় বান্দা হলো সে–

–যার অন্তর আল্লাহ্‌ভীতিতে পরিপূর্ণ।

–যার হাত মানুষের অনিষ্ট করা থেকে পবিত্র।

–যে পশ্চাতে মানুষের নিন্দা করে বেড়ায় না।

–সে এতোটা দৃঢ়তা ও সহনশীলতার অধিকারী যে, পাহাড় টলে তো সে টলে না।

–সে আমাকে ভালোবাসে।

–সে তাকেও ভালোবাসে, যে আমাকে ভালোবাসে।

–তাছাড়া সে মানুষের অন্তরে আমার প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টির প্রয়াস চালায়।

দাউদ বললেন, আমার প্রভু ! তুমি তো জানো, আমি তোমাকে ভালোবাসি এবং তাকেও ভালোবাসি, যে তোমাকে ভালোবাসে। কিন্তু আমি কিভাবে তোমার বান্দাদের অন্তরে তোমার ভালোবাসা সৃষ্টি করবো ? জবাবে তাঁর প্রভু বললেন ঃ

–তুমি তাদেরকে আমার নিদর্শনসমূহ, আমার দেয়া বিপদ-পরীক্ষা এবং আমার নি'আমতসমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দাও।

হে দাউদ ! আমার বান্দাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মযলুমের সাহায্য করবে, কিংবা যুলমের সময় মযলুমের পাশে দাঁড়াবে, আমি সেদিন তার কদমকে মজবুত রাখবো, যেদিন সমস্ত পা পিছলে পড়বে।-(বায়হাকী ঃ ইবনে আব্বাস রা)

২৪. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, মহান আল্লাহ বলেন ঃ

-যে আমার বন্ধুর (অলীর) সাথে শত্রুতা করে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি।

-আমার সবচেয়ে প্রিয় হলো, আমার বান্দা আমার ফরয করা বিধানসমূহ পালনের মাধ্যমে আমার নৈকট্য লাভের চেষ্টা করবে।

-আর সে যখন আমার নৈকট্য লাভের জন্যে নফলও আদায় করতে থাকবে, তখন আমিও তাকে ভালোবাসতে থাকবো।

আমি যখন কাউকেও ভালোবাসি তখন ঃ

-আমি তার শ্রবনেন্দ্রীয় হয়ে যাই, যা দিয়ে সে শুনে।

-আমি তার দৃষ্টিশক্তি হয়ে যাই, যা দিয়ে সে দেখে।

-আমি তার হাত হয়ে যাই, যা দিয়ে সে স্পর্শ করে।

-আমি তার পা হয়ে যাই, যা দিয়ে সে হাঁটে।

-সে আমার কাছে কিছু চাইলে আমি অবশ্যি তাকে দান করি।

-সে আশ্রয় চাইলে আমি তাকে আশ্রয় প্রদান করি।

-আমি কোনো কাজ করতে চাইলে নির্দ্বিধায় করে ফেলি, কিন্তু আমার মুমিন দাসের জীবন সম্পর্কে কিছু করার ক্ষেত্রে আমার মধ্যে উদ্বেগ উৎকণ্ঠা থাকে।-(সহীহ বুখারি ঃ আবু হুরাইরা রা)

২৫. আল্লাহ তাআলা যখন তাঁর কোনো বান্দাকে মহববত করতে শুরু করেন, তখন জিব্রীলকে ডেকে বলেন ঃ হে জিব্রীল ! আমি অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসি, তুমিও তাকে ভালোবাসো। তখন জিব্রীলও তাকে ভালোবাসতে শুরু করে এবং আকাশবাসীকে ডেকে বলে ঃ আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসেন, তোমরাও তাকে ভালোবাসো। তখন আকাশবাসীরাও তাকে ভালোবাসতে শুরু করে। অতপর পৃথিবীর মানুষকেও তার প্রতি অনুরাগী করে দেয়া হয় এবং তারাও তাকে ভালোবাসতে শুরু করে।-(সহীহ আল বুখারি ঃ আবু হুরাইরা (রা)

এই পঁচিশটি হাদীসে রসূলুল্লাহ (স) অতি গুরুত্বপূর্ণ অনেকগুলো গুণ বৈশিষ্ট অর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন। সেই সাথে কতিপয় মন্দ বৈশিষ্ট্যের কথা

উল্লেখ করে সেগুলো পরিত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছেন। কোনো ব্যক্তি যদি হাদীসে উল্লেখিত দোষত্রুটিগুলো বর্জন করে সুন্দর মহত গুণগুলো অর্জন করবার অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়, তবে তিনি অবশ্যি অর্জন করতে সক্ষম হবেন অতীব সুন্দর এক চমৎকার ব্যক্তিত্ব। তিনি সক্ষম হবেন জনগণকে তাঁর চরিত্রমুগ্ধ করতে।

কারণ, তখন তো তার চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব হবে ফুলের মতো। তাঁর থেকে সৌরভ ছড়িয়ে পড়বে চারিদিকে। আর আপনিই বলুন সুরভিত ফুলের প্রতি কে না মুগ্ধ হয় ? কে না ভালোবাসে তাকে ?

৫. সেরা জীবনের কাংখিত মান

এক আল্লাহর প্রতি ঈমান একটি পূর্ণাঙ্গ দর্শন। এ দর্শনের শ্লোগান হলো 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। এ দর্শনের বিস্তারিত রূপ হলো তাওহীদ রিসালাত আখিরাত।

এক আল্লাহর কর্তৃত্ব, রিসালাতের গাইডেন্স, আখিরাতের জবাবদিহিতা এবং শাস্তি ও পুরস্কারের অনুভূতি ভিত্তিক জীবন যাপনই এ দর্শনের মূলকথা। এ দর্শনের বিশ্বাসী ও অনুসারী ব্যক্তি হলো মুমিন।

–মুমিনের জীবন নির্ভুল জীবন দর্শন ভিত্তিক পরিচালিত।

–মুমিনের জীবন আল্লাহ প্রদত্ত নির্ভুল জীবন ব্যবস্থার অনুসারী।

–মুমিনের জীবন পরকালীন জবাবদিহিতার অনুভূতিতে ভরপুর।

–মুমিনের জীবন আল্লাহর কর্তৃত্ব ও সার্বভৌমত্বের অধীনে পরিচালিত।

–মুমিনের জীবনের লক্ষ্য এক আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি লাভ।

–পরকালীন শাস্তির ভয় মুমিনকে সত্য ও ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত রাখে।

–পরকালীন মহা পুরস্কারের প্রেরণা মুমিনের জীবনকে অবৈধ লোভ-লালসা, কামনা-বাসনা ও হঠকারিতা থেকে পবিত্র রাখে।

–তাই মুমিনের জীবন পবিত্র জীবন, শ্রেষ্ঠ জীবন।

মুমিনের জীবনকে পূর্ণতার চূড়ান্ত শিখরে অধিষ্ঠিত করবার জন্যে রসূলে করীম (স) দিয়ে গেছেন নির্দেশিকা। তিনি নির্দেশিকা দিয়েছেন জীবন থেকে যাবতীয় নিন্দনীয় নরকীয় চরিত্র বৈশিষ্ট্য বর্জন করতে। সেসব নিন্দনীয় চরিত্র বৈশিষ্ট্য কি কি তাও তিনি অংগুলি নির্দেশ করে বলে গেছেন।

তিনি নির্দেশিকা দিয়ে গেছেন নিখুঁত জীবনের পূর্ণতাদানকারী গুণাবলীর। নির্দেশিকা দিয়ে গেছেন শ্রেষ্ঠ জীবনের কাংখিত মানের।

মুমিন যেনো সেসব পূর্ণতাদানকারী গুণাবলী অর্জন করে নিজের জীবনকে উন্নীত করতে পারে শ্রেষ্ঠ জীবনের পরমাকাংখিত শির-চূড়ায়। সে নির্দেশ দিয়ে গেছেন তিনি। তাই আসুন এবার আমরা নিজেদের অলংকৃত করি তাঁর বাণী থেকে সিঞ্চন করে কাঞ্চন ঃ

১. যে ব্যক্তি আমার কাছে তার দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী বস্তু (অর্থাৎ যবান) এবং দুই উরুর মধ্যবর্তী বস্তু (অর্থাৎ যৌনাঙ্গ) পবিত্র রাখার জামিন হবে, আমি তার বেহেশতের জামিন হবো।-(সহীহ বুখারি ঃ সহল ইবনে সাআদ)

২. সত্যের উপর অটল থাকো। জেনে রাখো, সত্য কল্যাণের দিকে ধাবিত করে আর কল্যাণ ধাবিত করে জান্নাতের দিকে।-(বুখারি ও মুসলিম ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা)

৩. মিথ্যা ত্যাগ করো। জেনে রাখো, মিথ্যা সীমালংঘনের দিকে ধাবিত করে আর সীমালংঘন ধাবিত করে জাহান্নামের দিকে।-(বুখারি ও মুসলিম ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা)

৪. আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল ! মুক্তির উপায় কি ? জবাবে তিনি বললেন ঃ

–তোমার যবানকে নিয়ন্ত্রণে রাখো,

–তোমার ঘরকে (দান ও মেহমানদারির জন্যে) প্রশস্ত করো এবং

–নিজের ভুল-ত্রুটির জন্যে কান্নাকাটি করো।-(মুসনাদে আহমদ ঃ উকবা ইবনে আমের রা)

৫. আমি রসূলুল্লাহ (স) কে বলতে শুনেছি ঃ

–অসৎ সঙ্গ থেকে একাকীত্ব উত্তম,

–একাকীত্ব থেকে সৎসঙ্গ উত্তম,

–নীরব থাকার চাইতে ভালো কথা বলা উত্তম,

–মন্দ কথা বলার চাইতে নীরব থাকা উত্তম।-(আবু যর গিফারী (রা) মিশকাত শরীফ)

৬. যেদিন আল্লাহর ছায়া ছাড়া আর কোনো ছায়া (আশ্রয়) থাকবে না, সেদিন আল্লাহ সাত ব্যক্তিকে ছায়াদান করবেন। তারা হলো ঃ

–ন্যায়পরায়ণ নেতা বা শাসক।

–ঐ যুবক যে আল্লাহর দাসত্বের জীবন যাপন করে বড় হয়েছে।

–যার অন্তর আঁটকে থাকে মসজিদের সাথে।

–ঐ দু' ব্যক্তি, যারা আল্লাহর জন্যে একে অপরকে ভালোবাসে, আল্লাহরই জন্যে একত্র হয় এবং তাঁরই জন্যে বিচ্ছিন্ন হয়।

–সেই ব্যক্তি, যাকে কোনো বংশীয়া সুন্দরী আহ্বান জানালে সে বলে দেয়ঃ আমি আল্লাহকে ভয় করি।

–ঐ ব্যক্তি, যে এমন গোপনে আল্লাহর পথে ব্যয় করে যে, তার ডান হাত কী ব্যয় করলো, তা তার বাম হাত পর্যন্ত জানে না।

–আর ঐ ব্যক্তি, যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করে অশ্রুপাত করে। –(বুখারি ও মুসলিম ঃ আবু হুরাইরা (রা)

৭. আল্লাহর সর্বোত্তম দাস তারা, যাদের দেখলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয়।–(বায়হাকী ঃ আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা)

৮. যার মধ্যে এ তিনটি বৈশিষ্ট্য থাকবে, আল্লাহ তার হিফাযতের দায়িত্ব নেবেন এবং তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন ঃ

–দুর্বলদের প্রতি কোমল আচরণ,

–মা-বাবার সাথে দয়া ও সহৃদয় আচরণ এবং

–অধীনস্থদের সাথে উত্তম ব্যবহার।

তাছাড়া, যার মধ্যে নিম্নোক্ত তিনটি গুণ পাওয়া যাবে, আল্লাহ তা'আলা এমন একদিন তাকে নিজের আরশের ছায়ায় স্থান দেবেন, যেদিন তাঁর ছাড়া আর কারো ছায়া থাকবে না ঃ

–কষ্টের সময়ও (নামাযের জন্যে) অযু করা,

–অন্ধকারেও (নামাযের জন্যে) মসজিদে যাওয়া এবং

–ক্ষুধার্তের খাওয়ার ব্যবস্থা করা।–(মিশকাত ঃ জাবির রা)

৯. ঐসব লোকই হলো আল্লাহর অলী ঃ

–যারা নামাযী–সঠিকভাবে পাঁচ ওয়াক্ত ফরয নামায আদায় করে।

–যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্যে রমযান মাসের রোযা রাখে।

–যারা মনের সন্তুষ্টির সাথে পরকালের পুরস্কারের আশায় যাকাত প্রদান করে এবং

–আল্লাহর নিষিদ্ধ বড় বড় পাপ (কবীরা গুনাহসমূহ) থেকে আত্মরক্ষা করে।

সাহাবীদের একজন জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে আল্লাহর রসূল ! বড় বড় পাপ কয়টি ? তিনি বললেন ঃ নয়টি। সেগুলো হলো ঃ

–আল্লাহর সাথে শিরক করা।

–কোনো মুমিনকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা।

–জিহাদ থেকে পলায়ন করা।

–সতী সাধ্বী নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করা।

–যাদু করা।

–এতীমের সম্পদ ভক্ষণ করা।

–সুদী কারবার করা।

–মুসলিম পিতামাতার অবাধ্য হওয়া।

–আল্লাহর ঘরের অসম্মান করা।"–(তাবরানী ঃ উবায়েদ ইবনে উমায়ের তার পিতার সূত্রে। হাদীসটি বিদায় হজ্জের ভাষণের অংশ বিশেষ)

১০. শুনো, কল্যাণের দুয়ার ব্যাপক প্রশস্ত। এ কাজগুলো তোমার নিজের জন্যে দানের সমতুল্য কল্যাণকর ঃ

–সুবহানাল্লাহ্ বলা।

–আলহামদুলিল্লাহ বলা।

–আল্লাহু আকবার বলা।

–লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা।

–ভালো কাজের আদেশ নির্দেশ দেয়া।

–মন্দ কাজ থেকে নিষেধ করা।

–পথ থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেয়া।

–বধিরকে শুনানোর জন্যে জোরে কথা বলা।

–অন্ধ ব্যক্তিকে পথ দেখানো।

–কাউকেও সঠিক পরামর্শ দেয়া বা সঠিক পথপ্রদর্শন করা।

–বিপদগ্রস্ত সাহায্য প্রার্থীর সাহাযার্থে দৌড়ানো।

–শক্ত হাতে দুর্বলের গুরুবোঝা বইতে/উঠাতে সাহায্য করা।–(যাদে রাহ্ঃ আবু যর গিফারী (রা)

১১. ক. যে জিনিস পরের হাতে আছে, তার প্রতি নিরাসক্ত থাকো।

খ. লোভ লালসা করো না। কারণ লোভ হলো সাক্ষাত দারিদ্র।

গ. এমনভাবে নামায পড়ো যেনো এটাই তোমার শেষ নামায।

ঘ. এমন কাজ করো না, যার জন্যে ক্ষমা চাইতে হবে।–(হাকিম ঃ সাআদ বিন আবি ওয়াক্কাস)

১২. আবু যর গিফারী (রা) বলেন, একদিন আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল ! ইব্রাহীম আলাইহিস সালামের উপর অবতীর্ণ কিতাবে কী শিক্ষা ছিলো ?

তিনি বললেন, তা ছিলো উপদেশে পরিপূর্ণ। যেমন ঃ

"হে মানুষের উপর চেপে বসা অহংকারী শাসক ! তুমি তো পরীক্ষায় নিক্ষিপ্ত হয়েছো। আমি তোমাকে এজন্যে ক্ষমতা দান করিনি যে, তুমি সম্পদের উপর সম্পদ সঞ্চয় করতে থাকবে। আমি তো তোমাকে এজন্যে ক্ষমতা দান করেছি যাতে কাউকেও মযলুম হয়ে আমার কাছে ফরিয়াদ করতে না হয়। কারণ, মযলুম কাফির হলেও আমি তার ফরিয়াদ গ্রহণ না করে ফেরত দেই না।"

"বুদ্ধিমান ব্যক্তি যতোক্ষণ সজ্ঞান থাকবে, তার সময়কে এভাবে ভাগ করে নেয়া কর্তব্য ঃ

–কিছু সময় রাখবে আল্লাহর সাথে একান্তে কথা বলার জন্যে।

–কিছু সময় রাখবে আত্ম মূল্যায়নের জন্যে।

–কিছু সময় রাখবে আল্লাহর সৃষ্টি কৌশল সম্পর্কে ভাববার জন্যে।

–কিছু সময় রাখবে জীবিকা উপার্জনের জন্যে।"

"জ্ঞানী ব্যক্তি তিনটি উদ্দেশ্য ছাড়া ভ্রমণে বের হবে না। সেগুলো হলো ঃ

–পরকালের পাথেয় সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অথবা

–জীবিকা উপার্জনের উদ্দেশ্যে, কিংবা

–হারাম নয় এমন আনন্দ উপভোগের উদ্দেশ্যে।"

"বুদ্ধিমান জ্ঞানী ব্যক্তির কর্তব্য হলো, সে নিজের–

–সমকালীন পরিস্থিতির উপর সজাগ দৃষ্টি রাখবে।

–নিজের অবস্থা ও অবস্থান সম্পর্কে সচেতন থাকবে এবং

–নিজের যবানকে নিয়ন্ত্রণে রাখবে। আর মনে রাখবে, যে নিজের আমলের সাথে তুলনা করে কথা বলে, তার কথা হয় কম। সে কেবল প্রয়োজনীয় কথাই বলে।"

আবু যর (রা) বলেন, এরপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল ! মূসা আলাইহিস সালামের উপর অবতীর্ণ কিতাবে কী বক্তব্য ছিলো ?

জবাবে তিনি বললেন, সে কিতাব শিক্ষা আর উপদেশে পরিপূর্ণ ছিলো। যেমন ঃ

–আমি বিস্মিত হই ঐ ব্যক্তির কর্মকাণ্ডে, যে মৃত্যু হবে বলে নিশ্চিত জেনেও, দুনিয়া ভোগে মত্ত থাকে।

–আমি বিস্মিত হই ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে, যে জাহান্নাম আছে বলে বিশ্বাস রাখে, তারপরও অট্টহাসিতে মেতে উঠে।

–আমি বিস্মিত হই ঐ ব্যক্তির কার্যক্রমে, যে তকদীরে বিশ্বাস করেও দুনিয়া কামাইর জন্যে সদা পেরেশান থাকে।

–আমি বিস্মিত হই ঐ ব্যক্তির ব্যাপার দেখে, যে পৃথিবীটাকে নিজ অধিবাসীদের সহ আবর্তিত হতে দেখেও এ দুনিয়াকেই নিজের চূড়ান্ত লক্ষ্যবস্তু হিসেবে গ্রহণ করে।

–আমি বিস্মিত ঐ ব্যক্তির ব্যাপারেও, যে কাল কিয়ামতের দিন হিসাব দিতে হবে বলে বিশ্বাস করে, অথচ সে অনুযায়ী আমল করে না।"

আবু যর (রা) বলেন, অতপর আমি অনুরোধ করলাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ

–আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি আল্লাহকে ভয় করবার। কারণ, আল্লাহর ভয়ই সকল আমলের শিরোমনি।

আমি বললাম, আমাকে আরো উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ

–কুরআন পাঠ এবং আল্লাহকে স্মরণ করা ও আল্লাহর বিষয়ে আলোচনা করাকে নিজের কর্তব্য কাজ বানিয়ে নাও। এ কাজ পৃথিবীতে তোমার চলার পথের আলোকবর্তিকা হবে আর হবে পরকালের পাথেয়।

আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমাকে আরো উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ

–বেশি হাসাহাসি (অট্টহাসি) করা থেকে বিরত থাকবে। কারণ, এতে অন্তরের মৃত্যু হয় এবং চেহারার জ্যোতি চলে যায়।

আমি আরয করলাম, আমাকে আরো উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ

–ইসলামী আন্দোলন (জিহাদ) করাকে নিজের কর্তব্য বানিয়ে নাও। কারণ এটাই আমার উম্মতের বৈরাগ্য।

আমি বললাম, আমাকে আরো উপদেশ দিন ! তিনি বললেন ঃ

–বেশি সময় নীরব থাকবে, কম কথা বলবে। এটা শয়তানকে তাড়াবার হাতিয়ার হবে আর তোমার দীনের কাজে সহায়ক হবে।

আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমাকে আরো উপদেশ দিন। তিনি বললেন ঃ

–দরিদ্র লোকদের ভালোবাসবে এবং তাদের সাথে উঠাবসা করবে।

আমি বললাম, আমাকে আরো উপদেশ দিন। তিনি উপদেশ দিলেন ঃ

–যারা (অর্থ বিত্ত ও সামাজিক মর্যাদায়) তোমার চাইতে নিচে, তাদের দিকে তাকাও। আর যারা (অর্থবিত্ত ও সামাজিক মর্যাদায়) তোমার চাইতে উপরে, তাদের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করো না। এমনটি করলে তোমার অন্তরে আল্লাহর নি'আমতের প্রতি অবজ্ঞা সৃষ্টি হবে।

আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমাকে আরো উপদেশ দিন। তিনি আমাকে উপদেশ দিলেন ঃ

–তিক্ত হলেও সত্য কথাই বলবে।

আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আমাকে আরো উপদেশ দিন। তিনি আমাকে উপদেশ দিয়ে বললেন ঃ

–তোমার নিজের মধ্যে যেসব ত্রুটি আছে, সেগুলোর দিকে তাকাও। অন্যদের মধ্যে যেসব ত্রুটি আছে সেগুলো খুঁজে বেড়ানো এবং বলে বেড়ানো থেকে বিরত থাকো।

–যে কাজ তুমি নিজে করো, তা অপর কেউ করলে সে জন্যে রাগান্বিত হওয়া উচিত নয়।

–যে ব্যক্তি নিজের দোষ না দেখে অপরের দোষ খুঁজে বেড়ায় এবং নিজে যে দোষ করে তা অন্য কেউ করলে অসন্তুষ্ট হয়, সে-ই প্রকৃত দোষী।

আবু যর (রা) বলেন, অতপর রসূলুল্লাহ (স) আমার বুকে হাত মেরে বললেন ঃ হে আবু যর !

–কর্ম প্রচেষ্টাও কর্মকৌশলের চাইতে বড় বুদ্ধিমত্তা আর নেই।

–অন্যায় ও নিষিদ্ধ কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখতে পারার চাইতে বড় বীরত্ব আর কিছু নেই। আর

–সুন্দর ব্যবহারের চাইতে বড় কোনো ভদ্রতা নেই।–(ইবনে হিব্বান ঃ আবু যর গিফারী রা)

১৩. আমার প্রভু পূণরায় আমাকে ডাকলেন, হে মুহাম্মদ ! আমি বললাম ঃ লাব্বায়েক–আমি হাযির হে প্রভু। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ উর্ধ্বজগতে (ফেরশতারা) কী বিষয়ে বিতর্ক করছে ?

এবার আমি বলে দিলামঃ সেসব বিষয়ে, যেগুলো দ্বারা গুনাহ দূরীভূত হয়। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ সেগুলো কি কি ? আমি বললাম, সেগুলো হলো ঃ

–যাবতীয় উত্তম ও কল্যাণকর কাজে অগ্রবর্তী থাকা,

–নামাযের পর মসজিদে বসা এবং

–কষ্টের সময় অযু করা।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আর কোন্ কোন্ ব্যাপারে তারা বিতর্ক করছে? আমি বললাম ঃ

–খাবার খাওয়ানোর ব্যাপারে,

–কোমলভাবে কথা বলার ব্যাপারে এবং

–রাত্রে নামায পড়ার ব্যাপারে, যখন মানুষ নিন্দ্রায় নিমগ্ন থাকে।

এবার আমার প্রভু বললেন, আমার কাছে প্রার্থনা করো। তখন আমি তাঁর কাছে প্রার্থনা করলাম ঃ আমার আল্লাহ্ ! আমি তোমার কাছে তৌফিক চাই ঃ

–কল্যাণকর কাজ করার।

–অন্যায় কাজ পরিত্যাগ করার।

–অভাবীদের ভালোবাসার।

–তোমার কাছে আরো চাই যে, তুমি আমাকে ক্ষমা করে দাও।

–আমার প্রতি রহম করো আর

–তুমি যখন কোনো কওমকে পরীক্ষায় ফেলার সিদ্ধান্ত নেবে, তখন পরীক্ষায় ফেলা ছাড়াই আমাকে মৃত্যু দান করো। আমি তোমার কাছে আরো চাই ঃ

–তোমার মহব্বত,

–সেইসব লোকের মহব্বত, যারা তোমাকে ভালোবাসে,

–আর তোমার কাছে তৌফিক চাই, সেইসব কাজকে মহব্বত করার যেগুলো তোমার মহববতের নিকটবর্তী করে দেয়।

–এগুলো সত্য কথা। এগুলো থেকে তোমরা শিক্ষাগ্রহণ করো এবং এগুলো অন্যদের শিক্ষা দাও। (তিরমিযী ঃ মুয়ায বিন জাবাল (রা)। হাদীসটি একটি লম্বা হাদীসের শেষাংশ)।

১৪. আবু হুরাইরা (রা) বর্ণনা করেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ

"আমার বান্দাহ আমার সম্পর্কে যেরূপ ধারণা পোষণ করে, আমি (আল্লাহ) তার জন্যে ঠিক সেরূপ। জেনে রাখো–

–বান্দাহ যখন আমাকে স্মরণ করে, আমি তখন তার সংগি হয়ে যাই।

–আল্লাহর কসম ! বান্দাহ যখন তওবা করে (অর্থাৎ আমার দিকে ফিরে আসে) তখন আমি ঐ ব্যক্তির চাইতেও অধিক খুশি হই, যে নির্জন মরুতে নিজের হারানো ঘোড়া খুঁজে পেয়েছে।

–বান্দাহ্ আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে এলে আমি তার দিকে এক বাহু এগিয়ে যাই।

–বান্দাহ আমার দিকে এক বাহু এগিয়ে এলে আমি তার দিকে দুই বাহু এগিয়ে যাই।

–বান্দাহ্ আমার দিকে হেঁটে এগিয়ে এলে আমি তার দিকে দৌড়ে এগিয়ে যাই।"–(সহীহ্ মুসলিম ঃ আবু হুরাইরা রা)

আসুন, আমরা বিশ্বনেতা রহ্মাতুললিল আলামীন মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (স) নির্দেশিত এইসব পূর্ণতাদানকারী গুণাবলী অর্জন করার জন্যে আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাই। তিনি যেসব নিন্দনীয় চরিত্র বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন, সেগুলো আমরা আমাদের জীবন থেকে দূরীভূত করবার জন্যেও আপ্রাণ প্রচেষ্টা চালিয়ে যাই।

এটাই শ্রেষ্ঠ জীবনের কাংখিত মানে উন্নীত হবার সিঁড়ি। মনে রাখবেন, সিঁড়ি বেয়ে নিচে নামা সহজ কাজ। কিন্তু সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠা সহজ কাজ নয়, এটা একটা কঠিন কাজ। নিখুঁত জীবনের পূর্ণতা প্রাপ্তির পরমাকাংখা যারা করেন, সারাটি জীবন তাদের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠার কষ্টসাধ্য এ কাজ করে যেতে হবে নিরবধি।

আল্লাহর পথে পূর্ণতা প্রাপ্তির অবিরত কষ্টসাধ্য সিঁড়ি আরোহী এই সিংহ মানবদের পরমাকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হবে কেবল সেদিন–

–যেদিন তারা ডান হাতে আমলনামা পাবে।

–যেদিন তাদের সব ত্রুটি বিচ্যুতি মাফ করে দেয়া হবে।

–যেদিন তাদের সহজ হিসাব নেয়া হবে।

–যেদিন তাদের নেকীর পাল্লা ভারী-ভরপুর হবে।

–যেদিন তাদের বলা হবে ঃ তোমরা সফল হয়েছো।

–যেদিন তাদের মিছিল করে নেয়া হবে জান্নাত অভিমুখে।

–যেদিন জান্নাতের দুয়ারসমূহ তাদের জন্যে খুলে দেয়া হবে।

–যেদিন জান্নাতের রক্ষীরা তাদের সালাম দিয়ে অভিবাদন জানাবে।

–যেদিন তারা প্রবেশ করবে পরমানন্দের চিরন্তন জান্নাতে।–(রচনাকাল ঃ আগষ্ট ১৯৯৯ইং)

১২

সুন্দর জীবনের উত্তম আদর্শ

যাঁরা আল্লাহর পরিচয় জেনে তাঁর প্রতি ঈমান এনেছেন এবং রসূলের মাধ্যমে আল্লাহ জীবন যাপনের যে বিধান দিয়েছেন সেটাকে জীবনের আদর্শ হিসাবে গ্রহণ করেছেন, সমাজের বুকে সে বিধান প্রতিষ্ঠার জন্যে আত্মনিয়োগ করেছেন, তারাই আদর্শ মানুষ, শ্রেষ্ঠ মানুষ। তাদের জীবন সৌন্দর্যের জ্যোতিতেই সমাজ আলোকিত হয়। তাঁরা সমাজের মনিমুক্তা। তাদের জীবন সৌন্দর্যে প্রতিফলিত হয় আল্লাহর দীনের আদর্শ। ইসলামী জীবন প্রণালী, রীতিনীতি, আদব কায়দা ও আচার-আচরণের তারা হয় মূর্ত প্রতীক। তাদের ভদ্রতা, শিষ্টাচার, কর্মপন্থা ও কর্মনীতি বিমুগ্ধ করে তোলে সমাজের মানুষকে। তাদের অনাবিল পরিচ্ছন্ন জীবনধারা মানুষকে আকৃষ্ট করে আল্লাহর পথে।

প্রিয় রসূল (স) বলেছেন ঃ আল্লাহ্ সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে ভালো বাসেন। আল্লাহ মানুষের জন্যে জীবন যাপনের যে বিধান দিয়েছেন, তার চাইতে সুন্দর আর কোনো বিধান হতে পারে না। আল্লাহ্ সুন্দর। তাঁর প্রদত্ত বিধানও সুন্দর। এই সুন্দর বিধানকে যারা নিজেদের জীবনে ফুটিয়ে তুলবে, তারা হবে মানুষের মাঝে সুন্দরতম মানুষ। তাদের জীবন হবে সুন্দর জীবন, শ্রেষ্ঠ জীবন, মহত জীবন, আদর্শ জীবন, উন্নত জীবন। তাদের জীবন সৌন্দর্য মানব সমাজকে সৌন্দর্য দান করবে। তাদের মহত, অমায়িক ও উদার জীবন মানুষকে নিয়ে আসবে ইসলামের অতি কাছাকাছি। তাদের জীবনাদর্শ মানুষকে অনুপ্রাণিত করে তুলবে ইসলামের আদর্শে জীবন গড়ে তুলতে।

যারা আল্লাহর প্রিয় মানুষ তাদের বাস্তব জীবন হয়ে থাকে ইসলামের সাক্ষ্য। ইসলামের সমস্ত সুন্দর গুণ-বৈশিষ্ট্য ফুলের মতো ফুটে উঠে তাদের চরিত্রে। তাদের আদর্শ জীবন ধারা থেকে মানুষ ইসলামকে উপলব্ধি করে। এজন্যেই আল্লাহ্ মুসলিম উম্মাহকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ "আমি তোমাদের শ্রেষ্ঠ উম্মাহ্ বানিয়েছি, যাতে করে তোমরা মানব জাতির কাছে সাক্ষ্য হও।"

এখানে আমরা মুমিন জীবনের কয়েকটি দিক আলোচনা করবো। আলোচনা করবো মুমিন জীবনের সুন্দরতম গুণবৈশিষ্ট্যের কথা। কথাগুলো আলোচনা করবো আল্লাহর কিতাব আর রসূলের (স) সুন্নাহর নির্দেশিকা থেকে। এবার তাহলে মূল কথা শুরু করি।

১. ঈমানের সৌন্দর্য

ঈমান হলো জীবন ও জগত সম্পর্কে এক আল্লাহ্ কেন্দ্রিক দর্শন। আর ইসলাম হলো এ ঈমানী দর্শনভিত্তিক জীবন ব্যবস্থা। এই ঈমানী দর্শনের জ্ঞান আমরা লাভ করেছি রসূলের মাধ্যমে। ইসলামী জীবন ব্যবস্থাও আল্লাহ্ তাঁরই মাধ্যমে আমাদের কাছে পাঠিয়েছেন। ঈমানী দর্শনের মূল কথা হলো ঃ এই মহাবিশ্বের একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন। মানুষও তাঁরই সৃষ্টি। তার কোনো শরীক নেই। তিনি নিখিল বিশ্বের একমাত্র স্রষ্টা, মালিক, পরিচালক ও শাসক। মানুষকে সৃষ্টি করেছেন তিনি তাঁর দাসত্ব করার জন্যে। মানুষ নিজেই নিজের জীবন যাপনের নির্ভুল ব্যবস্থা তৈরি করতে পারে না। তিনি রসূলের মাধ্যমে মানুষকে জীবন যাপনের নির্ভুল বিধান দিয়েছেন। মৃত্যুর পর মানুষকে পুনরুত্থিত করা হবে। সেখানে তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, সে আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করেছে কিনা ? যারা আল্লাহর দেয়া বিধান অনুযায়ী জীবন যাপন করে যাবে, তাদেরকে মহাসুখের জান্নাত দেয়া হবে। অন্যদেরকে কঠিন শাস্তির জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

এই জীবন দর্শনে বিশ্বাসীরাই হলো মু'মিন। আল্লাহর দেয়া জীবন বিধানের তারা অনুসারী। তাদের জীবন ধারা অন্য সব মানুষের জীবন ধারা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তাদের ঈমান ও বিশ্বাসই তাদের মধ্যে সৃষ্টি করে মহত দৃষ্টিভঙ্গি এবং সুন্দরতম জীবনধারা। তাদের চলার পথকে করে স্বতন্ত্র। সকল দিক থেকে তাদের জীবনের রীতিনীতি ও আদব-কায়দা (Manner) হয় সুন্দর, চমৎকার ও অনুকরণীয়। তারা পরিণত হয় আদর্শ মানুষে। ঈমান মুমিনের মধ্যে যেসব সৌন্দর্য ও আদর্শ গুণাবলী সৃষ্টি করে, তন্মধ্যে কয়েকটি মৌলিক সৌন্দর্য হলো ঃ

১. মুমিন জীবনের লক্ষ্য হবে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করা। তিনি গোটা জীবনকে পরিচালিত করবেন আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে।

২. পরকালের জবাবদিহিতার চিন্তা তাকে ব্যাকুল করে রাখবে।

৩. সবার চেয়ে এবং সবকিছুর চেয়ে তিনি আল্লাহকে অধিক ভালো বাসবেন।

৪. আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকেও ভয় করবেন না। গোপনে ও প্রকাশ্যে সবসময় আল্লাহর ভয় তার অন্তরকে কম্পিত করবে। অশ্রু বিগলিত করবে।

৫. আল্লাহ ছাড়া আর কারো কাছে তার মাথা নত হবে না।

৬. তিনি ভালোবাসবেন আল্লাহর জন্যে, ঘৃণা করবেন আল্লাহর জন্যে, দান করবেন আল্লাহর জন্যে, দান থেকে বিরত থাকবেন আল্লাহর জন্যে।

৭. তিনি ভরসা করবেন আল্লাহর উপর। সাহায্য চাইবেন কেবল আল্লাহর কাছে। আশা করবেন আল্লাহর নিকট।

৮. তিনি হৃদয় ও যবানকে সবসময় সিক্ত রাখবেন আল্লাহর স্মরণে।

৯. আল্লাহর নাফরমানী করে কারো আনুগত্য করবেন না।

১০. নিজে আল্লাহর দাসত্ব করবেন এবং পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে আল্লাহর দাস বানাবার জন্যে মমত্বের সাথে আহ্বান জানাতে থাকবেন।

১১. বিনয়ের সাথে আল্লাহকে ডাকবেন ও তাঁর কাছে প্রার্থনা করবেন।

১২. আল্লাহর প্রশংসা ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে থাকবেন।

১৩. জানমালের প্রকৃত মালিক মনে করবেন আল্লাহকে।

১৪. প্রকৃত সাফল্য মনে করবেন পরকালের সাফল্যকে। পৃথিবীর জীবনকে পরিচালিত করবেন পরকালীন সাফল্যের লক্ষ্যে।

২. রসূলের আদর্শ অনুসরণের সৌন্দর্য

মুহাম্মদ (স) আল্লাহর শেষ নবী ও রসূল। তাঁর প্রতি ঈমান আনা এবং তাঁকে অনুসরণ করা ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কিয়ামত পর্যন্ত গোটা মানব জাতির জন্যে আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনিই পথপ্রদর্শক। আল্লাহ তাঁর কাছে অহী নাযিল করেছেন। তাঁর মাধ্যমে মানুষের জন্যে হিদায়াত ও জীবন ব্যবস্থা নাযিল করেছেন। সেই হিদায়াত ও জীবন ব্যবস্থার শিক্ষক নিয়োগ করেছেন তাঁকে। আল কুরআনের তিনি যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন সেটাই সঠিক ব্যাখ্যা। তিনি ছিলেন ভুল-ত্রুটির উর্ধে। মানব সমাজের মধ্যে তিনি ছিলেন সর্বোত্তম চরিত্রের অধিকারী। তিনি আল্লাহর বিধানকে যেভাবে অনুসরণ করেছেন সকল মুমিনকেও তা ঠিক সেভাবেই অনুসরণ করতে হবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে তিনিই সত্য মিথ্যা, ন্যায়-অন্যায়, ভালোমন্দ এবং হক ও বাতিলের একমাত্র মাপকাঠি। তাঁর অনুসরণ এবং তাঁকে ভালোবাসার মধ্যেই মানুষের মুক্তি নিহিত। তাঁর ইত্তেবার (অনুসরণের) সৌন্দর্য হলো ঃ

১. আল্লাহর পরেই তাঁকে সবচাইতে বেশি ভালোবাসতে হবে।

২. তাঁকেই হক ও বাতিলের মাপকাঠি মেনে নিতে হবে।

৩. তাঁর সুন্নাহকেই জীবন প্রণালী হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

৪. তাঁর অনুসরণ-অনুকরণকেই আল্লাহর ভালোবাসা পাবার উপায় মেনে নিতে হবে।

৫. তাঁর নাম উচ্চারণ করলে তাঁর প্রতি সালাত পাঠ করতে হবে।

৬. তাঁর সাথিদের প্রতি ভালোবাসা পোষণ করতে হবে।

৩. দৈহিক পবিত্রতার সৌন্দর্য

পবিত্রতা তিন প্রকার ঃ ১. দৈহিক পবিত্রতা, ২. মন বা চিন্তার পবিত্রতা, ৩. নৈতিক চরিত্রের পবিত্রতা। একজন মুমিনকে তার ঈমানের আলোকে এ তিন প্রকারের পবিত্রতাই অর্জন করতে হবে। ইসলামে দৈহিক পবিত্রতার আদর্শ নিম্নরূপ ঃ

১. পায়খানায় গেলে ভালোভাবে পরিচ্ছন্ন হবে। ঢিলা বা টয়লেট পেপার এবং পানি ব্যবহার করবে। হাত পরিষ্কার করে ধৌত করবে।

২. প্রশ্রাবের পর ঢিলা বা টয়লেট পেপার ব্যবহার করবে। প্রয়োজনীয় সময়ক্ষেপণ করে উত্তমভাবে পরিচ্ছন্ন হবে।

৩. গোসল আবশ্যক হলে দেরি না করে উত্তমরূপে গোসল করে নেবে। শুক্রবারে অবশ্যি গোসল করবে।

৪. পরিধেয় পবিত্র ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবে।

৫. নখ বড় হতে দেবে না। প্রত্যেক শুক্রবারে নখ কেটে নেবে।

৬. চুল ছোট ও পরিচ্ছন্ন রাখবে। চুল আঁচড়ে রাখবে।

৭. কান পরিষ্কার রাখবে।

৮. হারাম খাদ্য ভক্ষণ করবে না।

৯. শরীর সুস্থ রাখবে। প্রয়োজনীয় ব্যায়াম করবে। অসুখ বিসুখ হলে চিকিৎসা করবে।

১০. নামায পড়ার জন্যে যথানিয়মে সুন্দরভাবে অযু করবে। বেশি বেশি অযু করা উত্তম।

প্রিয় নবী বলেছেন ঃ "পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক।" কুরআন বলে ঃ আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের ভালোবাসেন।"

৪. মনের সৌন্দর্য

মানুষ যখন কোনো ভালো কাজ করতে চায়, তখন প্রথমে মন-মস্তিষ্ক সে বিষয়ে চিন্তা করে এবং সিদ্ধান্ত নেয়। অতপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুন্দর কাজ করে। মন যদি কুচিন্তা করে, অন্যায় সিদ্ধান্ত নেয় তবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তাই বাস্তবায়ন করে। মনের কাজই চিন্তা করা। সে চিন্তা মুক্ত থাকে না। তাকে সুচিন্তার খোরাক না দিলে সে কুচিন্তা করবেই। তাই বুদ্ধিমানের কাজ হলো মনের পিছে লেগে থাকা। তাকে সুচিন্তার উপকরণ সরবরাহ করতে থাকা। মুমিনের মনের সৌন্দর্য হলো ঃ

১. আল্লাহর প্রেমে মনকে পাগল করে রাখা।

২. আল্লাহর স্মরণে মনকে ব্যস্ত রাখা।

৩. আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করতে থাকা।

৪. পরকালের জবাবদিহিতার চিন্তায় মনকে ব্যাকুল করে রাখা।

৫. দীনি দায়িত্ব পালনের চিন্তায় মনমগজকে আচ্ছন্ন করে রাখা।

৬. সব মানুষের কল্যাণের চিন্তা করা। কারো অকল্যাণের চিন্তা না করা। মানুষকে ভালোবাসা।

৭. ঘৃণা, বিদ্বেষ ও সংকীর্ণতা থেকে মনকে মুক্ত রাখা।

৮. কুচিন্তা থেকে মনকে পবিত্র রাখা।

৯. সন্দেহ, সংশয় ও কু-ধারণা থেকে মনকে মুক্ত রাখা।

১০. বৈষয়িক লোভ-লালসা ও কামনা-বাসনা থেকে মনকে মুক্ত রাখা।

১১. আল্লাহর পুরস্কারের আশা ও শাস্তির ভয় দ্বারা মনকে আচ্ছন্ন রাখা।

১২. মনের মধ্যে জ্ঞানার্জনের পিপাসা সৃষ্টি করা।

৫. ইবাদাতের সৌন্দর্য

রসূলের শিখানো পদ্ধতিতে আল্লাহর হুকুম পালন করা, জীবন যাপন করা এবং তাঁর নিকট প্রার্থনা করাই হলো ইবাদত। ইবাদতের জন্যই আল্লাহ মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। ইবাদতের সৌন্দর্য হলো ঃ

১. ইখলাস বা নিয়্যতের নিষ্ঠা। অর্থাৎ কেবল আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্যেই ইবাদত করতে হবে।

২. ইবাদতে কাউকেও শরীক করা যাবে না।

৩. ইবাদত করতে হবে বিনয়ের সাথে। আল্লাহকে ভয় করে।

৪. আল্লাহকে হাযির নাযির মনে করে ইবাদত করতে হবে।

৫. ইবাদতের যাবতীয় শর্ত এবং আরকান আহকাম যথানিয়মে পালন করতে হবে।

৬. প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যে ইবাদত করা যাবে না।

৭. ফরয ইবাদতে কোনো প্রকার গাফিলতি প্রদর্শন করা যাবে না।

৮. নফল ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর নৈকট্য লাভের চেষ্টা করতে হবে।

৯. ইবাদত করতে হবে মনের সন্তুষ্টি সহকারে।

৬. সালাত আদায়ের সৌন্দর্য

সালাত (নামায) হলো ইবাদতের শিরোমণি। সালাত আদায়ের ব্যাপারে আল্লাহ সবচাইতে বেশি তাকিদ করেছেন। বারবার নির্দেশ দিয়েছেন। সালাত জান্নাতের চাবি। সালাত মুমিনের মিরাজ। সালাতের মাধ্যমে মুমিন তার

মনিবের সাথে কথাবার্তা বলে। দাসত্ব প্রকাশের সবচাইতে বড় উপায় সালাত। সালাত আল্লাহর সমীপে বান্দাহর পূর্ণ আত্মসমর্পণের প্রতীক। পরকালে সালাতের হিসাবে পাশ করলে অন্যান্য বিষয়ে পাশ করার আশা করা যায়। হাদীসে সালাতের অনেক অনেক মর্যাদার কথা উল্লেখ হয়েছে। তাই সালাত আদায়ে অধিক সতর্ক ও যত্নবান হওয়া দরকার। সালাতকে সৌন্দর্যমণ্ডিত করা দরকার। সালাতের সৌন্দর্য হলো ঃ

১. সুন্দর ও সুচারুভাবে অযু করা।

২. সালাতের মাধ্যমে আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার নিয়্যত করা।

৩. লোক দেখানোর জন্যে সালাত না পড়া।

৪. আরকান আহকাম যথাযথভাবে পালন করা।

৫. আল্লাহকে উপস্থিত মনে করা।

৬. আল্লাহর ভয়ে ভীত ও বিনয়ী হওয়া।

৭. রুকূ, সিজদার সময় আল্লাহর সামনে মাথা নত করছি মনে করা। পূর্ণ আত্মসমর্পণের অনুভূতি জাগিয়ে তোলা।

৮. সূরা কিরাত ও দু'আসমূহ বিশুদ্ধভাবে বুঝে বুঝে পড়া। ধীরে পড়া।

৯. ধীরস্থিরভাবে সালাত আদায় করা।

১০. ফরয সালাত জামাতের সাথে আদায় করা।

১১. সালাত আদায়ে কোনো প্রকার গাফিলতি না করা।

১২. এক সালাতের পর আরেক সালাতের জন্যে অপেক্ষারত থাকা। মনকে মসজিদের সাথে ঝুলিয়ে রাখা।

৭. কুরআন পাঠের সৌন্দর্য

কুরআন আল্লাহর কিতাব। মানুষের হিদায়াতের জন্যে তিনি এ কিতাব নাযিল করেছেন। জ্ঞানের মূল উৎস এ কিতাব। এ কিতাবের কোনো বক্তব্যে সন্দেহ সংশয়ের লেশমাত্র নেই। এর প্রতিটি অক্ষর আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। আল্লাহ তাঁর রসূলকে পাঠিয়েছিলেন তাঁর দীন নিয়ে। হিদায়াত নিয়ে। কুরআনই হলো আল্লাহর দীন এবং হিদায়াত। আল্লাহ রসূলকে তাঁর দীন বিজয়ী করবার দায়িত্ব অর্পণ করেছিলেন। আর রসূল দীনকে বিজয়ী করার জন্যে যে বিপ্লবী আন্দোলন পরিচালনা করেন, কুরআনই ছিলো তার গাইড বুক। কুরআন আল্লাহর আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্রের রূপরেখা। কুরআন তার পাঠকের অন্তরে সর্বপ্রকার সুন্দর মানবীয় গুণ সৃষ্টি করে। তার পাঠককে সান্নিধ্যে পৌঁছে দেয় মহামনিবের। কুরআন তার পাঠকের জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করে, মনকে কোমল উদার ও অমায়িক করে। কুরআন তার পাঠককে ভালো কাজে

উদ্বুদ্ধ করে। মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে। কুরআনকে যে সাথি বানিয়ে নেয়, কুরআন তার চলার পথের আলো হয়, তার রূহের খোরাক হয়। কুরআন তার অন্তরকে তরতাজা রাখে। তার যবানকে আল্লাহর স্মরণে সিক্ত রাখে। আল্লাহর ভালোবাসায় তাকে সম্মোহিত করে। তার জীবনের সমস্ত সমস্যার সমাধান পেশ করে দেয়। তার নিরাশা দূর করে। কুরআন তার সাথির জন্যে পরকালে সুপারিশ করবে। কিভাবে করা যায় কুরআনের সাথে উত্তম আচরণ ?

১. কুরআনকে মহামনিব আল্লাহর বাণী বলে নিশ্চিত মনে মেনে নেয়া।

২. কুরআনকে হিদায়াত ও মুক্তির পথ হিসাবে গ্রহণ করা।

৩. কুরআনকে মানুষের একমাত্র নির্ভুল জীবন ব্যবস্থা বলে মেনে নেয়া।

৪. বিশুদ্ধভাবে পাঠ করতে শেখা, সুললিত কণ্ঠে তিলাওয়াত করা।

৫. কুরআন বুঝে পড়া। নিবিষ্ট মনে পড়া। কুরআনের বক্তব্যকে হৃদয়ের মাঝে গেঁথে নেয়া।

৬. কুরআন সম্পর্কে চিন্তা গবেষনা করা।

৭. কুরআনের বাণী পঠিত হলে মনোযোগ সহকারে তা শুনা।

৮. আউযুবিল্লাহ্ বলে শয়তানের ধোকা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় চেয়ে পাঠ আরম্ভ করা।

৯. কুরআনকে কোনো ভ্রান্ত ধারণার পক্ষে দলিল হিসাবে গ্রহণ না করা।

১০. কুরআনের হিদায়াতের আলোকে নিজের ভুল ধ্যান-ধারণা ও চরিত্রকে সংশোধন করে নেয়া।

১১. প্রতিদিন কুরআনের কিছু অংশ পাঠ করা।

১২. কুরআনের বিশেষ বিশেষ অংশ মুখস্থ্ করা এবং প্রতিদিন তা তিলাওয়াত করা।

১৩. কুরআন পাঠকালে মনে করা যে, আমি আল্লাহর সাথে কথা বলছি বা আল্লাহর বাণী উচ্চারণ করছি ও শুনছি।

১৪. কুরআনকে ইসলামী আন্দোলন ও জীবন যাপনের গাইড বুক হিসাবে গ্রহণ করা।

৮. ছাত্র জীবনের সৌন্দর্য

সামাজিক জীবনে দায়িত্ব পালনের জন্যে আত্মগঠনের সময়কালকে বলা হয় ছাত্র জীবন। বিশেষ করে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা জীবনই হলো ছাত্রজীবন। ছাত্ররাই ভবিষ্যত সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব পালন করে। তারাই হয় জাতির কর্ণধার। সমাজ পরিবর্তন ও আদর্শ সমাজ গড়ার দায়িত্ব তাদেরই পালন করতে হয়। ছাত্রজীবনে নিজেকে আদর্শবান হিসাবে গড়ে তুলতে পারলে

সামাজিক জীবনে উপযুক্ত দায়িত্বশীল হওয়া যায়। আদর্শ সমাজ গড়ার মূলধনে পরিণত হওয়া যায়। যে ছাত্র জীবনে আদর্শ হতে পারে সে সামাজিক জীবনেও আদর্শ হতে পারে। ছাত্র জীবনের সৌন্দর্য সামাজিক জীবনকে করে তোলে সৌন্দর্যমণ্ডিত। ছাত্রজীবনের সৌন্দর্যের মধ্যে রয়েছে ঃ

১. পড়া লেখার উদ্দেশ্য হবে জ্ঞানার্জন।

২. জ্ঞানার্জনের লক্ষ্য হবে মানুষ হিসাবে এবং আল্লাহর খলীফা হিসাবে দায়িত্ব পালনের যোগ্যতা অর্জন।

৩. শিক্ষার মাধ্যমে মানসিক, নৈতিক, আধ্যাত্মিক ও শারীরিক যোগ্যতা অর্জনের প্রয়াস চালাবে।

৪. জ্ঞান ও শিক্ষার আলোকে জীবন গড়ে তুলতে হবে এবং সমাজ গড়ার প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

৫. যে কোনো পড়া বুঝে পড়তে হবে। না বুঝলে বুঝে নিতে হবে।

৬. শিক্ষককে সম্মান ও শ্রদ্ধা করতে হবে। শিক্ষকের কোনো মত বা বক্তব্য মেনে নিতে না পারলে শ্রদ্ধার সাথে নিজ মত প্রকাশ করতে হবে। যুক্তি সহকারে দ্বিমত পোষণ করতে হবে।

৭. নিয়মিত ক্লাশে উপস্থিত হবে। ক্লাশ শুরু হবার আগেই উপস্থিত হবে। সময়ানুবর্তিতা ও নিয়মানুবর্তিতার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হবে।

৮. শিক্ষকের বক্তব্য মনোযোগ সহকারে শুনা দরকার। পড়ার সময় মনোযোগ সহকারে পড়বে। হাতের লেখা সুন্দর করতে হবে।

৯. আদর্শ সন্তানের সৌন্দর্য

আমরা সবাই পিতা-মাতার সন্তান। আল্লাহ ও রসূলের পর পিতা-মাতাই আমাদের সদ্ব্যবহার পাবার সবচেয়ে বেশি অধিকারী। কুরআন বার বার পিতা-মাতার সাথে উত্তম আচরণ করার নির্দেশ দিয়েছে। এমনকি কারো বাবা মা যদি মুশরিক বা কাফির হয়, তবু তাদের সাথে ভালো ব্যবহার করবার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তবে তারা আল্লাহর নাফরমানীমূলক কোনো নির্দেশ দিলে তা অস্বীকার করতে বলা হয়েছে। তাদের সেবা করা, তাদের আদেশ শ্রবন করা, তাদের সেবা যত্ন করা, তাদেরকে কোনো প্রকার কষ্ট না দেয়া এবং তাদের জন্যে দু'আ করা প্রত্যেক মুমিনের কর্তব্য। প্রিয় রসূল (স) পিতামাতা সম্পর্কে বলেছেন ঃ "তারা তোমার জান্নাত অথবা জাহান্নাম।" ইসলামে সন্তান জীবনের সৌন্দর্য ও আদর্শ হলো ঃ

১. পিতা-মাতার আদেশ পালন করা। (ইসলাম বিরোধী আদেশ ছাড়া) তাদের সম্মান করা, শ্রদ্ধা করা।

২. তাদের সেবা যত্ন করা। তারা অক্ষম হয়ে পড়লে তাদের ভরণ পোষণের দায়িত্ব পালন করা।

৩. তাদের সাথে সবসময় উত্তম আচরণ ও সদ্ব্যবহার করা।

৪. তাদেরকে বিন্দুমাত্র কষ্ট না দেয়া। তাদেরকে 'উহ' পর্যন্ত না বলা।

৫. কোনো বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করলে সম্মান ও শ্রদ্ধার সাথে নিজের মত পেশ করা। বিতর্কে লিপ্ত না হওয়া।

৬. নিজের উপার্জন থেকে তাদের জন্যে ব্যয় করা।

৭. তাদের জন্যে সবসময় দু'আ করা।

৮. তাদের মৃত্যুর পর তাদের মাধ্যমে যারা আত্মীয় স্বজন হয়েছে তাদের সাথে সুসম্পর্ক রাখা। তাদের ঋণ থাকলে তা পরিশোধ করা।

১০. পানাহারের সৌন্দর্য

১. সবসময় হালাল খাদ্য গ্রহণ করবে। হারাম খাদ্য এবং পানীয় অবশ্যি পরিত্যাগ করা।

২. আল্লাহর নাম নিয়ে খাবার শুরু করা।(বিস্‌মিল্লাহি ওয়া আ'লা বারাকাতিল্লাহ)।

৩. পানাহার শেষ করে আলহামদুল্লিাহ বলে আল্লাহর শোকর আদায় করা।

৪. বসে পানাহার করবে। হেলান দিয়ে পানাহার না করা।

৫. পরিমিত খাদ্য গ্রহণ করা।

৬. ডান হাতে খাওয়া।

৭. একইপাত্রে বা টেবিলে অন্যদের সাথে খেতে বসলে নিজের নিকটেরটা খাওয়া। নিজে যা পছন্দ করবে, অন্যের জন্যে তাই পছন্দ করা।

৮. মেহমানদারি করবে। মেহমানের অধিকারের প্রতি লক্ষ্য রাখা।

৯. মেহমান এলে প্রয়োজনে একজনের খাদ্য দু'জনে খাবে, কিংবা মেহমানকে অগ্রাধিকার দেয়া।

১০. খাবার জিনিসের অপব্যয় না করা। অপচয় না করা।

১১. হাত পরিষ্কার করে ধুয়ে খাবার শুরু করবে। খাবার শেষ হলেও পরিষ্কার করে হাত ধুইয়ে নেয়া।

১২. ধীরে সুস্থে খাবে। ত্বরিত না খাওয়া।

১৩. মুখে খাবার রেখে কথা না বলা।

১৪. অনেকে একত্রে খেতে বসলে এক সাথে খাবার শুরু করা।

১৫. হাড়, কাটা ইত্যাদি যাকিছু ফেলতে হয়, যেখানে সেখানে না ফেলা। খাবার জায়গা অপরিচ্ছন্ন না করা।

১৬. পঁচা অপরিচ্ছন্ন খাবার না খাওয়া।

১৭. সুষম খাদ্য গ্রহণ করা।

১১. কথাবার্তার সৌন্দর্য

১. সালাম বিনিময়ের মাধ্যমে কথাবার্তা শুরু করা।

২. হাসিমুখে কথা বলা। মুসকি হাসা, অট্টহাসি নয়।

৩. সুন্দর ও কোমলভাবে কথা বলা। চিৎকার করে কথা বলবে না। কর্কশ ভাষায় কথা না বলা।

৪. যার সাথে কথা বলা দরকার, তিনি দাঁড়িয়ে থাকলে দাঁড়িয়ে কথা বলা। কিংবা তাকে বসতে দেয়া।

৫. সোজাসুজি বসে কথা বলা এবং শুনা।

৬. মনোযোগ সহকারে অন্যের কথা শুনা। তার চেহারার দিকে দৃষ্টি দেয়া।

৭. অপরের কথা শেষ হবার আগে কথা না বলা।

৮. যিনি বলতে চান তাকে তার সম্পূর্ণ কথা বলতে দেয়া।

৯. কথাবার্তায় শ্রোতার মনে কষ্ট না দেয়া।

১০. একজনের দোষ অপরজনের কাছে না বলা। এমনকি তা যদি সত্যও হয়। কারণ তা গীবত।

১১. কথাবার্তা বলার সময় বিতর্ক পরিহার করা। কেউ বিতর্ক করতে চাইলে কথা শেষ করে দেয়া।

১২. বেশি শুনা, কম বলা।

১৩. অর্থবহ কথা বলা। বাজে ও নিরর্থক কথা না বলা।

১৪. কথাবার্তায় মানুষকে হতাশ ও নিরাশ না করা। আশান্বিত করা। সহজতা বিধান করা।

১৫. সুবিচারমূলক কথা বলা। সত্য বলা, অন্যায়, মিথ্যা ও বানোয়াট কথা না বলা।

১৬. শ্রোতাকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া।

১৭. শ্রোতার মধ্যে যেনো তাকওয়া এবং আল্লাহ নির্ভরতা বৃদ্ধি পায়।

১৮. সমস্যার কথা না বলা। সমাধানের কথা বলা। সমস্যার কথা বললে সেই সাথে সমাধানের কথাও বলতে হবে।

১৯. কথা হবে উপদেশ ও পরামর্শমূলক।

২০. শ্রোতার জন্যে দু'আ করা।

১২. সামাজিক জীবনের সৌন্দর্য

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। সমাজকে ইসলামের আলোকে গঠন করা মুমিনের দায়িত্ব ও কর্তব্য। ইসলাম একজন মুমিনের উপর অগণিত সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য অর্পণ করেছে। সেই কর্তব্য কাজগুলোই মুমিন জীবনের সৌন্দর্য ও আদর্শ। এখানে সবগুলো কর্তব্যের কথা আলোচনা করার সুযোগ নেই। কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সৌন্দর্যের কথা আমরা এখানে উল্লেখ করছি কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ঃ

১. বিশ্বস্ততা ২. সুবিচার ও ন্যায় পরায়নতা ৩. মানুষের কল্যাণ কামনা ৪. মানব সেবা ও পরোপকার ৫. দয়া ও ক্ষমা। ৬. আত্মত্যাগ ৭. সম্মান ও স্নেহপরায়নতা ৮. অপরের মতকে শ্রদ্ধা করা, পরমত সহিষ্ণুতা ৯. সাহায্য, সহযোগিতা, উদারতা, অমায়িকতা ও দানশীলতা ১০. পরামর্শ দান ও গ্রহণ ১১. দুঃখ-সুখে শরীক হওয়া ১২. রোগগ্রস্তকে দেখা শুনা করা ১৩. সালাম আদান প্রদান ১৪. একতা ও সংঘবদ্ধতা ১৫. সত্য ও ন্যায়ের প্রচার-প্রতিষ্ঠা ১৬. অন্যায়ের প্রতিবাদ প্রতিরোধ ও উৎখাত ১৭. শিক্ষা দান ১৮. মেহমানদারী ১৯. বিবাহ শাদী ও আত্মীয়তা ২০. লেনদেন ২১. সদাচার, শিষ্টাচার ও আদব কায়দা ২২. বন্ধুত্ব ও ভালোবাসা।

১৩. স্বামীর সৌন্দর্য

বিয়ে করার মাধ্যমে আপনি একজন মহিলার স্বামী হয়েছেন। একজন মুসলিম হিসেবে বিয়ে করার সময় আপনার দৃষ্টি রাখা উচিত, আপনি যাকে বিয়ের মাধ্যমে স্ত্রী বানাতে যাচ্ছেন, তিনি যেনো একজন আল্লাহভীরু, গুণবতী ও কর্মদক্ষ মহিলা হন। বিয়ের পর স্ত্রীর কাছে প্রিয় 'স্বামী' হবার চেষ্টা করুন, সুন্দর স্বামী হবার চেষ্টা করুন। এভাবে চেষ্টা করুন ঃ

১. আল্লাহ্ পাক আপনাকে একজন স্ত্রী দান করেছেন, সে জন্যে তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ থাকুন, তাঁর শোকর আদায় করুন।

২. স্ত্রীকে বুঝবার চেষ্টা করুন। তার জ্ঞান বুদ্ধি, মন মানসিকতা, স্বভাব প্রকৃতি, দক্ষতা, গুণাবলী, দোষত্রুটি জেনে নিন।

৩. তাকে আপনার মনের মতো গড়ে তুলবার পরিকল্পনা নিন।

৪. তার জ্ঞান, বুদ্ধি, যোগ্যতা, প্রতিভা ও গুণাবলীকে বিকশিত করে তুলুন। তাকে সর্বগুণে ফুলের মতো প্রস্ফুটিত করে তুলুন।

৫. তার মধ্যে যেসব ত্রুটি ও কমতি আছে, একজন সুচিকিৎসকের মতো সেগুলো নিরাময় করুন। তিনি তো আপনারই স্ত্রী।

৬. তাকে আন্তরিকভাবে ভালোবাসুন। গভীরতম ভালোবাসুন।

৭. হাসিমুখে কথা বলুন। খুশি মনে কথা বলুন।

৮. তাকে সাথে করে বেড়াতে যান।

৯. চমৎকার আচরণ করুন। তার ভালো গুণাবলীর প্রশংসা করুন।

১০. তার কাছে ভরসাপূর্ণ, বিশ্বস্ত ও ব্যক্তিত্ববান হোন।

১১. স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করে কাজ করুন।

১২. তার ভালো কাজের প্রশংসা করুন।

১৩. তার অবদানের স্বীকৃতি দিন।

১৪. তাঁর মানসিক ও জৈবিক দাবি পূরণ করুন।

১৫. কথা, কাজ এবং রাগ অনুরাগে তার প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করুন।

১৬. তার ছোট খাটো ত্রুটি বিচ্যুতি উপেক্ষা করুন।

১৭. তার ভালো দিকগুলো বিবেচনা করে মন্দ দিকগুলো ভুলে থাকুন।

১৮. নিজেকে স্ত্রীর কাছে পরিচ্ছন্ন রাখুন। কোনো ব্যাপারে লুকোচুরি করবেন না।

১৯. তার আব্দার রক্ষা করুন।

২০. আপনার জন্যে কষ্ট করলে তাকে ধন্যবাদ জানান।

২১. আপনার উপকার করলে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করুন।

২২. তাকে বিশ্বাস করুন, তার প্রতি আস্থা রাখুন।

২৩. মাঝে মধ্যে তাকে উপহার দিন।

২৪. সাধ্যানুযায়ী তার খোরপোষের ব্যবস্থা করুন।

২৫. স্ত্রীর মন রক্ষা করুন।

২৬. নিজের দায়িত্ব ও সংকট নিয়ে প্রয়োজন মতো স্ত্রীর সাথে আলোচনা করুন। আপনার কর্ম ও ব্যস্ততা সম্পর্কে তাকে অবহিত রাখুন।

২৭. তাকে সবসময় কিছু হাত খরচ দিন।

২৮. সমঝোতার মাধ্যমে সংসার খরচের দায়িত্বও স্ত্রীকে দিতে পারেন। নিজের আয় সম্পর্কে স্ত্রীকে জ্ঞাত রাখুন।

২৯. স্ত্রীর উপার্জিত অর্থ তাকেই খরচ করতে দিন, আপনি হস্তক্ষেপ করবেন না।

৩০. স্ত্রীর অভিযোগ ও অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য রাখুন এবং তা দ্রুত দূর করার চেষ্টা করুন। তাকে বলুন, আমি সত্যিই তোমার ভালো চাই।

৩১. স্ত্রীর যে কোনো ভালো প্রস্তাবকে স্বাগত জানান।

৩২. স্ত্রীর স্বাস্থ্যের ব্যাপারে খোঁজ খবর রাখুন, অসুস্থ হলে দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করুন।

৩৩. স্ত্রীর কাছে কোনো ভুল করলে, তা স্বীকার করুন। অন্যায় করলে অনুতপ্ত হোন। কষ্ট দেবার জন্য তাকে জ্বালাতন করবেন না।

৩৪. স্ত্রীকে বন্ধু বানিয়ে নিন। তার সাথে বন্ধুর মতো হৃদ্যতা গড়ে তুলুন এবং বন্ধুর মতো আচরণ করুন।

৩৫. তাকে ঘরে কর্তৃত্বের দায়িত্ব দিন।

৩৬. সন্তানদের ব্যাপারে তার সাথে পরামর্শ করে কাজ করুন। তাকে বলুন, তোমার সন্তানদের সবার সেরা মানুষ বানাও।

৩৭. কখনো অন্যের কাছে স্ত্রীর বদনাম করবেন না।

৩৮. স্ত্রীর আত্মীয় স্বজনকে কদর করুন, সম্মান করুন, শ্রদ্ধা করুন।

৩৯. ঘরের কাজে স্ত্রীকে সাধ্যমতো সাহায্য করুন।

৪০. কখনো স্ত্রীর অধিকারে হস্তক্ষেপ করবেন না।

৪১. সন্তানদের সামনে স্ত্রীকে অপমানিত করবেন না।

৪২. স্ত্রীর মনের মতো হবার চেষ্টা করুন।

৪৩. স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করুন, তিনি আপনাকে কেমন দেখতে চান ? আরো ভালো হবার জন্যে আপনার কি কি করা দরকার ?

–একবার এক প্রবীন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ঃ ঐ ব্যক্তি কে, যে ভুল করেনি, তবু ভুল স্বীকার করে ?

বৃদ্ধ জবাব দিলেন ঃ স্বামী।

১৪. স্ত্রীর সৌন্দর্য

স্ত্রী স্বামীর সংসারের প্রাণ। একজন মহিলা নিজেই নিজের জন্য ভালো স্বামী পছন্দ করার অধিকার রাখেন। তাছাড়া তার বাবা-মা এবং অন্যান্য আত্মীয় স্বজনও এ ব্যাপারে প্রাণপণ চেষ্টা করেন। বিয়ের মাধ্যমে আপনি একজন পুরুষের স্ত্রী হলেন। তিনি হলেন আপনার স্বামী। স্বামীর কাছে একজন স্ত্রীর হওয়া চাই গুণবতী। হওয়া চাই স্বামীর মনের মতো, স্বামীর প্রিয়তমা। কিন্তু কিভাবে হবেন সে রকম ? হ্যাঁ সবদিক দিয়ে সুন্দর স্ত্রী হবার আছে সুন্দর উপায়। তাহলো ঃ

১. আল্লাহ্ তা'আলা আপনাকে একজন স্বামী দান করেছেন, সে জন্যে আল্লাহর শোকর আদায় করুন।

২. স্বামীকে বুঝুন। স্বামীর মন মানসিকতা, স্বভাব প্রকৃতি, যোগ্যতা, গুণাবলী, সামাজিক মর্যাদা উপলব্ধি করুন এবং সেভাবে তাকে গ্রহণ করুন। স্বামীকে শ্রদ্ধা করুন।

৩. স্বামীকে হৃদয়ের গভীরে, অন্তরের অন্তস্থলে স্থান দিন। তাকে প্রাণ খুলে ভালোবাসুন। হৃদয় উজাড় করে ভালোবাসুন।

৪. স্বামীর সাথে হাসিমুখে কথা বলুন। খুশি মনে কথা বলুন।

৫. স্বামীর কাছে মনের কথা খুলে বলুন। সুখ, দুঃখ, আনন্দ, সমস্যা, সংকট সবই স্বামীকে জানান।

৬. বিশ্বস্ত হোন এবং বিশ্বস্ত থাকুন।

৭. স্বামীর সব ধরনের আমানত রক্ষা করুন।

৮. স্বামীর সব ধরনের গোপন বিষয়াদি গোপন রাখুন।

৯. স্বামীর গুণাবলীর প্রশংসা করুন।

১০. কখনো কারো কাছে স্বামীর বদনাম করবেন না।

১১. স্বামীর সাথে বেড়াতে যান।

১২. স্বামী যেভাবে চান, সেভাবে নিজেকে সাজান।

১৩. স্বামীর সুখে সুখী হোন, স্বামীর দুঃখে দুখী হোন।

১৪. সুযোগ ও সামর্থ মতো স্বামীর সেবা করুন।

১৫. স্বামীর সমস্যা ও সংকটে স্বামীকে সাহায্য করুন, সান্ত্বনা দিন, প্রবোধ দিন, পরামর্শ দিন, প্রয়োজন মতো সংগ দিন।

১৬. স্বামীর প্রতি ভালোবাসা প্রকাশ করুন। তাকে বলুন, আমি তোমার চিরদিনের জীবন সংগিনী।

১৭. স্বামীর আদেশ পালন করুন। কিছুতেই স্বামীর অবাধ্য হবেন না। স্বামী যদি আল্লাহর ইচ্ছা ও সন্তুষ্টির বিপরীত কোনো আদেশ করে, তবে কেবল সে ব্যাপারেই নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করুন।

১৮. স্বামীর কোনো বদঅভ্যাস থাকলে ভালোবাসা দিয়ে বিজ্ঞ চিকিৎসকের মতো তা দূর করার প্রচেষ্টা চালিয়ে যান।

১৯. স্বামীর কল্যাণ ও উন্নতির জন্যে আল্লাহর কাছে দু'আ করুন। স্বামীর মধ্যে যাকিছু মন্দ আছে, সেগুলো যেনো দূর হয়, সে জন্য প্রচেষ্টার সাথে সাথে আল্লাহর কাছে দু'আ করুন।

২০. স্বামীকে বন্ধু বানিয়ে নিন। স্বামীকে অভিভাবক মনে করুন।

২১. স্বামীর কাছে নিজেকে প্রকাশ করুন। স্বামীর কাছে কোনো কিছু লুকিয়ে রাখবেন না।

২২. স্বামীর সাথে পরামর্শ করে কাজ করুন।

২৩. স্বামীর রুচিমতো চলুন, কাজ করুন, রান্না করুন।

২৪. স্বামীর পিতা মাতাকে নিজের পিতা মাতার মতো শ্রদ্ধা করুন, সম্মান করুন, সম্ভব হলে সেবা করুন।

২৫. স্বামীর কৃতিত্ব ও অবদানের জন্যে গর্ববোধ করুন।

২৬. স্বামী বাইরে থেকে এলে হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানান। সাথে সাথে অভিযোগের ঝুড়ি খুলে দেবেন না।

২৭. কোনো ভুল বা অন্যায় করে ফেললে তা নিঃসঙ্কোচে স্বীকার করুন। সে জন্যে অনুতপ্ত হোন। প্রয়োজনে ক্ষমা চান।

২৮. স্বামীর আত্মীয় স্বজনকে সম্মান ও শ্রদ্ধা করুন। সামর্থ অনুযায়ী মেহমানদারী করুন।

২৯. সন্তানদের সামনে স্বামীর সাথে বিবাদ বিতর্ক করবেন না। অন্য কারো সামনেও নয়।

৩০. কারো সামনে স্বামীর অপসন্দনীয় আচরণ করবেন না।

৩১. স্বামীর সামর্থের অধিক টাকা পয়সা, অলংকার, পোশাক আসাক বা অন্য কিছু স্বামীর কাছে চাইবেন না।

৩২. সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সন্তান প্রতিপালনে যত্নবান হোন।

৩৩. নিজের হাত খরচা থেকে মাঝে মধ্যে স্বামীকে উপহার দিন।

৩৪. বিপদে আপদে স্বামীর পাশে দাঁড়ান। বিপদে অটল অবিচল থাকুন।

৩৫. স্বামীর অগোচরে স্বামীর অর্থ সম্পদ কাউকেও দেবেন না। তবে স্বামীর অনুমতি, অনুমোদন ও রেজামন্দির মধ্যে থেকে দান খয়রাত করুন।

৩৬. স্বামীর অনুমতি ছাড়া চাকুরি নেবেন না, করবেন না।

৩৭. কখনো স্বামীকে ছোট ও অপমানিত করবেন না।

৩৮. সর্বাবস্থায় স্বামীর সংসারের হাল ধরে রাখুন।

৩৯. রুচিশীল ও রুচিবান হোন।

৪০. শরীরিক ও মানসিকভাবে পবিত্র থাকুন। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকুন। ঘরদোর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন।

৪১. স্বামীর মেজাজের প্রতি লক্ষ্য রেখে তার সাথে আচরণ করুন। অনুযোগ থাকলে সময় বুঝে করুন। অভিমান করলে অভিমানের ভেতর ভালোবাসা প্রকাশ করুন।

৪২. ভালো কাজ করা, ভালো পথে চলা, সুন্দর জীবন যাপন করা এবং আল্লাহর হুকুম পালন করার ব্যাপারে স্বামীকে উৎসাহ দিন, অনুপ্রাণিত করুন।

৪৩. নিজেকে উন্নত করুন। স্বামীর সাথে খাপ খাইয়ে চলুন।

৪৪. স্বামীর চাকুরি, ব্যবসা, দায়িত্ব ও ব্যস্ততা সম্পর্কে খবর রাখুন। সামর্থ মতো স্বামীর সাহায্য করুন।

৪৫. স্বামীর কাছে নিজেকে কল্যাণময়, উপকারী ও অতুলনীয় করে তুলুন।

একবার এক মহিয়সীকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল ঃ তিনি কে, যার ভুল ধরলে বিতর্ক বাধে, বাঁকা হলে সোজা করতে ভেঙ্গে যায়, ব্যবহার করতে কাঁচের মতো যত্ন করে রত্নের মতো রাখতে হয়?

মহিয়সী জবাব দিলেন ঃ স্ত্রী।

–আপনি কিন্তু সে রকম হবেন না।

১৫. শিক্ষকের সৌন্দর্য

শিক্ষকরা মানব সমাজের পথপ্রদর্শক। কোনো জাতির শিক্ষকরা সে জাতির মানসিক ও নৈতিক ভিত রচনাকারী। শিক্ষা যদি হয় জাতির মেরুদণ্ড, তবে শিক্ষকরা জাতির মস্তিষ্ক। মস্তিষ্ক যদি হয় সুস্থ ও বিকশিত, তবে গোটা দেহের সমস্ত কর্মকাণ্ডই হয়ে থাকে সুন্দর সুশোভিত। অপরদিকে মস্তিষ্ক যদি হয় অপুষ্ট, অসুস্থ, বিকৃত, তবে গোটা দেহের সমস্ত কর্মকাণ্ডই হয়ে থাকে বিকৃত ধিকৃত।

ইসলামের দৃষ্টিতে মানব জীবনের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো শিক্ষা। প্রকৃত পক্ষে জ্ঞান ও শিক্ষা ছাড়া মুসলিম হিসেবেই জীবন যাপন করা যায় না। বিশ্বনবী (স) বলেছেন, যিনি মানুষকে সত্য সুন্দর ও কল্যাণের শিক্ষা দান করেন, সৃষ্টি কূলের সবকিছু তার জন্যে স্রষ্টার দরবারে ক্ষমা ও করুণার প্রার্থনা জানাতে থাকে।

মূলত শিক্ষকরাই জাতির সর্বাধিক শ্রদ্ধার পাত্র, সর্বাধিক সম্মানের পাত্র। তাঁরা মহামান্য, তাঁরা মহাগণ্য। ইসলামের শিক্ষকরাই বিশ্বময় ইসলামের আলো ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁরাই বিশ্বকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পথ প্রদর্শন করেছেন, সভ্যতার সৌন্দর্য বিলিয়েছেন।

সক্রেটিশ, প্লেটো ও এরিস্টোটলের মতো শিক্ষকরাই ইউরোপীয় সভ্যতার উদ্যোক্তা। বুদ্ধ ও কনফুসিয়াস প্রমুখ শিক্ষকগণই প্রাচীন প্রাচ্য সভ্যতার ভিত রচনাকারী।

আপনি ছোট বড় যে প্রতিষ্ঠানেই শিক্ষকতা করুন না কেন, নিজেকে শ্রেষ্ঠ শিক্ষক হিসেবে প্রমাণিত করুন। আপনি আদর্শ শিক্ষক হোন, প্রিয় শিক্ষক হোন। আপনি হোন সেইসব শিক্ষকের একজন, যারা সত্য ও সুন্দরের জ্যোতি ছড়িয়েছেন, যারা মানব সন্তানদের সৃষ্টির সেরা মানুষ রূপে গড়ে তুলেছেন। এটাই শিক্ষকের সৌন্দর্য। কিন্তু কেমন করে হবেন আপনি সেই সুন্দর শিক্ষক ?

১. শিক্ষকতাকে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করুন। এ উদ্দেশ্য অর্জনের জন্যে মনস্থির করুন এবং মনকে অবিচল রাখুন।

২. শিক্ষকতাকে ইবাদত হিসেবে গ্রহণ করুন।

৩. নিজেকে সত্য সুন্দর ও কল্যাণের পথপ্রদর্শক মনে করুন।

৪. নিজের পেশা ও বিষয়গত জ্ঞানকে সমৃদ্ধ করুন।

৫. পেশাগত বুঝ ও ধারণাকে স্বচ্ছ ও স্পষ্ট করুন।

৬. পেশাগত দক্ষতা অর্জন ও উন্নয়ন করুন।

৭. প্রশিক্ষণ নিন।

৮. শিক্ষার্থীদের ভালোবাসুন, আদর করুন, শাসনও করুন।

৯. শিক্ষার্থীদের ঈমান, আকীদা, বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা ও দৃষ্টিভংগিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং উন্নত ও মজবুত করুন।

১০. জ্ঞান দানের সাথে সাথে শিক্ষার্থীদের সুন্দর চরিত্র, শিষ্টাচার ও মার্জিত রুচির অধিকারী করে গড়ে তুলুন।

১১. শিক্ষার্থীদের পার্থিব কল্যাণ ও উন্নতির পথ দেখাবার সাথে সাথে পরকালীন মুক্তি ও সাফল্যের পথও প্রদর্শন করুন।

১২. শিক্ষার্থী এবং তাদের অভিভাবকদের বুঝতে দিন যে, আপনি তাদের পরম কল্যাণাকাংখী।

১৩. শিক্ষার্থীদের মানসিক, আত্মিক ও দৈহিক উন্নতি বিকাশ ও সুস্থতার প্রতি সমান গুরুত্বারোপ করুন।

১৪. আপনি পুরুষ শিক্ষক হয়ে থাকলে ছাত্র ছাত্রীর পিতার এবং মহিলা শিক্ষক হলে ছাত্র ছাত্রীর মাতার ভূমিকা পালন করুন।

১৫. নিজেকে শুধু ক্লাশের শিক্ষক মনে করবেন না, বরং ছাত্র ছাত্রীদের সার্বক্ষণিক এবং পূর্ণাংগ শিক্ষক মনে করুন।

১৬. পড়াবার আগে নিজে হোম ওয়ার্ক করুন। পূর্নাংগ প্রস্তুতিসহ পড়ান এবং পাঠদান করুন।

১৭. পড়া দিন, পড়া নিন এবং ছাত্রছাত্রীদের সহযোগিতা করুন।

১৮. নিজেকে সুস্থ, পরিপক্ক, ব্যক্তিত্ববান ও প্রিয় শিক্ষক/শিক্ষিকা হিসাবে গড়ে তুলুন।

১৯. মনে রাখবেন, নিজের মধ্যে জ্ঞানগত, পেশাগত, নৈতিক ও চারিত্রিক দুর্বলতা লালন করে বিশেষ করে নৈতিক চারিত্রিক দুর্বলতা লালন করে কিছুতেই শিক্ষকের মর্যাদা রক্ষা করা যায় না।

২০. নিজেকে জ্ঞান, প্রজ্ঞা এবং নীতি ও আদর্শের মডেল হিসেবে পেশ করুন।

২১. নিজের রুচি প্রকৃতি, মেজাজ, আচার ব্যবহার, চরিত্র ও শিষ্টাচারকে সুন্দর, পরিচ্ছন্ন ও অনুকরণীয় করে পেশ করুন।

২২. নিজেকে সুনাগরিক গড়ার কার্যকর ব্যক্তিত্বে পরিণত করুন। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে সুনাগরিক গড়ার কারখানা বানান।

২৩. নিজেকে কেন্দ্র করে ছাত্রদের জন্যে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আদর্শ চর্চার এক সুন্দর ও মোহময় পরিবেশ গড়ে তুলুন।

২৪. সততা, শৃংখলা ও সৌন্দর্য প্রিয়তার ভুষণে নিজেকে ভূষিত করুন। অনাড়ম্বর জীবন যাপন করুন।

২৫. ধৈর্য, সহনশীলতা, সাহস, দৃঢ়তা, সেবা, সহানুভূতি, নিয়মানুবর্তিতা, সময়ানুবর্তিতা, উদারতা, মহানুভবতা, ত্যাগ, তিতীক্ষা, বিনয়, বিবেক-বিবেচনা, নিষ্ঠা, নিঃস্বার্থপরতা প্রভৃতি মহত গুণাবলীতে নিজেকে সুসজ্জিত করে রাখুন।–(রচনাকাল ঃ ১৯৯৫)

১৩

সবার সেরা ব্যক্তিত্ব সবার প্রিয় নেতৃত্ব

মানবতার মুক্তিদূত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (স) শুধু বিশ্বনবীই ছিলেন না, বরং সেই সাথে তিনি ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বিশ্বনেতা। জীবনের সকল দিকে তিনি ছিলেন সর্বগুণে সুন্দরতম। তাঁর নেতৃত্ব ছিলো সহজাত, ব্যক্তিত্ব ছিলো বরেণ্য আর আচার-আচরণ ছিলো অনন্য অনুপম। নবুয়্যত ও রিসালাত তাঁর সহজাত মানবিক গুণাবলীকে পূর্ণতা ও পরমত্ব দান করে। পরম সুন্দর পরিপাটি অবয়ব, শুদ্ধতম স্বভাব-প্রকৃতি আর অহর্নির্শির অমিয় বাণী তাঁর ব্যক্তিত্ব ও নেতৃত্বকে সমুদ্ভাসিত করে দেয় বিশ্বময়।

এখানে আমরা তাঁর জীবনের কিছু ছবি আঁকতে চাই। সমগ্র জীবনের অখণ্ডতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে এখানে তুলে আনবো কয়েকটি মাত্র ছবি। যেমন সমুদ্রের তলদেশে অবিরল ধারায় ছড়িয়ে থাকা মুক্তার মধ্য থেকে ডুবুরি তুলে আনে ক'টি মাত্র মোতি। মহানবীর জীবন ধারার অতি তুচ্ছ ঘটনাও তাঁকে মহিমণ্ডিত করে তুলেছে। এখানে আমরা তাঁর জীবনের কিছু মাইক্রো পর্যায়ের ছবি আঁকবো, কিছু তুচ্ছ ঘটনা বলবো, আর তাতেই বুঝবো, কিভাবে আমরা তাঁকে অনুসরণ করে জীবনের সুন্দরতম পথে চলবো।

১. চাঁদের চেয়েও সুন্দর তিনি

প্রিয় নবীর সাহাবী জাবির ইবনে সামুরা (রা) বলেন ঃ এক পূর্ণিমা রাতে আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর পবিত্র মুখমণ্ডল অবলোকন করছিলাম। একবার আমি তাকাচ্ছিলাম আকাশের পূর্ণিমা চাঁদের দিকে, আবার তাঁর মুখমণ্ডলের দিকে। আমি যতোই তাকাচ্ছিলাম, ততোই আমার কাছে প্রতিভাত হয়ে উঠছিলো, তাঁর মুখমণ্ডল পূর্ণিমা চাঁদের চেয়েও প্রদীপ্ত।-(তিরমিযি, দারেমী)

বারা ইবনে আযিব (রা) বলেন, উত্তম দামি পোশাক পরিহিত অনেক সৌখিন লোক আমি দেখেছি, কিন্তু নবী করীম (স)-এর চাইতে আকর্ষণীয় ও ব্যক্তিত্ব ব্যঞ্জক চেহারার কোনো লোক আমি দেখিনি।-(সহীহ মুসলিম)

আলী (রা) বলেন, নবী করীম (স) লম্বাও ছিলেন না, বেঁটেও ছিলেন না। হাত পায়ের তালু এবং আংগুলগুলো ছিলো মাংশল। মাথা বড়, মোটা গ্রন্থি এবং লোমের একটি সরু রেখা বক্ষ থেকে নাভি পর্যন্ত প্রলম্বিত ছিলো। পথ

চলার সময় মাথা ঝুঁকিয়ে দ্রুত হাটতেন, যেনো উঁচুস্থান থেকে নিচের দিকে নামছেন।–(শামায়েলে তিরমিযি)

হিজরতের সময়কার কথা। রসূল (স) সুর পর্বতের গুহায় কয়েকদিন কাটাবার পর মদিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করেন। পথিমধ্যে খুযায়া গোত্রের উম্মে মা'বাদ নাম্নী এক মহিয়সী মহিলার বাড়িতে যাত্রা বিরতি করেন। পথিক মেহমানদের সেবা করার জন্যে এই মহিলার খুবই সুনাম ছিলো। মহিলা রসূল (স)-কে চিনতেন না। রসূল (স)-এর বরকতে মহিলার ছাগলের শুকনো উলানে দুধের প্রাচুর্য দেখা দেয়। যাত্রা বিরতির পর রসূল (স) তাঁর সাথিদের নিয়ে মহিলার বাড়ি ত্যাগ করেন। এরি মধ্যে তার স্বামী বাড়ি ফিরে এসে ছাগলের শুকনো উলানে দুধের প্রাচুর্য দেখতে পান। বৃদ্ধা তার স্বামীকে জীবনের সর্বোত্তম এই মেহমানের আগমনের কথা এবং সংঘটিত অলৌকিক ঘটনাবলীর কথা বর্ণনা দেন। তার স্বামী এই মেহমান সম্পর্কে কৌতুহলী হয়ে উঠেন। এই মেহমান সেই প্রতিশ্রুত নবী বলে তার ধারণা হয়। তিনি স্ত্রীর কাছে মেহমানের অবয়ব ও স্বভাব প্রকৃতির ধরন জানতে চান। বৃদ্ধা ময়িসী উম্মে মা'বাদ অপরিচিত মেহমান সম্পর্কে যে নিরপেক্ষ বর্ণনা তার স্বামীকে দিয়েছিলেন, তাতে রসূল (স)-এর প্রকৃত সৌন্দর্য ও ব্যক্তিত্ব পরিস্ফুট হয়ে উঠে ঃ

"তাঁর মুখমণ্ডল প্রশস্ত ও অতি পবিত্র। প্রিয় স্বভাব। মাথায় টাক নেই। দারুন সুদর্শন, সুন্দর। কালো ডাগর ডাগর চোখ। লম্বা ঘন চুল। ব্যক্তিত্ব ব্যঞ্জক কণ্ঠস্বর। ঘাড় উঁচু। চোখ যেনো সুরমা যুক্ত। চিকন ও জোড়া ভ্রু। কালো কোকড়ানো চুল। নীরব স্বভাব। আন্তরিক। দূর থেকে দেখলে সুন্দর ও চিত্তাকর্ষক। কাছে থেকে দেখলে সুন্দর মাধুর্যময়। মিষ্টভাষী। স্পষ্টভাষী। নিষ্প্রয়োজনে কথা বলেন না। তাঁর সবগুলো কথা মুক্তার মালার মতো সুগ্রথিত। মধ্যম ধরনের লম্বা, ফলে কেউ তাকে তাচ্ছিল্য করতে পারবে না। চেহারায় তাঁর চমক ও তারুন্য টগবগ করে। সর্বক্ষণ সাহচার্যদানকারীদের প্রিয়জন। যখন কথা বলেন, সবাই তা নীরবে শুনে। যখন আদেশ করেন, তৎক্ষণাৎ সবাই তা পালনে ছুটে যায়। সকলের সেবা লাভকারী, আনুগত্য লাভকারী। একেবারে মিতভাষীও নয়, অমিতভাষীও নয়।"–(যাদুল মা'আদ)

ইহুদী পুরোহীত আবদুল্লাহ ইবনে সালাম রসূল (স)-এর সাথে কথা বলতে আসেন। তিনি রসূল (স)-এর চেহারার প্রতি তাকিয়েই বলে উঠেন ঃ

"আল্লাহর কসম ! এ চেহারা কোনো মিথ্যাবাদীর চেহারা হতে পারে না।–(তিরমিযি)

হ্যাঁ, এ হচ্ছে সেই মহাপুরুষের অবয়ব ও স্বভাব প্রকৃতির ছোট্ট একটি সুন্দরতম ছবি, যাকে বিশ্বজাহানের মালিক তাঁর আখেরী রসূল নিয়োগ করেছেন।

২. মহাপুরুষোচিত অসাধারণ ব্যক্তিত্ব

কিশোর বয়স থেকেই মহানবী (স)-এর মধ্যে মহাপুরুষোচিত ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠতে থাকে। মায়ের মৃত্যুর পর তিনি কুরাইশ নেতা দাদা আবদুল মুত্তালিবের তত্ত্বাবধানে দু' বছর লালিত পালিত হন।

বিভিন্ন ঐতিহাসিক সূত্রে জানা যায়, বিশাল ব্যক্তিত্বের কারণে আবদুল মুত্তালিবের সন্তান-সন্ততিদের কেউই তাঁর পাশে বসতো না। কিন্তু যে কোনো মজলিশে কিশোর মুহাম্মদ গিয়ে তাঁর পাশে বসতেন। খাবার সময় আবদুল মুত্তালিবের জন্যে আলাদা বিছানা বিছানো হতো। তাঁর সন্তানদের কেউই ঐ বিছানায় গিয়ে বসবার সাহস করতো না। কিশোর মুহাম্মদ আগেই গিয়ে ঐ বিছানায় বসতেন, পরে আবদুল মুত্তালিব এসে তাঁর পাশে বসতেন। তাঁর চাচাদের কেউ কেউ তাঁকে ঐ বিছানায় না বসতে বলতো। আবদুল মুত্তালিব শুনামাত্রই তাদের বারণ করেন। তিনি বলেন, 'ওকে বাধা দিও না, আমার এ বাছাধনের বড় শাহী ব্যক্তিত্ব।'

দাদার পর চাচা আবু তালিবের তত্ত্বাবধানে তিনি লালিত পালিত হন। আবু তালিব কিশোর মুহাম্মদের প্রতি ইংগিত করে তাঁর সন্তানদের বলতেন ঃ আমার এ বাছাধনের ব্যক্তিত্বে সর্দারির শোভা দেদীপ্যমান।

ইবনে জরীর তাবারী বলেছেন, কিশোর বয়স থেকেই মুহাম্মদ (স) কখনো গান বাজনার আসরে গিয়ে সেখানকার হালকা আমোদ স্ফুর্তিতে অংশ নেননি। এগুলোর প্রতি তাঁর কোনো আগ্রহই ছিলো না। কিশোর বেলায় দু'বার গানবাজনার আসরে যেতে চেয়েও অনাগ্রহ বশত পথেই ঘুমিয়ে পড়েন।

ছোট বেলা থেকেই তিনি কখনো মূর্তিপূজা করেননি। মূর্তিদের ধারে কাছেও যাননি। সেগুলোর প্রতি ভক্তি শ্রদ্ধাও প্রকাশ করেননি। এ ব্যাপারে তাঁকে কেউ পীড়াপীড়ি করতেও সাহস করেনি।

তৎকালীন জাহেলী আরবে কিশোর তরুণরা তো বটেই, বুড়োরাও উলংগ হতে ইতস্তত করতো না। ছেলে বুড়ো সকলেই উলংগ হয়ে কা'বা ঘর তাওয়াফ করতো। কিন্তু মুহাম্মদ (স) কিশোর বয়েস থেকেই কখনো উলংগ হননি। কা'বার নির্মাণ কাজে পাথর বহনের সময় তাঁর চাচা আব্বাস তাঁকে তহবন্দ খুলে কাঁধে নিয়ে তার উপর পাথর বহন করতে পীড়াপীড়ি করেন। তাঁর পীড়াপীড়িতে মুহাম্মদ (স) এ কাজ করতে উদ্যত হবার সাথে সাথেই ব্যক্তিত্বের

অবমানার লজ্জায় অজ্ঞান হয়ে পড়েন। এরপর আর কখনো কেউ তাঁকে এজন্যে পীড়াপীড়ি করেনি।

আবুল হাসান আল মাওয়ার্দী তাঁর 'ইলামুন নবুয়্যত' গ্রন্থে নবুয়্যতের মক্কী যুগের একটি ঘটনা উল্লেখ করেন। ঘটনা হলো, আবু জাহল একটি এতীম বালকের ধন সম্পদের তত্ত্বাবধায়ক ছিলো। কিন্তু সে বালকটিকে তার পিতার রেখে যাওয়া অর্থ সম্পদ থেকে বঞ্চিত করছিলো। একদিন বালকটি আবু জাহলের কাছে এসে তার পিতার রেখে যাওয়া অর্থ সম্পদ থেকে তাকে কিছু দিতে বললো। কিন্তু আবু জাহল তার প্রতি ফিরেও তাকায়নি। নিরাশ হয়ে ছেলেটি ফিরে গেলো। কা'বার কাছে বসে থাকা কুরাইশ সর্দাররা মজা দেখার জন্যে ছেলেটিকে দুষ্টামি করে বললো, ঐ যে মুহাম্মদ বসে আছে, তার কাছে গিয়ে নালিশ করো, সে তোমার অর্থ আদায় করে দিতে পারবে। আবু জাহল যে মুহাম্মদ (স)-এর সাথে ঘোরতর শত্রুতা পোষণ করতো—ছেলেটি এর কিছুই জানতো না। সে সোজা মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে গিয়ে নালিশ করলো। ছেলেটির প্রতি যুলমের কাহিনী শুনে তিনি উঠে দাঁড়ালেন এবং ছেলেটিকে নিয়ে সোজা আবু জাহলের বাড়ি চলে এলেন। আবু জাহল রসূল (স)-কে দেখে ঘাবড়ে গেলো। সে তাঁকে সাদরে গ্রহণ করলো। রসূল (স) তাকে বললেন ঃ 'এ বালকটির পাওনা দিয়ে দাও।' আবু জাহল বিনা বাক্য ব্যয়ে বালকটির দাবি অনুযায়ী তাকে প্রয়োজনীয় অর্থ দিয়ে দিলো।

ওদিকে আজ কি ঘটে তা দেখার জন্যে কুরাইশ সর্দাররা অতি ঔৎসক্যের সাথে অপেক্ষা করছিল। কিন্তু তাদের কল্পনার বাইরে যা ঘটেছে তা দেখার পর তারা আবু জাহলকে চরম নিন্দা ও তিরস্কার করতে থাকলো। তারা বললো ঃ তুমি কি তোমার ধর্ম ত্যাগ করলে ?

আবু জাহল বললো, আমি মুহাম্মদের ডানে বাঁয়ে মারাত্মক অস্ত্র আছে বলে অনুভব করেছি, তার কথা অমান্য করলেই সে আমাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলবে। সে জন্যেই তার কথামতো ছেলেটির অর্থ দিয়ে দিলাম।

ঐতিহাসিক ইবনে ইসহাক আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। ঘটনাটি হলো ঃ একবার এক ব্যক্তি কিছু উট বিক্রি করার জন্যে মক্কায় নিয়ে এলো। আবু জাহল তার উটগুলো কিনে নিলো। কিন্তু মূল্য পরিশোধ করতে টালবাহানা করতে থাকলো। লোকটি পাওনা আদায়ের জন্যে প্রতিদিন আবু জাহলের বাড়ি যায়, কিন্তু সে লোকটির প্রতি ভ্রুক্ষেপও করে না। অবশেষে উট বিক্রেতা নিরাশ হয়ে একদিন কা'বার চত্বরে সমবেত কুরাইশ সর্দারদের কাছে গিয়ে ফরিয়াদ করলো। এ সময় চত্বরের এক কোণে রসূল (স) বসা ছিলেন। কুরাইশ সর্দাররা

লোকটিকে বললো ঃ আমরা তোমার কোনো সাহায্য করতে পারবো না। তারা রসূলুল্লাহ (স)-এর দিকে ইংগিত করে বললো, ঐ যে এক ব্যক্তি বসে আছে, তার কাছে গিয়ে বলো, সে তোমার পাওনা আদায় করে দিতে পারবে।

লোকটি রসূল (স)-এর দিকে রওয়ানা করলো। এদিকে কুরাইশ নেতারা পরস্পর বলাবলি করতে থাকলো, আজ মজা দেখা যাবে। লোকটি এসে মুহাম্মদ (স)-এর কাছে তার প্রতি আবু জাহলের যুলমের কথা বর্ণনা করে তার পাওনা আদায় করে দেয়ার জন্য ফরিয়াদ করলো।

লোকটির প্রতি আবু জাহলের যুলমের করুণ কাহিনী শুনামাত্র রসূলুল্লাহ (স) উঠে দাঁড়ালেন এবং লোকটিকে সাথে নিয়ে সোজা আবু জাহলের বাড়ি এসে নিজেই তার দরজার কড়া নাড়লেন। ভেতর থেকে আবু জাহল জিজ্ঞেস করলো ঃ কে ? জবাব দিলেন ঃ 'আমি মুহাম্মদ।' জবাব শুনা মাত্রই আবু জাহল হতবুদ্ধি হয়ে দরজা খুলে বাইরে এলো। রসূলুল্লাহ (স) বললেন, এখনই এ ব্যক্তির পাওনা পরিশোধ করে দাও। আবু জাহল টু-শব্দটিও না করে সোজা ভেতরে গিয়ে উটের মূল্য এনে লোকটির হাতে দিয়ে দিলো।

এদিকে কা'বার চত্বরে বসে থাকা কুরাইশ সর্দাররা অবস্থা পর্যবেক্ষণ করার জন্যে পিছে পিছে একজন গুপ্তচর পাঠায়। সে দ্রুতপদে ফিরে এসে সর্দারদের কাছে সব ঘটনা খুলে বললো। সে বললো ঃ আল্লাহর কসম ! আজ যা দেখলাম, তা রীতিমতো তাজ্জবের ব্যাপার। মুহাম্মদ গিয়ে কড়া নাড়ার সাথে সাথে আবু জাহল বেরিয়ে আসে। মুহাম্মদের সামনে সে ভীত বিবর্ণ হয়ে পড়েছিলো। মুহাম্মদ যখন বললো ঃ 'ওর পাওনা পরিশোধ করে দাও', তখন আবু জাহলের দেহ যেনো নিথর হয়ে পড়ছিল। সে বিনাবাক্য ব্যয়ে সাথে সাথে মুহাম্মদের হুকুম তামিল করেছে।'

এ ঘটনাগুলো থেকেই রসূলুল্লাহ (স)-এর মহাপুরুষোচিত বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের বিরাটত্ব পরিষ্কার হয়ে যায়। তাঁর ব্যক্তিত্বের সামনে তাঁর জানের দুশমনও ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়তো। অসাধারণ মানবীয় গুণাবলী আর নৈতিক পবিত্রতা তাঁর ব্যক্তিত্বকে এতোটা বলিষ্ঠ করে তুলেছিল। তাঁর ব্যক্তিত্বের পরিচয়বহ অসংখ্য ঘটনাবলী হাদীস ও সীরাত গ্রন্থাবলীতে লিপিবদ্ধ রয়েছে।

৩. কোমল হৃদয় দয়ার সাগর

বিরাট মহাপুরুষোচিত ব্যক্তিত্বের পাশাপাশি মহানবী (সা)-এর হৃদয়-মন ছিলো অত্যন্ত কোমল। প্রিয় নবী (সা)-এর সাহাবী হযরত আলী, হিন্দ বিন আবি হালা, বারা বিন আযিব প্রমুখ রা. তাঁর ব্যক্তিত্বের যে বর্ণনা দিয়ে গেছেন, তা থেকে জানা যায়, প্রথমবার কেউ তাঁকে দেখলে বিস্মিত ও হতভম্ব হয়ে

যেতো। কোনো ব্যক্তি কথাবার্তা, ওঠাবসা ও চলাফেরার মাধ্যমে তাঁর নিকটবর্তী হলে সে তাঁর প্রতি চুম্বকের মতো আকৃষ্ট হয়ে পড়তো এবং সে হৃদয় উজাড় করে তাঁকে ভালোবাসতো। আর যে ব্যক্তি তাঁর সাথে শত্রুতা পোষণ করতো সে ব্যক্তির কাছে তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিলো আতঙ্ক ও ভীতি সঞ্চারকারী।

আসলে তাঁর মধ্যে ছিলো বিশ্বনেতা হবার মতো অনবদ্য ব্যক্তিত্ব আর তাঁর হৃদয়-মন ছিলো মানবতার প্রতি করুণাসিক্ত। হাদীস ও সীরাত গ্রন্থাবলীতে তাঁর স্বভাব-প্রকৃতি ও চরিত্র বৈশিষ্ট্য বর্ণিত হয়েছে। সেগুলো অধ্যয়ন করলে দেখা যায় ঃ

–তিনি ছিলেন মানবতার বন্ধু। মানুষের সর্বাধিক কল্যাণাকাংখী মহাপুরুষ।

–আল্লাহর ভয়ে তিনি ভীত থাকতেন।

–নামাযে কাঁদতেন, তাঁর কান্নার গুম গুম্ শব্দ অন্যরা শুনতে পেতো।

–অন্যদের কুরআন পড়া শুনলে তাঁর হৃদয় মোমের মতো গলে যেতো, তাঁর চক্ষুদ্বয় অশ্রু প্লাবিত হয়ে পড়তো।

–মানুষের কল্যাণ চিন্তায় তিনি সবসময় পেরেশান থাকতেন।

–লোকেরা ঈমানের পথে না এসে ধ্বংসের পথে অটল থাকছে দেখে তাদের মুক্তির জন্যে তিনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়তেন।

–মানুষের ক্ষতি ও কষ্ট দেখলে তাঁর হৃদয় কেঁদে উঠতো। মানুষের দুঃখ-কষ্টে তিনি তাদের পাশে দাঁড়াতেন।

–তিনি মানুষের দোষ ত্রুটি ক্ষমা করে দিতেন।

–তাঁকে যারা কষ্ট দিয়েছে তাদের সকলকে তিনি ক্ষমা করে দিয়েছেন। মক্কা বিজয়ের সময় সব শত্রুদের মাফ করে দিয়েছেন।

–তিনি নিজের জন্যে কারো কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেননি।

–তাঁর জানের দুশমনও পীড়িত হলে, তিনি তাকে দেখতে যেতেন।

–মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ ইবনে উব্বাই তাঁর মনে চরম কষ্ট দেয়া সত্ত্বেও তিনি তার জানাযা পড়াতে এবং তার জন্যে দু'আ করতে কুণ্ঠিত হননি।

–কুরআন তাঁকে 'রাহমাতুল লিল আলামীন' বা 'জগতবাসীর জন্যে রহমত' বলে আখ্যায়িত করেছে।

–তাঁর সম্পর্কে কুরআন আরো বলে ঃ

"তোমাদের মধ্য থেকেই তোমাদের কাছে একজন রসূল এসেছে, তোমাদের ক্ষতি ও দুঃ-কষ্ট তার মনকে ব্যথিত করে তোলে। সে তোমাদের পরম কল্যাণাকাংখী। সে মুমিনদের প্রতি রাউফুর রাহীম–অতি স্নেহশীল ও পরম করুণাসিক্ত।"–(সূরা আত তাওবা ঃ ১২৮)

প্রকৃতই তিনি ছিলেন পরম কোমল হৃদয়ের অধিকারী, দয়ার সাগর আর মানুষের অতি উপকারী বন্ধু।

৪. বীরত্বের প্রতীক বীর শ্রেষ্ঠ বীর

বিশ্বনেতা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (স) কেবল কোমল হৃদয়ের অধিকারীই ছিলেন না, সেই সাথে তিনি ছিলেন বীর বাহাদুর, বীর বিক্রম, দূরন্ত সাহসী, বীর শ্রেষ্ঠবীর, বীরত্বের প্রতীক।

তাঁর একান্ত সাথি ও খাদিম আনাস (রা) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (স) ছিলেন মানুষের মাঝে সর্বশ্রেষ্ঠ সাহসী বীর বাহাদুর-(সহীহ বুখারি)

উহুদ যুদ্ধের পর ইহুদীরা রসূল (সা)-কে হত্যা এবং মুসলমানদের উপর আক্রমণ করার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছিল। এ সময় সাহাবাগণ তাঁদের প্রিয় নেতার হিফাযতে এবং মদিনার প্রতিরক্ষায় সতর্ক থাকতেন। একদিন গভীর রাত্রে মদীনার কোনো এক প্রান্তের দিকে হৈ হল্লোড় শুনা গেলো। সাহাবাগণ হৈ হল্লোড় শুনামাত্রই রণ প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন এবং অল্প কিছুক্ষণের মধ্যেই তাঁরা সেদিকে রওয়ানা করলেন। তারা মাঝপথে গিয়ে দেখলেন, বিশ্বনবী একা সেদিক থেকে ঘোড়া হাকিয়ে ফিরে আসছেন। সাহাবাদের দেখে তিনি বললেন, ফিরে চলো, কেউ আক্রমণ করেনি, আমি মদীনার চারপাশ চক্কর দিয়ে এসেছি। ওদিকে কিছু লোক নিজেরা নিজেরা ঝগড়া লেগেছিল।

পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো নেতার মধ্যে এমন বীরত্বের নযীর বিরল।

উহুদ যুদ্ধে কাফির সৈন্যরা পেছন দিক থেকে অতর্কিত আক্রমণ করে মুসলিম বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দেয়। অন্যদিকে নবী করীম (সা) নিহত হয়েছেন বলে গুজব ছড়িয়ে দেয়। লোকেরা পেছন থেকে আকস্মিক আক্রমণে এবং নবীর নিহত হবার সংবাদে এদিক সেদিক ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ে। কিন্তু বিশ্বনবী নির্ভীক চিত্তে ময়দানে অটল থেকে মোকাবেলা করেন। অতপর তাঁকে কেন্দ্র করে লোকেরা জড়ো হতে থাকে।

হুনায়েনের যুদ্ধেও একই অবস্থা ঘটে। মুসলমানদের অগ্রবাহিনীর পিছে হটা দেখে গোটা সেনাবাহিনী ছত্রভংগ হয়ে গেলো। গোটা বাহিনী ময়দান ত্যাগ করতে শুরু করলো। ময়দানে দৃঢ়তার সাথে দাঁড়িয়ে রইলেন একা একজন। তিনি বিশ্বনেতা বিশ্বনবী মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা)। ময়দানে দাঁড়িয়ে তিনি অসীম সাহসের সাথে নিজের পরিচয়ও শত্রুদের জানিয়ে দিতে থাকলেন। বলতে থাকলেন ঃ

"মিথ্যা কভু নয় আমি নবী সত্য,
আমি আবদুল মত্তালিবের পৌত্র।"

এভাবে একদিকে তিনি নিজের পরিচয় দিতে থাকলেন আর অপরদিকে আনসার, মুহাজির ও বৃক্ষতলে শপথ গ্রহণকারীদের ডেকে ডেকে জড়ো করতে থাকলেন। শুরু করলেন পাল্টা আক্রমণ। যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেলো। বিজয় পদচুম্বন করলো মুসলিম বাহিনীর।

একবার এক যুদ্ধ থেকে ফেরার সময় পথিমধ্যে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। ঘুমন্ত অবস্থায় এক শত্রু এসে তাঁর গর্দানের উপর কোষমুক্ত তরবারি উদ্যত করে বললো ঃ মুহাম্মদ ! এবার আমার হাত থেকে তোমায় কে রক্ষা করবে ?

সজাগ হয়েই তিনি উদ্যত তলোয়ারের দিকে তাকালেন। তারপর শত্রুকে লক্ষ্য করে বীর শ্রেষ্ঠ বীর নির্ভীক চিত্তে বলে উঠলেন ঃ আল্লাহই আমাকে রক্ষা করবেন।

হিজরতের সময় সওর পবর্তের গুহায় তিন দিন তিনি আত্মগোপন করে ছিলেন। শত্রুরা তাঁকে হত্যা করার জন্যে খোঁজাখুঁজি করতে করতে একেবারে গুহার মুখের কাছে এসে পড়েছিল। সাথি আবু বকর (রা) রসূলের নিরাপত্তার চিন্তায় অস্থির ও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। কিন্তু তিনি নির্ভীক, প্রশান্ত ও দৃঢ়চিত্ত। জীবন মরণের এ সন্ধিক্ষণেও তাঁর মধ্যে কোনো প্রকার উদ্বিগ্নতা নেই। দৃঢ় নির্ভীক কণ্ঠে আবু বকরকে বললেন ঃ 'দুশ্চিন্তা করো না, আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন। তিনিই আমাদের সাহায্য করবেন।'

৫. ধৈর্য ও দৃঢ়তার পাহাড়

বিশ্বনবী (স) ছিলেন ধৈর্যের পাহাড়। আর ধৈর্যেরই অপরনাম দৃঢ়তা। তাঁর চরিত্রের এক সমুজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য ছিলো এই ধৈর্য ও দৃঢ়তা।

তিনি সর্বপ্রকার বিপদে আপদে ধৈর্য ধারণ করতেন। বিপদ মুসিবত, দুঃখ কষ্ট, অত্যাচার নির্যাতন, ক্ষুধা দারিদ্র, অভাব অনটন, মানুষের দেয়া জ্বালা যন্ত্রণা —সবই তিনি অকাতরে সইতে পারতেন। কোনো কিছুই তাঁর ধৈর্যের বাঁধ ভাংতে পারতো না। কোনো কিছুই তাঁর মহাপুরুষোচিত ব্যক্তিত্বকে অস্থির করতে পারতো না, পারতো না টলাতে। যেনো বিপদ মুসিবতের সমস্ত কালো মেঘ আর ঝড় ঝঞ্ঝা তাঁর হিমাদ্রিসম ব্যক্তিত্বের বহিরাংগে ভীষণ রকম ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়তো বহুদূরে।

ছেলেবেলা থেকেই রসূল (সা)-এর মধ্যে ধৈর্য গুণের বিকাশ ঘটতে থাকে। এতীম অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেন। শৈশবেই মাকে হারান, দাদাকে হারান। ছোটবেলা থেকেই কঠিন পরিশ্রম করে উপার্জন করতে শেখেন। তাঁর জীবনের সূচনাই হয় ধৈর্য অবলম্বন দিয়ে।

ইসলাম প্রচারের কাজ প্রকাশ্যে আরম্ভ করার পর থেকে শুরু হয় বিরোধিতা। সে বিরোধিতা নানা রকমের, নানা রঙের, নানান ঢং-এর। প্রথম শুরু হয় মৌখিক বিরোধীতা। সে বিরোধিতার বর্ণ বৈচিত্র বিস্ময়কর।

নিজের রক্তমাংস আর সমস্ত চেতনা ও উপলব্ধি দিয়ে এক মহাসত্যকে তিনি গ্রহণ করেছেন। মানুষের সাধারণ জ্ঞান, বিবেক বিবেচনা ও যুক্তি বুদ্ধি এ মহাসত্যকে কিছুতেই অস্বীকার করতে পারে না। তিনি সেই মহাসত্যের দিকে তাঁর জাতিকে ডাকছেন। ডাকছেন হৃদয়ের সমস্ত মমত্ব উজাড় করে। কিন্তু তারা তা মানতে অস্বীকার করছে, এর প্রতি ঠাট্টা বিদ্রুপ করছে, এ মহাসত্যকে মিথ্যা বলছে, পাগলামী বলে প্রচার করছে, জ্বিন-ভূতের আছর বলে উড়িয়ে দিচ্ছে।

কিন্তু তিনি অস্থির হন না, অধৈর্য হন না, তাদের সাথে বিবাদে লিপ্ত হন না, রাগে ফেঠে পড়েন না। পরম ধৈর্যের সাথে দাওয়াত ও আহ্বানের কাজ অবিরাম চালিয়ে যান।

তারা তাঁকে কবিয়াল বলছে, গণক বলছে, যাদুকর বলছে। তিনি তাদের যুক্তি দিয়ে কোমল ভাষায় বুঝিয়ে বলেন, আমি এসব কিছুই নই। আমি আল্লাহর রসূল। তোমরা আমার কথা মেনে নাও, সাফল্য ও বিজয় তোমাদের পদচুম্বন করবে।

তারা আরো বাড়াবাড়ি করতে থাকে। তিনি যেখানেই গিয়ে মানুষকে দাওয়াত দিতে শুরু করেন, আল্লাহর অবতীর্ণ বাণী শুনাতে আরম্ভ করেন, সেখানেই তারা তাঁর পিছে পিছে যায়। মানুষকে বলে-এর কথা শুনোনা, এ পাগল, এ ধর্মত্যাগী। ছেলে পেলেদের তাঁর পিছে লেলিয়ে দেয়, তিনি মানুষকে আল্লাহর বাণী শোনাতে গেলেই তারা হৈ হট্টগোল শুরু করে দেয়। তিনি ধৈর্য ধারণ করেন। নিজের কাজ অব্যাহত রাখেন।

তারা আরো বাড়া বাড়ি করতে থাকে। তারা তাঁর প্রতি দৈহিক নির্যাতনের পথে অগ্রসর হয়। তিনি যেদিকেই যান তাঁর প্রতি ঢিল ছুড়তে থাকে। তাঁকে ক্ষত বিক্ষত করে দেয়। তিনি সালাতের সিজদায় গেলে উটের নাড়িভুড়ি এনে তাঁর ঘাড়ে চাপা দিয়ে রাখে। তাঁর গলায় চাদর পেঁচিয়ে তাঁকে মারার চেষ্টা করে।—তিনি তাঁর মহাসত্যের কাজে অটল অবিচল থাকেন। পরম ধৈর্যের সাথে কাজ চালিয়ে যান।

তাদের বাড়াবাড়ির মাত্রা বৃদ্ধি পেতে থাকে। তাঁরা তাঁর সংগি সাথি নারী পুরুষদের উপর অত্যাচার নির্যাতন শুরু করে দেয়। দুর্বলদের উপর অত্যাচারের স্টীমরোলার চালাতে থাকে। তাঁকে, তাঁর সংগি সাথি এবং তাঁর আত্মীয়

স্বজনকে সমাজ থেকে বয়কট করে। তিনি এবং তাঁর সাথিরা ক্ষুধায় অনটনে মৃত্যুর দ্বারপ্রান্তে পৌছে যান, কিন্তু ধৈর্য ধারণ করেন, মহাসত্যের উপর অটল অবিচাল হয়ে থাকেন।

জাতির লোকদের সত্য পথে আসার আর কোনো সম্ভাবনা না দেখে তায়েফের নেতারা তাঁর মহাসত্যের আহ্বানে সাড়া দেবে বলে বড় আশা নিয়ে তায়েফ যান। কিন্তু তারা তাঁর আহ্বানে সাড়া দেয়নি। উল্টো তাঁকে নির্যাতন করার জন্যে বখাটে ছেলেদের তাঁর পিছে লেলিয়ে দেয়। তারা তাঁকে পাথর মেরে ক্ষত বিক্ষত ও রক্তাক্ত করে তাড়িয়ে দেয়। ফেরেশতা এসে তাঁর কাছে তায়েফবাসীদের ধ্বংস করে দেয়ার অনুমতি চায়। তিনি সেই অনুমতি না দিয়ে তাদের জন্যে দু'আ করেন ঃ হে আল্লাহ ! ওরা বুঝতে পারেনি, ওদের তুমি সঠিক পথ দেখাও।'

শেষ পর্যন্ত মক্কায় আল্লাহর দীনের কাজ করার সমস্ত পথ বন্ধ হয়ে যায়। প্রতিপক্ষ তাকে হত্যা করার ফায়সালা করে। কিন্তু তিনি বিচলিত হন না। অধৈর্য তাঁকে স্পর্শ করে না। তিনি নিজের নীতি ও আদর্শের উপর অটল অবিচল থাকেন। আদর্শের জন্যে স্বদেশ ত্যাগ করে ভিনদেশে হিজরত করেন।

হিজরত করার পর তাঁর বিরুদ্ধে শুরু হয় সশস্ত্র যুদ্ধ। নিজ সাথিদের নিয়ে কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হন তিনি। একদিকে চরম অর্থনৈতিক সংকটের কবলে পড়ে ক্ষুধায় দারিদ্রে তাঁরা নিপিষ্ট হচ্ছিলেন। অপর দিকে মক্কা থেকে শত্রুরা সশস্ত্র হামলার পর হামলা করতে থাকে। সর্বপ্রকার বৈষয়িক দৈন্যতা নিয়ে শত্রুদের মোকাবেলা করতে হয় তাঁর। এদিকে মদিনার ইহুদী আর মুনাফিকরা ঘরের শত্রু বিভীষণের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। কিন্তু বিশ্বনবী বিশ্বনেতা (সা) কোনো কিছুতেই ভেংগে পড়েন না। যেনো ধৈর্য ও দৃঢ়তার পাহাড় তিনি। দৃঢ়তার সাথে তিনি সবকিছুর মোকাবেলা করেন।

মুনাফিকরা এবং মুনাফিকদের ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পড়ে নবীর কিছু সাথি তাঁর পবিত্র ও প্রিয়তম স্ত্রীর বিরুদ্ধে অপবাদ রটায়। অপবাদ ও কুৎসা রটিয়ে তারা গোটা শহরকে বিষময় করে তোলে। ধৈর্যের পাহাড় বিশ্বনবী (সা) সবকিছু সইয়ে যান। দৃঢ়তার সাথে ধৈর্য ধারণ করেন। অবশ্য সবরে মেওয়া ফলে। অবশেষে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলাই তাঁর পবিত্র স্ত্রীর নির্দোষিতার সার্টিফিকেট পাঠিয়ে দেন।

বিশ্বনবী (স) বিপদ মুসিবত এবং বাধা বিরোধিতায় যেমন দৃঢ়তার সাথে ধৈর্য ধারণ করতেন, ঠিক তেমনি বিজয়ের সময়ও ধৈর্য ধারণ করতেন। মদিনার জীবনে বহুবার তিনি শত্রুদের উপর বিজয় অর্জন করেছেন। কিন্তু

বিজয়ে আত্মহারা হয়ে তিনি কখনো কোনো অসংলগ্ন ও সীমালংঘনের কাজ করেননি। যখনই কোনো বিজয় তাঁর পদচুম্বন করেছে, তিনি আত্মসংবরণ করেছেন। আল্লাহর শোকর আদায় করেছেন।

তাঁর জীবনে সবচে' বড় বিজয় ছিলো মক্কা বিজয়। তাঁকে যারা তিলে তিলে কষ্ট দিয়েছে, জানে মেরে ফেলতে চেয়েছে, প্রিয় মাতৃভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য করেছে এবং স্বদেশ ত্যাগ করার পরও স্বস্তিতে থাকতে দেয়নি, মক্কা বিজয়ের দিন তাদের থেকে তিনি যে কোনো প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। তাদের ব্যাপারে তিনি পরম ধৈর্যের পরিচয় দেন, আত্মসংবরণ করেন, দৃঢ়তার সাথে মন মেজাজকে প্রশান্ত রাখেন এবং তাদের ক্ষমা করে দেন। মূলত ধৈর্য আর দৃঢ়তাই ছিলো তাঁর চরিত্রের সেরা বৈশিষ্ট্য। ধৈর্যহীন হয়ে তিনি কখনো কোনো সীমালংঘন করেননি।

৬. সুবিচার ও সত্যবাদিতা

মহামানব ও মহাপুরুষদের শ্রেষ্ঠ গুণাবলীর মধ্যে সুবিচার ও সত্যবাদিতার অবস্থান শীর্ষে। বিশ্বনবী মুহাম্মদ রসূল (স) অন্য সকল গুণাবলীর মতো এ দু'টির গুণের দিক থেকেও ছিলেন সকলের উপরে।

সত্যবাদিতা ও সুবিচার ছিলো বিশ্বনবী (স)-এর সহজাত গুণ। শৈশব থেকে নিয়ে আমৃত্যু তিনি কখনো মিথ্যা কথা বলেননি। মিথ্যা ছিলো তাঁর প্রকৃতি বিরুদ্ধ। তিনি ছিলেন অনাবিল সত্যবাদী, সত্যপন্থী ও সত্যের বাহক। মিথ্যাকে বিনাশ করা আর সত্যকে সমুন্নত করাই ছিলো তাঁর ব্রত। সত্যবাদিতা ও সততার কারণে তিনি ছিলেন পরম বিশ্বস্ত। তাঁর নবুয়্যত পূর্ব জীবনেই মক্কার জনগণ তাঁকে পরম বিশ্বস্ত (আল আমীন) উপাধিতে ভূষিত করে।

এখানে তার সত্যবাদিতার ফিরিস্তি আমরা দিতে চাই না। তবে একথা তো বলবোই, কোনো ব্যক্তি যখন অতি অবশ্যিই সেইসব গুণাবলীর সোনালি শীর্ষে অবস্থান করেন, তখন তাঁর শত্রুরাও তাঁর যেসব গুণাবলীর স্বীকৃতি দান করে এবং তাঁর সেসব গুণাবলী সর্বজন স্বীকৃত হবার কারণে তারা কিছুতেই সেগুলো অস্বীকার করতে পারে না। বিশ্বনবী (সা)-এর অন্যান্য গুণাবলীর মতো তাঁর সত্যবাদিতার বিষয়টিও তাঁর কোনো শত্রুই অস্বীকার করতে পারতো না।

বিশ্বনবী (স)-এর বিরুদ্ধে শত্রুতার নেতৃত্ব প্রদান করেছিল আবু জাহল। বদর যুদ্ধে তার নিহত হবার পর নেতৃত্ব প্রদান করে আবু সুফিয়ান।

আবু জাহল নিঃসংকোচে বলেছিলো ঃ হে মুহাম্মদ ! আমি তো একথা বলছিল না যে, তুমি মিথ্যাবাদী, বরং আমি বলছি, (আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে)

তুমি যেসব কথা বলছো এবং নতুন নতুন ধ্যান ধারণা পেশ করছো, সেগুলো ঠিক নয়।–(তিরমিযি)

রোম সম্রাট হেরাকেলকে রসূল (স) ইসলামের প্রতি আহ্বান জানিয়ে পত্র প্রেরণ করেন। হেরাকেল রসূল (স) সম্পর্কে অবগত হবার জন্যে তার করদরাজ্য সিরিয়ায় আগত একদল কুরাইশ বণিককে তার দরবারে উপস্থিত করান। ঘটনাক্রমে আবু সুফিয়ান ছিলেন এ বণিকদলের সরদার। হেরাকেল রসূল (স) সম্পর্কে আবু সুফিয়ানকে অনেকগুলো প্রশ্ন করেন। একটি প্রশ্ন এই ছিলো যে, নবুয়্যত দাবি করার পূর্বে তোমরা কি মুহাম্মদকে কখনো মিথ্যা বলতে শুনেছো ? রসূল (স)-এর প্রতিপক্ষের সরদার আবু সুফিয়ান নির্দ্বিধায় জবাব দিলেন ঃ না, তিনি কখনো মিথ্যা কথা বলেননি।–(সহীহ বুখারি)

সীরাতে ইবনে হিশামে উল্লেখ হয়েছে, কুরাইশদের প্রবীনতম নেতা নযর ইবনে হারিস একদিন কুরাইশ নেতাদের এক মজলিশে বক্তব্য দিতে গিয়ে বলেন ঃ হে কুরাইশ নেতৃবৃন্দ, শুনো ! মুহাম্মদের (নতুন ধর্ম প্রচারে) তোমাদের উপর যে বিপদ নেমে এসেছে, তোমরা যে পন্থায় সে বিপদের মোকাবেলা করছো, তাতে কোনো সুরাহা হবে না। শুনো ! মুহাম্মদ তো তোমাদের চোখের সামনেই শৈশব থেকে যৌবনে পদার্পণ করে বেড়ে উঠেছে। এতোদিন পর্যন্ত তিনি তোমাদের মাঝে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়, সত্যবাদী ও বিশস্ত ব্যক্তি ছিলেন। আর এখন যখন তাঁর চুলে পাক ধরেছে এবং তিনি এসব কথা বলতে শুরু করেছেন, তখন তোমরা তাকে যাদুকর, গণক, কবি আর পাগল বলছো। আল্লাহ্র কসম, তার সম্পর্কে তোমাদের এসব মন্তব্য ঠিক নয় -----।

কোনো নেতার মহাসত্যবাদী হবার ব্যাপারে আরো কি কোনো প্রমাণের দরকার থাকে ? প্রকৃতপক্ষে তাঁর সততা, সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততা ছিলো সূর্যালোকের মতো জাজ্জ্বল্যমান এবং সর্বপ্রকার সন্দেহ সংশয়ের অতি উর্ধে।

তাঁর সত্যবাদিতার মতো, সুবিচারের গুণটিও ছিলো সুবিদিত। ন্যায় নিষ্ঠা, ন্যায়পরায়নতা, আদল, ইনসাফ, সুবিচার প্রভৃতি মহান গুণবৈশিষ্ট্য ছিলো রসূল পাক (সা)-এর স্বর্নোজ্জ্বল চরিত্রের চালিকা শক্তি। তাঁর সাথিগণ তাঁর সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, তিনি কখনো কারো সাথে অন্যায় আচরণ করেননি, কারো প্রতি যুল্ম করেননি, কারো অধিকার হরণ করেননি, কাউকেও ঠকাননি, কারো সাথে প্রতারণা করেননি, এমনকি তিনি কারো মনেও কষ্ট দেননি। আল কুরআনের নির্দেশ হলো ঃ

'যখন কথা বলবে, ন্যায় কথা বলো, সেটা তোমার নিকটত্মীয়দের ব্যাপারে হলেও।'–(সূরা আল আনআম ঃ ১৫২)

'সুবিচার করো। এটাই আল্লাহভীতির সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ।'
–(সূরা আল মায়িদা ঃ ৮)

'অতপর তাদের মাঝে ন্যায়ভাবে মীমাংসা করে দাও এবং সুবিচার করো।'–(সূরা হুজুরাত ঃ ৯)

'যখন মানুষের মাঝে বিচার ফায়সালা করবে, সুবিচার করো।'
–(সূরা আন নিসা ঃ ৫৮)

'আল্লাহ সুবিচার ও ইহসান করার নির্দেশ দিচ্ছেন।'
–(সূরা আন নহল ঃ ৯০)

বিশ্বনবী (স) ছিলেন আল্লাহ পাকের এই নির্দেশসমূহের বাস্তব দৃষ্টান্ত। তিনি তাঁর সকল কাজে সুবিচার করেছেন, ইনসাফ করেছেন। বিচার ফায়সালার ক্ষেত্রে তিনি সকলের প্রতি সুবিচার করেছেন। আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে তিনি সকলকে সমান দৃষ্টিতে দেখেছেন। এক সম্ভ্রান্ত মহিলা চুরি করলে তাকে আইনের ঊর্ধে রাখার জন্যে কিংবা লঘু দণ্ড দেয়ার জন্যে তাঁর কাছে সুপারিশ করা হয়। এতে তিনি রাগান্বিত হয়ে বলেন, অতীতে যারা দুর্বলদের উপর আইন প্রয়োগ করেছে আর শক্তিমানদের ছেড়ে দিয়েছে, তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। আজ মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমা চুরি করলেও আমি তার হাত কেটে দিতাম।–(সহী বুখারি)

৭. ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে সমান স্বচ্ছতা

দুনিয়াদার বড় বড় নেতাদের অবস্থা আমাদের সকলেরই জানা। তাদের পাবলিক লাইফ হয়ে থাকে এক রকম আর প্রাইভেট লাইফ হয়ে থাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম। পাবলিক লাইফে তারা নীতিবান, চরিত্রবান, সদাচারী, মানবদরদী ও স্বচ্ছ হবার ভান করে। পক্ষান্তরে প্রাইভেট লাইফে তারা হয়ে থাকে নীতি বিবর্জিত, অসচ্চরিত্র, অনাচারী, নিষ্ঠুর, বদমেজাজী এবং নোংরা ও অসচ্ছ।

কিন্তু বিশ্বনবী মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (স)-এর অবস্থা ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। তাঁর সামাজিক জীবন ছিলো একেবারেই স্বচ্ছ ঝকঝকে তকতকে অনাবিল। আর ব্যক্তিগত জীবন ছিলো আরো অধিকতর স্বচ্ছ ও নির্মল।

–তাঁর স্ত্রীরা সকলেই তাঁর স্বচ্ছতার সাক্ষ্য দিয়ে গেছেন।

–তাঁর পরিবারের গোলাম ও সেবকরা সকলেই তাঁর অনাবিল সুন্দর চরিত্র, মধুর ব্যবহার এবং দয়া ও সহানুভূতির দ্বারা পরম মুগ্ধ ছিলেন।

আট বছর বয়েস থেকে হযরত আনাস (রা) তাঁর সেবক হিসেবে তাঁর সাথিত্ব লাভ করেন। তিনি দশ বছর রসূল (স)-এর সেবা করেন। তিনি

বলেনঃ রসূল (সা) কখনো আমাকে ধমক দেননি। কখনো বলেননি, এমনটি করলে কেন ? অমনটি করলে না কেন ?

তিনি কখনো কাউকেও মারেননি, নির্যাতন করেননি, ধমক দেননি, তাড়িয়ে দেননি, অপমান করেননি, অনাদর করেননি। কারো সাথে রুক্ষ ব্যবহার করেননি। তার অমায়িক ব্যবহারে ঘরের এবং বাইরের সকলেই ছিলো তাঁর প্রতি চুম্বকের মতো আকৃষ্ট ও মুগ্ধ।

৮. কারো সাথে সাক্ষাত হলেই সালাম দিতেন

বিশ্বনেতা রসূলুল্লাহ্ (স) নারী-পুরুষ শিশু যার সাথেই সাক্ষাত হতো, তাকেই সালাম দিতেন। নিজেই আগে সালাম দিতেন। অথবা কেউ তাঁকে সালাম দিলে উত্তমভাবে তার জবাব দিতেন।

আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) বলেন, এক স্থানে আমরা কিছু সংখ্যক মহিলা বসা ছিলাম। তখন আমাদের নিকট দিয়ে পথ অতিক্রমকালে রসূলুল্লাহ (সা) আমাদের সালাম দেন।–(আবু দাউদ, ইবনে মাজাহ, দারেমী)

আনাস (রা) বলেন, একবার রসূলুল্লাহ্ (সা) একদল বালকের নিকট দিয়ে যাবার সময় তাদের সালাম দেন।–(বুখারি, মুসলিম)

প্রিয় নবী (সা) অন্যদেরতো আগে সালাম দেবার চেষ্টা করতেনই, কিশোর এবং মহিলাদেরকেও আগে সালাম দেবার চেষ্টা করতেন। তিনি বলেছেন, আগে সালাম দানকারী আল্লাহর অধিক নিকটে এবং অহংকারমুক্ত।

৯. হাসিমুখে কথা বলতেন

জরীর ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) বলেন, ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে রসূলুল্লাহ্ (স) আমাকে কখনো তাঁর নিকট যেতে বাধা দেননি এবং যখনই আমাকে দেখেছেন, স্মিত (মিষ্টি) হেসেছেন।–(মুআত্তায়ে মালেক)

১০. সাথিদের সাথে মুসাফাহা মুআনাকা করতেন

হাতে হাত মিলিয়ে সম্ভাষণ জানানোকে মুসাফাহা এবং গলায় গলা মিলিয়ে গলাগলি করে সম্ভাষণ জানানোকে মুআনাকা বলে। রসূলে করীম (স) তাঁর সহকর্মীগণকে এসব পদ্ধতিতে সম্ভাষণ জানাতেন।

আবু আইউব বুশাইর বলেন, এক ব্যক্তি আবু যর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করেন, রসূলুল্লাহ (স) যখন আপনাদের (সাহাবীদের) সাথে সাক্ষাত করতেন, তখন কি তিনি মুসাফাহা করতেন ? আবু যর বলেন, আমি যখনই তাঁর সাথে সাক্ষাত করেছি, তিনি আমার সাথে মুসাফাহা করেছেন। একবার তিনি

আমাকে ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তখন আমি ঘরে ছিলাম না। পরে ঘরে এসে সংবাদটি পাওয়ার সাথে সাথে আমি তাঁর সাথে সাক্ষাত করতে এলাম। তখন তিনি খাটের উপর বসা ছিলেন। আমাকে দেখেই তিনি বুকে জড়িয়ে ধরলেন ! তাতে কী যে আনন্দ পেয়েছি ! কী যে খুশি অনুভব করেছি !-(আবু দাউদ)

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) বলেন, একবার যায়েদ বিন হারিসা (এক অভিযান শেষে) মদিনায় ফিরে এলেন। এ সময় রসূলুল্লাহ (সা) আমার ঘরে ছিলেন। যায়েদ এসে দরজায় টোকা দিতেই তিনি খালি গায়ে চাদর টানতে টানতে তার দিকে ছুটে গেলেন। ------ অতপর তার সাথে গলাগলি করলেন এবং তাকে চুম্বন করলেন।-(তিরমিযি)

জাফর ইবনে আবু তালিব (রা) বলেন, আমরা হাবশা থেকে মদিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা করে অবশেষে মদিনা এসে পৌঁছলাম। তখন রসূলুল্লাহ (সা) আমার সাথে সাক্ষাত করতে এলেন এবং আমার সাথে মুআনাকা (গলাগলি) করলেন। এ সময় তিনি আমাকে বললেন ঃ 'বুঝতে পারছি না, খায়বর বিজয় আমাকে বেশি আনন্দ দিচ্ছে, নাকি জাফরের আগমন।' ঘটনাচক্রে খায়বর বিজয় এবং জাফরের প্রত্যাবর্তন একই সময় ঘটেছিল।-(মিশকাত)

১১. সবার বড় দাতা

আনাস (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা) ছিলেন মানুষের মধ্যে সুন্দরতম এবং সবচে' বড় দাতা এবং সর্বাধিক সাহসী বীর। এক রাত্রে লোকেরা (শহরতলীর দিকে শোরগোল শুনে ভাবলো ইহুদীরা আক্রমণ করেছে, তাই) ভয় পেয়ে গেলো। অতপর (রণপ্রস্তুতি নিয়ে) সবাই শোরগোলের দিকে যাত্রা শুরু করলো। কিছুদূর গিয়ে লোকেরা দেখলো নবী করীম (সা) শোরগোলের দিক থেকে ফিরে আসছেন। তিনি সবার আগে শোরগোলের স্থানে গিয়েছিলেন। ফিরে আসার পথে লোকদের সাথে দেখা হয়। তিনি তাদের বললেন ঃ কিছু না, ভয় পেয়ো না, ভয়ের কারণ নেই।'-(সহীহ বুখারী)

জাবির (রা) বলেন, এমন কখনো হয়নি যে, কেউ রসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে কিছু চেয়েছে আর তিনি বলেছেন ঃ 'না'।-(বুখারী, মুসলিম)

উমর ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার এক অভাবী ব্যক্তি এসে রসূলুল্লাহ (সা)-এর নিকট কিছু চাইলো। তিনি তাকে বললেন, এ মুহূর্তে তো আমার কাছে কোনো অর্থ সম্পদ নেই। তুমি আমার নামে বাকি কিনে নাও।' উমর বলেন, একথা শুনে আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল ! আল্লাহ তো আপনাকে সাধ্যের বাইরে কোনো কাজ করতে নির্দেশ দেননি। আপনি কেন নিজের উপর এতো বোঝা চাপিয়ে নিচ্ছেন ? উমর বলেন,

রসূলুল্লাহ (স) আমার একথাগুলো পসন্দ করলেন না। তখন অন্য এক সাহাবী বললেন, হে আল্লাহর রসূল ! আপনি প্রচুর ব্যয় (দান) করুন। আরশের মালিকের কাছে আপনি স্বল্পতার আশংকা করবেন না।' একথা শুনে রসূলুল্লাহ (সা) হেসে দিলেন। এমনকি তাঁর মুখমণ্ডলে আনন্দের আভা ফুটে উঠলো। -(আখলাকুন নবী ঃ আবু শায়খ ইসফাহানি)

১২. তিনি সকলের আব্দার রক্ষা করতেন

আনাস (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) যখন ফজরের নামায পড়া শেষ করতেন, তখন মদিনার লোকদের চাকর-চাকরানীরা তাঁর কাছে পাত্র ভরা পানি নিয়ে উপস্থিত হতো (যেনো তিনি তাদের পানি স্পর্শ করে দেন)। তখন তিনি তাদের প্রত্যেকের পানির পাত্রে হাত ডুবিয়ে দিতেন। অনেক সময় তারা শীতের সকালেও আসতো। তখনো তিনি তাদের পানির পাত্রে হাত ডুবিয়ে দিতেন।-(সহীহ্ মুসলিম)

আনাস (রা) বলেন, মদিনার একটি ছোট মেয়েও নবী করীম (সা)-কে হাতে ধরে (নিজের অভিযোগ শুনানোর জন্য) যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারতো।-(সহীহ বুখারি)

১৩. কখনো খারাপ কথা বলতেন না

আনাস (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা) কখনো কাউকেও অশ্লীল-অশালীন কথা বলতেন না, অভিশাপ দিতেন না এবং গালাগাল করতেন না। কারো প্রতি অসন্তুষ্ট হলে শুধু এতোটুকু বলতেন ঃ তার কি হলো, তার কপাল ধুলোমলিন হোক !-(সহীহ বুখারি)

১৪. তিনি ছিলেন অত্যন্ত লজ্জাশীল

আবু সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) ছিলেন পর্দানশীন কুমারী মেয়েদের চেয়েও অধিক লজ্জাশীল। তিনি যখন কিছু অপসন্দ করতেন, তখন আমরা তাঁর মুখমণ্ডলের দিকে তাকিয়ে তা বুঝতে পারতাম।(বুখারি, মুসলিম)

সাহল ইবনে সাদ (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) ছিলেন, অত্যাধিক লজ্জাশীল যখনই তাঁর কাছে কিছু চাওয়া হতো, তিনি দিয়ে দিতেন।-(আখলাকুন নবী)

১৫. তিনি কথার খই ফুটাতেন না

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) বলেন, তোমরা যেমন কথার খই ফুটাও, রসূলুল্লাহ (স) সে রকম অনবরত কথা বলতেন না। বরং তিনি যখন কথা বলতেন, তখন তিনি এমনভাবে শান্ত ধীরে থেমে থেমে কথা বলতেন, যে কেউ ইচ্ছা করলে তাঁর কথাগুলো গুণে রাখতে পারতো।-(বুখারি, মুসলিম)

জাবির (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) পরিষ্কার ও স্পষ্ট করে কথা বলতেন এবং তিনি প্রতিটি কথাকে আলাদা ও স্বতন্ত্র করে উচ্চারণ করতেন।-(আবু দাউদ)

১৬. তিনি অধিক সময় নীরব থাকতেন

রসূলুল্লাহ (স) কখনো বাজে এবং অনর্থক কথা বলতেন না। প্রয়োজনীয় কথা বলতেন, অর্থবহ কথা বলতেন এবং কম কথা বলতেন। দীর্ঘ সময় কথা না বলে নীরব থাকতেন। জাবির ইবনে সামুরা (রা) বলেছেন, রসূলুল্লাহ (সা) দীর্ঘ সময় ধরে নীরব থাকতেন।-(মিশকাত)

১৭. সাহায্যকারী ও সহকর্মীদের দোষক্রটি উপেক্ষা করতেন

আনাস (রা) বলেন, আমি আট বছর বয়েসে রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসেছি এবং দশ বছর কাল তাঁর খেদমত করেছি। তিনি কখনো আমাকে তিরস্কার করেননি। আমার কোনো কাজে কখনো 'উহ্' শব্দটি উচ্চারণ করেননি। এমনকি 'এটা করলে কেন ?' ওটা করলে না কেন ?' এ রকম কথাও কখনোই আমাকে বলেননি। আমার হাতে কখনো কিছু নষ্ট হবার কারণে কেউ আমাকে তিরস্কার করলে তিনি বলতেন, যা হবার হয়ে গেছে, ওকে ছেড়ে দাও।-(বুখারি, মুসলিম, বায়হাকী, মাসাবীহ)

১৮. নিজের ব্যাপারে প্রতিশোধ নিতেন না

রসূলুল্লাহ (স) কখনো নিজের ব্যাপারে কারো উপর প্রতিশোধ নিতেন না। তবে কারো দাবি থাকলে নিজের উপর প্রতিশোধ নিতে দিতেন। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (স) আল্লাহর পথে যুদ্ধ জিহাদরত অবস্থা ছাড়া কখনো কাউকেই নিজ হাতে প্রহার করেননি। নিজের ব্যাপারে কখনো কারো উপর প্রতিশোধ নেননি।-(বুখারি, মুসলিম)

১৯. সবসময় সহজ কাজটি করতেন

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (স)-কে যখন দু'টি বিষয়ের যে কোনো একটি গ্রহণ করার অবকাশ দেয়া হতো, তখন তিনি অবশ্যি উভয়টির মধ্যে সহজটি গ্রহণ করতেন। কিন্তু সেটি যদি গুনাহের কাজ হতো, তবে তিনি সেটি থেকে সকলের চেয়ে দূরে থাকতেন। তাঁর এ নীতির ব্যতিক্রম কখনো হয়নি।-(বুখারি, মুসলিম)

প্রিয় নবী (সা) তাঁর সাথিদেরকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, তোমরা সবসময় মানুষকে সুসংবাদ দেবে, নিরাশ করবে না। সহজতা বিধানের নীতি অবলম্বন করবে, কাঠিন্য আরোপ করবে না।-(বুখারি, মুসলিম)

২০. তিনি ছিলেন সরল জীবনের অধিকারী

আনাস (রা) বলেছেন ঃ রসূলুল্লাহ (স) রোগীর সেবা করতেন, কফিনের সাথে যেতেন, সেবক কর্মচারীদের দাওয়াত গ্রহণ করতেন এবং গাধার পিঠে চড়তেন।-(ইবনে মাজাহ)

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ রসূলুল্লাহ (স) নিজেই নিজের জুতা মেরামত করতেন, নিজের কাপড় সেলাই করতেন এবং তোমাদের মতোই ঘরের কাজকর্ম করতেন। তিনি অন্যসব মানুষের মতোই একজন মানুষ ছিলেন। তিনি নিজের কাপড় চোপড় থেকে পোকা বাছতেন, নিজ বকরীর দুধ দোহন করতেন এবং নিজের কাজ নিজেই করতেন।-(তিরমিযি)

আবদুল্লাহ ইবনে আবী আওফা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) অভাবী, গরীব ও দরিদ্রদের সাথে চলাফেরা করতে কোনো প্রকার সংকোচ করতেন না। তিনি তাদের প্রয়োজন পূরণ করতেন এবং বিধবাদের সাহায্য সহযোগিতা করতেন। -(নাসায়ী, দারেমি)

২১. পরম সৌজন্য বোধের অধিকারী

আনাস (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) যখন কারো সাথে মুসাফাহা করতেন, তখন তিনি নিজের হাত ততোক্ষণ পর্যন্ত ছাড়িয়ে নিতেন না যতোক্ষণ না সে ব্যক্তি নিজের হাত সরিয়ে নিতো। তিনি ততোক্ষণ পর্যন্ত তার দিক থেকে মুখ ফিরাতেন না, যতোক্ষণ না সে নিজে নিজের মুখ ফিরিয়ে নিতো। তাঁকে কখনো মানুষের দিকে পা ছড়িয়ে বসতে দেখা যায়নি।-(তিরমিযি)

২২. তিনি সংক্ষিপ্ত ভাষণ দিতেন

আবদুল্লাহ ইবনে আবী আওফা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) আল্লাহকে অধিক স্মরণ করতেন। কদাচিত অর্থহীন কথা বলতেন। তিনি নামায দীর্ঘ করতেন, ভাষণ সংক্ষেপ করতেন।-(নাসায়ী, দারেমি)

২৩. সাথি সহকর্মীদের প্রতি পরম দরদী

জরীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) একটি ঘরে প্রবেশ করলেন। তখন ঘরটি লোকে ভর্তি হয়ে গেলো। আমি পরে এসে ঘরে জায়গা না পেয়ে বাইরে বসে পড়লাম। ভিতর থেকে নবী করীম (সা) আমাকে বাইরে বসতে দেখে নিজের কাপড় ভাঁজ করে আমার দিকে ছুঁড়ে দিলেন। বললেন, এটি বিছিয়ে বসো। জরীর বলেন, আমি কাপড়টি তুলে নিয়ে আমার মুখমণ্ডলে চেপে ধরলাম এবং তাতে চুমু খেলাম।-(আখলাকুন নবী ঃ আবু শাইখ ইসফাহানি)

আনাস (রা) বলেন, নবী করীম (স) যদি একাধারে তিনদিন কোনো দীনি ভাইকে না দেখতেন, তখন তার সম্পর্কে অন্যদের জিজ্ঞাসা করতেন। যদি জানতেন সে সফরে আছে তখন তার জন্যে দু'আ করতেন। যদি জানতেন বাড়িতে আছে, তবে গিয়ে খোঁজ খবর নিতেন। আর যদি জানতেন অসুস্থ হয়েছে, তবে সেবা শশ্রূষা করতেন।-(আখলাকুন নবী)

২৪. সাথিদের সাথে হাসি খুশি থাকতেন

আবদুল্লাহ ইবনে হারিস ইবনে জুযই (রা) বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (সা)-এর চেয়ে অধিক হাসি খুশি মানুষ আর দেখিনি।-(মিশকাত)

উমরা বিনতে আবদুর রহমান (রা) বলেন, আমি উম্মুল মু'মিনীন আয়েশাকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, রসূলুল্লাহ (স) ঘরে কিভাবে সময় কাটাতেন ? তিনি বলেছেন ঃ রসূলুল্লাহ (স) ছিলেন সবচেয়ে ভদ্র, নম্র, চমৎকার এবং সবচেয়ে হাসিখুশি মানুষ।-(আখলাকুন নবী)

আবুদ দারদা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) যখন কারো সাথে কোনো কথা বলতেন, তখন তাঁর মুখে স্মিত হাসির আভা ফুটে উঠতো।-(আখলাকুন নবী)

২৫. তিনি কাউকেও অপমানিত করতেন না

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) কখনো কাউকেও অপমানিত করতেন না। কারো বিষয়ে কোনো অপসন্দনীয় কিছু অবগত হলে তিনি তাকে একথা বলতেন না যে, তুমি কেন এটা করেছো ? বরং তিনি সাধারণভাবে সম্বোধন করে বলতেন ঃ লোকদের কি হলো যে তারা এই এই কথা বলছে ? এতে করে সেই ব্যক্তি সকলের অগোচরেই সংশোধন হয়ে যেতো।-(আখলাকুন নবী)

২৬. তিনি ছিলেন অত্যন্ত বাস্তবধর্মী

আবু হুরাইরা এবং আবু সায়ীদ খুদরী (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) একদিন আমাদের নিয়ে ফজর নামায পড়ছিলেন। হঠাত তিনি একটি শিশুর কান্না শুনে নামায সংক্ষেপ করে ফেলেন। নামায শেষে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো ঃ হে আল্লাহর রসূল ! আজ আপনি নামায এতোটা সংক্ষেপ করলেন কেন ? তিনি বললেন ঃ আমি একটি শিশুর কান্না শুনে আশংকা করলাম (আমার সাথে জামাতে নামায রতা) তার মার মন উদ্বিগ্ন হয়ে পড়বে, (তাই নামায সংক্ষেপ করে দিয়েছি।-(আখলাকুন নবী)

মালেক ইবনে হুয়াইরিস (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স) ছিলেন অত্যন্ত দয়ালু, বন্ধুসুলভ এবং সহানুভূতিশীল। আমরা আমাদের গোত্রের একটি প্রতিনিধি দল

ইসলাম সম্পর্কে শিক্ষা গ্রহণের উদ্দেশ্যে মদিনায় এসে তাঁর সান্নিধ্যে বিশ দিন অবস্থান করেছিলাম। তখন তিনি চিন্তা করলেন, আমাদের হয়তো বাড়ি ফিরে যাবার আগ্রহ সৃষ্টি হয়েছে। তাই তিনি আমাদের ডাকলেন, আমরা বাড়িতে কাদের রেখে এসেছি জিজ্ঞাসা করলেন। আমরা তাঁকে বিস্তারিত জানালাম। তখন তিনি বললেন, তোমরা এখন তোমাদের পরিবার পরিজনের কাছে ফিরে যাও এবং তাদের সাথেই অবস্থান করো।–(আখলাকুন নবী)

২৭. তিনি সুবাস পসন্দ করতেন

আনাস (রা) বলেন, নবী করীম (স) যখন আমাদের কাছে আসতেন, তখন তাঁর সুগন্ধির কারণে আমরা আগেই টের পেতাম, তিনি আসছেন। –(আখলাকুন নবী ঃ আবু শায়খ ইসফাহানি)

উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (স)-এর নিয়ম ছিলো, তিনি সুগন্ধ শরীর বা সুগন্ধ পরিধেয় ছাড়া সাথিদের সাথে সাক্ষাতে যাওয়া পসন্দ করতেন না। তিনি শেষ রাতে সুগন্ধি মাখতেন।

আনাস (রা) বলেন, নবী করীম (স) বিবিদের ঘরে গেলে সুগন্ধি খোঁজ করতেন।–(আখলাকুন নবী)

২৮. তিনি পরামর্শ করে কাজ করতেন

রসূলুল্লাহ (স) শরীয়াতের বিধান দেয়া ছাড়া বাকি অন্যান্য কাজ তাঁর সাথিদের সাথে পরামর্শ করে করতেন। স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালাই তাঁকে পরমর্শ করে কাজ করতে নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহর নবী হিসেবে তিনি লোকদের উপর নিজের মত ও সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা না করে পরামর্শ গ্রহণ করেই কাজ করতেন। উম্মুল মু'মিনীন আয়েশা (রা) বলেন, নিজের লোকদের সাথে পরামর্শ করে কাজ করার ক্ষেত্রে আমি রসূলুল্লাহ (সা)-এর চেয়ে অগ্রসর আর কোনো লোককে দেখিনি।–(তিরমিযি)

২৯. তিনি দারিদ্র পসন্দ করতেন

বিভিন্ন সাহাবীর সূত্রে বর্ণিত অনেকগুলো হাদীস থেকে জানা যায়, রসূলুল্লাহ (সা) নিজেই নিজের জন্য দারিদ্র বেছে নিয়েছেন। যখনই তাঁর হাতে অর্থকড়ি আসতো, তিনি সাথে সাথে সেগুলো বিলিয়ে দিতেন। তাঁর হাতে যতোক্ষণ কিছু না কিছু থাকতো, ততোক্ষণ তাঁর কাছে কিছু চেয়ে কেউ বিমুখ হতো না। অনেক সময় তিনি ধার করে দান করতেন। কেউ চাওয়ার পর কিছু না দিতে পারলে তিনি পেরেশান হয়ে যেতেন। অভাবের তাড়নায় প্রায় দিনই তিনি না খেয়ে থাকতেন। খুব কম সময়ই পেটভরে খেতে পেয়েছেন। তিনি বলেছেন,

তিনি চাইলে আল্লাহ পাক তাঁকে রোম ও পারস্য সাম্রাজ্যের সব সম্পদ প্রদান করতেন, কিন্তু তিনি দারিদ্রের পথই বেছে নিয়েছেন।

আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) বলেন, ওফাতের দিনও রসূলুল্লাহ (স)-এর বর্মটি এক ওসাক যবের বিনিময়ে এক ইহুদীর কাছে বন্ধক ছিলো।

আনাস (রা) বলেন, একবার ফাতিমা (রা) এক টুকরো যবের রুটি নিয়ে নবী করীম (সা)-এর ঘরে এলো। তিনি ফাতিমা (রা)-কে বললেন, তিন দিনের মধ্যে এটাই তোমার পিতার প্রথম আহার।

আয়েশা (রা) বলেন, ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত রসূল (সা) একাধারে তিনদিন গমের রুটি পরিতৃপ্তি সহকারে আহার করেছেন এমন সুযোগ তাঁর জীবনে আসেনি।

আবদুর রহমান ইবনে আউফ (রা) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা) ও তাঁর পরিবারের লোকজন দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছেন, অথচ তাঁরা কোনোদিন তৃপ্তি সহকারে যবের রুটি খেতে পাননি।

উরওয়া ইবনে যুবায়ের (রা) বলেন, আমার খালা আয়েশা (রা) বলতেন, আমাদের উপর দিয়ে কয়েকটি নতুন চাঁদ উদিত হতো, অথচ রসূলুল্লাহ (স)-এর ঘরে (চুলায়) কোনো আগুন জ্বলতো না। আমি বললাম, খালাম্মা ! আপনারা কিভাবে জীবন ধারণ করতেন। তিনি জবাবে বলেন ঃ দু'টি কালো জিনিসের মাধ্যমে অর্থাৎ খেজুর ও পানি দিয়ে।−(আখলাকুন নবী ঃ আবু শায়খ ইসফাহানি)

৩০. মহোত্তম চরিত্রের এক অনুপম ছবি

রসূলুল্লাহ (স)-এর চরিত্র বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে এখন আমরা কয়েকজন সাহাবীর কয়েকটি অনুপম বর্ণনা উল্লেখ করছি। এ বর্ণনাগুলোতে তাঁর জীবন পদ্ধতি ও চরিত্র বৈশিষ্ট্যের সমগ্র দিকের উপর অতি সংক্ষেপে আঁকা হয়েছে এক অনুপম ছবি দেখুন সে ছবি ঃ

উম্মুল মু'মিনীন খাদীজার (রা) আগের ঘরের ছেলে হিন্দ ইবনে আবী হালা বলেন ঃ রসূলুল্লাহ (সা) সবসময় আখিরাতের চিন্তায় মগ্ন থাকতেন। অধিকাংশ সময় চুপ থাকতেন। প্রয়োজন ছাড়া কথা বলতেন না। কথা বলার সময় প্রতিটি কথা পৃথক পৃথক উচ্চারণ করে স্পষ্ট ভাষায় বলতেন। তাঁর কথাবার্তা ছিলো পরিচ্ছন্ন, মৌলিক ও অকাট্য। তিনি কঠোর ভাষী ছিলেন না, আবার ব্যক্তিত্বহীনও ছিলেন না। তিনি কাউকে লজ্জা দিতেন না। অপমানিত করতেন না কাউকেও। তিনি আল্লাহর প্রতিটি নিয়ামতের কদর করতেন। খাবার সামনে

এলে কখনো দোষ বলতেন না। কোনো জাগতিক বিষয়ে তিনি কখনো রাগ করতেন না। কিন্তু আল্লাহর অধিকার নষ্ট হতে দেখলে অত্যন্ত রাগ করতেন। নিজের জন্যে কখনো রাগ করেননি। প্রতিশোধ নেননি কখনো। অধিকাংশ সময় মুচকি হাসতেন। তখন তাঁর শিশির স্বচ্ছ মুক্তোর মতো দাঁতগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠতো।-(শামায়েলে তিরমিযি)

আনাস (রা) বলেন ঃ তিনি ছিলেন সবচে' ভদ্র, কোমল ও অমায়িক মানুষ। তিনি সবার সাথে মিলেমিশে থাকতেন। সবার সাংসারিক খোঁজ খবর নিতেন। শিশু-কিশোরদের সাথে হাস্যরস করতেন। শিশুদের আদর করে কোলে তুলে বসাতেন। ছোট বড়ো সকলের দাওয়াত তিনি কবুল করতেন। দূরে হলেও রুগ্ন ব্যক্তির খোঁজ খবর নিতেন। তিনি মানুষের ওযর কবুল করতেন।-(মিশকাত)

রসূলে করীম (স)-এর মহোত্তম জীবনের বর্ণনা দিতে গিয়ে তাঁর ঘনিষ্ঠ ও প্রিয় সাথি আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন ঃ

তিনি কখনো অশ্লীল কথা বলেননি। কখনো মন্দ কথা তাঁর মুখ থেকে বেরোয়নি। ভনিতা করেননি কখনো তিনি। হাটে বাজারে চিৎকার করে কথা বলেননি। অন্যায়ের বদলে অন্যায় করেননি। মন্দের মোকাবেলা করেছেন ন্যায় ও ক্ষমাশীলতা দিয়ে। জিহাদের ময়দান ছাড়া কারো উপর তিনি হাত তোলেননি। সেবকদের কখনো মারেননি। নিজের জন্যে কখনো কারো কাছ থেকে প্রতিশোধ নেননি। দু'টি জিনিসের একটি গ্রহণ করার সুযোগ থাকলে সহজটি বেছে নিতেন। নিজের কাপড় চোপড় নিজেই ধুইতেন। বকরীর দুধ নিজে দুহাতেন। নিজের কাজ নিজেই করতেন। প্রয়োজন ছাড়া কথা বলতেন না। মানুষের মন রক্ষা করতেন। কারো মনে কষ্ট দিতেন না। সব সাথিদের খোঁজ খবর নিতেন। তাঁর ব্যবহার ছিলো ভারসাম্যপূর্ণ। কারো কথা শুনার সময় মনোযোগ দিয়ে শুনতেন। বিরক্ত হতেন না। আল্লাহকে স্মরণ করে ওঠা বসা করতেন। উপস্থিত সকলের মনোযোগ আকৃষ্ট রাখতেন। প্রত্যেকেই মনে করতো, তাঁর কাছে সেই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কেউ তাঁর কাছে কিছু চাইলে তিনি তাকে ফিরিয়ে দিতেন না। কেউ কথা বলতে চাইলে তার প্রয়োজন মতো সময় দিতেন। তিনি সকলের সাথে উত্তম আচরণ করতেন। তিনি কারো দোষ দিতেন না। ঝগড়া বিবাদ করতেন না। অহংকার করতেন না। অর্থহীন কথা কাজ থেকে তিনি নিজকে বিরত রাখতেন। তিনি যখন কথা বলতেন, তাঁর সাথিরা পিনপতন নিরবতা অবলম্বন করতো। তাঁর কথা শেষ হলেই তারা কথা বলতো। কারো কথার মাঝে তিনি কথা বলতেন না। তিনি অমায়িক বিশাল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। তিনি ছিলেন সত্যবাদী। ছিলেন বিশ্বস্ত, কোমল

হৃদয়ের অধিকারী। তাঁর সাথিরা ছিলেন তাঁর জন্যে পাগল পারা।-(শামায়েলে তিরমিযি)

রসূলুল্লাহ (সা)-এর নাতি হাসান ইবনে আলী (রা) বলেন, আমি আমার পিতাকে নবী (স)-এর গৃহ মধ্যকার কাজকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেন ঃ ব্যক্তিগতভাবে তাঁর জন্যে এ অনুমতি ছিলো, তিনি যখনই ইচ্ছা করতেন, গৃহে প্রবেশ করতে পারতেন। তবে তাঁর অভ্যাস ছিলো, যখনই ঘরে যেতেন, তাঁর সময়কে তিন ভাগ করে নিতেন। এক ভাগ আল্লাহর ইবাদতের জন্য, দ্বিতীয় ভাগ নিজ পরিবার পরিজনের জন্য এবং তৃতীয় ভাগ নিজের বিশ্রামের জন্য। আবার নিজ আরামের সময়টুকুও লোকজনকে দিয়ে দিতেন। আর বিশেষ লোকদের মাধ্যমে তার উপকারিতাও সাধারণ লোকদের মধ্যে ফিরিয়ে দিতেন। অর্থাৎ ঐ সময় বিশেষ বিশেষ সাহাবী প্রবেশ করতেন এবং তাঁর কাছে দীনি মাসায়েল ও দীনের মর্মকথা শ্রবণ করে সাধারণ লোকদের মধ্যে পৌঁছে দিতেন। তাঁদের নিকট কোনো কথা গোপন রাখতেন না। দীন ও দুনিয়ার লাভজনক সব কথাই বলতেন। তাঁর অভ্যাস ছিলো, উম্মতের জন্য নির্ধারিত সময়ে স্বীয় ইচ্ছা অনুযায়ী জ্ঞানীদেরকে প্রাধান্য দিতেন এবং ঐ সময়ের বণ্টনে দীনি মর্যাদা হিসাবে তারতম্য ঘটতো। তাদের মধ্যে কারো থাকতো একটি কাজ, কারো দু'টি কাজ এবং কারো কয়েকটি কাজ। তিনি তাদের কাজে লেগে যেতেন এবং তাদেরকেও ঐসব কাজে মশগুল রাখতেন। তাতে তাদের এবং উম্মতের সংশোধন হতো। তিনি তাদের সমস্যাবলী জানতে চাইতেন এবং তাদের অবস্থা অনুযায়ী তাদের পরামর্শ দিতেন। বলতেন, যারা এখানে উপস্থিত আছে, তারা যেনো তা অনুপস্থিতিদের কাছে পৌঁছে দেয়। (তিনি বলতেন) আমাকে সেই ব্যক্তির প্রয়োজন অবগত করো, যে তার প্রয়োজেনর কথা আমার কাছে পৌঁছাতে পারে না।

সাহাবীগণ তাঁর নিকট ইলম ও দীনের অন্বেষী হয়ে যেতেন। পূর্ণ তৃপ্তি ছাড়া সেখান থেকে ফিরতেন না। আর যখন তারা সেখান থেকে বের হতেন, তখন পথ প্রদর্শক হয়ে বের হতেন।

রসূলুল্লাহ (স)-এর নাতি হাসান (রা) বলেন, আমি (আমার পিতাকে) জিজ্ঞাসা করলাম, নবী (স)-এর ঘরের বাইরের কাজকর্ম সম্পর্কে কিছুটা বলুন, অর্থাৎ গৃহের বাইরে তিনি কি কাজকর্ম করতেন ? তিনি বললেন ঃ রসূলুল্লাহ (স) অনর্থক কথাবার্তা থেকে স্বীয় যবান মুবারককে রক্ষা করতেন। মানুষের মনোযোগ নিজের প্রতি আকৃষ্ট রাখতেন। অমনযোগী হতে দিতেন না। প্রত্যেক গোত্রের সম্মানিত ব্যক্তিকে সম্মান করতেন এবং তাকেই তাদের নেতা ও অভিভাবক বানাতেন। তিনি মানুষের সাথে মিলিত হওয়ার ক্ষেত্রে সতর্কতা ও সাবধানতা অবলম্বন করতেন। কিন্তু কারো সাথে স্বীয় আন্তরিকতা ও

প্রফুল্লচিত্ততার ক্ষেত্রে তারতম্য করতেন না। নিজ সঙ্গীদের খোঁজ-খবর নিতেন। মানুষকে তাদের হাল অবস্থা জিজ্ঞাসা করতেন। ভালো কথাকে ভালো বলতেন এবং তার প্রশংসা করতেন। মন্দ কথাকে মন্দ বলতেন এবং তার নিন্দা করতেন। তাঁর প্রতিটি কাজে ভারসাম্য বজায় থাকতো, এদিক-ওদিক ঝুঁকে পড়তেন না। তিনি মানুষের প্রতি খেয়াল রাখতেন যাতে কেউ বিরক্ত কিংবা অতিষ্ঠ না হয়ে পড়ে। প্রত্যেক অবস্থার জন্যই তাঁর নিকট উপযুক্ত ব্যবস্থা থাকতো। সত্য গ্রহণে ত্রুটি করতেন না এবং সত্য ত্যাগ করেও অন্যদিকে চলে যেতেন না। তাঁর সংগি সাথিরা ছিলেন শ্রেষ্ঠ মানুষ। তাঁর কাছে সবার সেরা ব্যক্তি ছিলেন সেই ব্যক্তি, যিনি সবার মঙ্গল কামনা করতেন। তাঁর কাছে সবচেয়ে মর্যাদাশীল ছিলেন সে ব্যক্তি, যিনি ছিলেন মানুষের সমব্যথী এবং তাদের ব্যাপারে সবচেয়ে উত্তম।

হাসান (রা) বলেন ঃ অতপর আমি (আমার পিতাকে) রসূলুল্লাহ (স)-এর মজলিস ও উঠাবসার অবস্থা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন ঃ রসূলুল্লাহ (সা) উঠতে বসতে আল্লাহর যিকর করতেন। তিনি কোনো স্থানকে নিজের জন্য নির্দিষ্ট করতেন না। তিনি যখন মানুষের সাথে বসতেন, তখন যেখানেই বসার স্থান পেতেন বসে পড়তেন এবং মানুষকেও এরূপ করতে নির্দেশ দিতেন। তিনি তাঁর মজলিসের প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে যথাযোগ্য মর্যাদা দান করতেন। কেউ একথা অনুভব করতো না যে, সে ছাড়া অন্য কোনো ব্যক্তি তাঁর বেশি প্রিয়। যে ব্যক্তি (কোনো প্রয়োজনে) তাঁর কাছে এসে বসতো কিংবা উঠে যেতো, তিনি তার সাথে নিজকে ততোক্ষণ পর্যন্ত আটকে রাখতেন যে পর্যন্ত না সে নিজেই চলে যেতো। কেউ যদি তাঁর কাছে কোনো কিছু চাইতে আসতো, সে তার বাসনা পূরণ করে ফিরে যেতো, কিংবা কোমল ব্যবহার ও সান্ত্বনা নিয়ে ফিরে যেতো। তাঁর ব্যবহার সমস্ত লোকের জন্য সমান ছিলো। স্নেহ-মমতার ক্ষেত্রে, তিনি ছিলেন তাদের পিতা। আর লোকেরা সব (অধিকারের ক্ষেত্রে) তাঁর নিকট ছিল সমান। তাঁর মজলিস ছিলো ধৈর্যশীলতা, লজ্জাশীলতা, সত্যতা ও আমানতের মজলিস। সেখানে উচ্চস্বরে কথাবার্তা হতো না। কারো ইযযত-আব্রুর উপর কলংক আরোপ করা হতো না। কারো দোষ-ত্রুটি সমালোচিত হতো না। সভার সদস্যদের মধ্যে ছিলো সংযতভাব। তাকওয়া বজায় থাকতো। একে অপরের সাথে ভদ্র ও নম্র আচরণ করতো। বড়দের শ্রদ্ধা করতো, ছোটদের স্নেহ করতো। অভাব গ্রস্তদের প্রাধান্য দিতো। অপরিচিত আগন্তুকদের প্রতি খেয়াল রাখতো।

হাসান (রা) বলেন, অতপর আমি (আমার পিতাকে) জিজ্ঞাসা করলাম, রসূলুল্লাহ (স) তাঁর সভার সদস্যদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করতেন ? তিনি বললেন, রসূলুল্লাহ (সা) তাঁদের সাথে আনন্দচিত্তে মিলিত হতেন। তিনি নম্র ও বিনয়ী ছিলেন। কঠোর ছিলেন না। তিনি হাট-বাজারে হৈ হুল্লোড় করতেন না।

অশ্লীল বাক্য উচ্চারণ করতেন না। কাউকে দোষারোপ করতেন না। অহেতুক কারো প্রশংসা করতেন না। অপছন্দনীয় জিনিস থেকে দূরে থাকতেন এবং এ ব্যাপারে মানুষ তাঁর সম্পর্কে নিরাশ হতো। তিনি সে সম্পর্কে কোনো মন্তব্যও করতেন না। তিনটি বিষয় থেকে তিনি নিজেকে দূরে রেখেছিলেন ঃ এক. ঝগড়া-বিবাদ থেকে। দুই. বেশী কথা বলা থেকে। তিন. অর্থহীন কাজ থেকে। তিনটি বিষয় থেকে তিনি অন্য মানুষকে রক্ষা করেছিলেন ঃ এক. তিনি কারো কুৎসা রটনা করতেন না। দুই. কাউকে লজ্জা দিতেন না। তিন. কারো দোষ অন্বেষণ করতেন না। যে কথা বললে সওয়াবের আশা করা যেতো, তিনি তাই বলতেন। তিনি যখন কথা বলতেন, তখন সভাসদগণ তাঁদের মাথা এমনভাবে ঝুঁকিয়ে রাখতেন যেনো তাঁদের মাথার উপর পাখি বসে আছে। তিনি যখন কথা বন্ধ করতেন তখন অন্যরা কথা বলতেন। তাঁর সামনে কেউ কারো কথার প্রতিবাদ করতেন না। যখন কেউ কোনো কথা শুরু করতেন, তখন অন্যরা তার কথা শেষ না হওয়া পর্যন্ত নিরব থাকতেন। তাদের মধ্যে প্রত্যেকের কথাই তাঁর নিকট ততটুকু গুরুত্বের অধিকারী হতো, যতটুকু গুরুত্ব পেতো প্রথম ব্যক্তির কথা। সবাই যে কথা শুনে হাসতো, তিনিও তাতে হাসতেন। সবাই যাতে আশ্চর্য হতো, তিনিও তাতে আশ্চর্য হতেন। আগন্তুকের অসংলগ্ন কথাবার্তা ও প্রশ্ন তিনি ধৈর্য সহকারে শুনতেন। তাঁর সাহাবীগণ এরূপ লোকদের তাঁর নিকট নিয়ে আসতেন (যাতে তাদের প্রশ্ন থেকে নতুন বিষয় জানা যায়)। তিনি বলতেন, তোমরা যখন কোনো অভাবগ্রস্তকে তার অভাব দূর করার জন্য প্রার্থনা করতে দেখো, তখন তাকে সাহায্য করো। কেউ তাঁর প্রশংসা করুক, তিনি তা পছন্দ করতেন না। তবে কেউ কৃতজ্ঞতা বশত কিছু বললে তা ছিলো স্বতন্ত্র। তিনি কারো কথার প্রতিবাদ করতেন না। অবশ্য সে যদি সীমা অতিক্রম করে যেতো, তবে তার কথার প্রতিবাদ করতেন। হয়তো তাকে নিষেধ করতেন, কিংবা সেখানে থেকে উঠে দাঁড়াতেন।

হাসান (রা) বলেন, অতপর আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর চুপ থাকা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে আমার পিতা বললেন ঃ রসূলুল্লাহ (স) চুপ থাকতেন চারটি কারণে ঃ এক. সহনশীলতার কারণে, দুই. সাবধানতার কারণে, তিন. আন্দাজ করার উদ্দেশ্যে, চার. চিন্তা-ভাবনা করার জন্য। তাঁর আন্দাজ করা ছিলো অবস্থার উপর পূর্ণ চিন্তা-ভাবনা করা এবং মানুষের আলাপ-আলোচনা শ্রবণ করা। আর তিনি চিন্তা-ভাবনা করতেন সেসব বিষয়ে, যা অবশিষ্ট থাকে এবং বিলীন হয় না। আর সহনশীলতা তাঁর ধৈর্যের মধ্যেই একত্রিত করা হয়েছিলো। অর্থাৎ কোনো বিষয় তাঁকে ক্রুদ্ধও করতে পারতো না এবং অস্থিরও করতে পারতো না। আর সাবধানতা তাঁর জন্য চারটি জিনিসের মধ্যে একত্রিত করা হয়েছে। (তা হচ্ছে) তিনি উত্তম বস্তুটি গ্রহণ করতেন, যাতে মানুষ তা গ্রহণ

করে। তিনি মন্দবস্তু পরিত্যাগ করতেন, যাতে মানুষ তা থেকে বিরত থাকে। যে জিনিসে তাঁর উম্মতের সংশোধন হতো, তিনি তার পক্ষে জোরালো মত প্রকাশ করতেন। আর যাতে তাদের কল্যাণ হতো, তিনি তা নিয়ে উঠে দাঁড়াতেন। এভাবে তিনি তাঁর উম্মতের জন্য দুনিয়া ও আখিরাত উভয়ের কল্যাণ একত্রিত ও সমন্বিত করেন। (আখলাকুন নবী ঃ আবু শাইখ ইসফাহানি)

আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দশ বছর আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর সাহচর্যে ছিলাম এবং সব রকমের আতরের আমি ঘ্রাণ নিয়েছি। কিন্তু তাঁর মুখের ঘ্রাণ থেকে উত্তম কোনো ঘ্রাণ আমার নাক স্পর্শ করেনি। সাহাবাদের মধ্যে কারো সাথে যখন তাঁর সাক্ষাত হতো, তখন তিনি তাঁর সাথে দাঁড়িয়ে থাকতেন এবং যে পর্যন্ত সে তাঁর থেকে পৃথক না হতো, তিনি নিজে তার হাত মুবারক গুটিয়ে নিতেন না। কোনো সাহাবী যখন তাঁর সাথে মিলিত হয়ে তাঁর কানে কানে কোনো কথা বলতে চাইতেন, তখন তিনি নিজ কান তার দিকে পেতে দিতেন এবং ততোক্ষণ পর্যন্ত তাঁর কান সরিয়ে নিতেন না, যতোক্ষণ না ঐ ব্যক্তি নিজেকে সরিয়ে নিতো।–(শামায়েলে তিরমিযি)

৩১. তাঁর পরিচালিত আন্দোলনের বৈশিষ্ট্য

তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলন ছিলো পৃথিবীর সকল আন্দোলন থেকে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত এক মহান আন্দোলন। আমরা এখানে তাঁর সে মহান আন্দোলনের কয়েকটি মৌলিক বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করছি ঃ

ক. আল্লাহর অভিভাবকত্ব ঃ তাঁর আন্দোলনের অভিভাবক, সাহায্যকারী ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন স্বয়ং আল্লাহ্ তাআলা। আন্দোলনের ‘গাইড লাইন’ আসতো স্বয়ং তাঁরই নিকট থেকে। আন্দোলনকারীরা তাঁরই সন্তুষ্টির জন্যে সর্বস্ব ও সর্বোচ্চ কুরবানীর জন্যে থাকতেন সদাপ্রস্তুত। তারা সাহায্য তাঁরই কাছে চাইতেন। তিনি তাদের সান্ত্বনা দিতেন, উৎসাহ প্রদান করতেন। করতেন সাহায্য এবং পৃষ্ঠপোষকতা দান ঃ

১. “আল্লাহ মু'মিনদের অভিভাবক। তিনি তাদের অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনেন।”–(সূরা আল বাকারা ঃ ১৫৭)

২. “আমি অবশ্য অবশ্যি আমার রসূলদের এবং ঈমানদারদের সাহায্য করবো পৃথিবীর জীবনে এবং পরকালেও যখন সাক্ষী দণ্ডায়মান হবে।”–(সূরা আল মুমিন ঃ ৫১)

৩. “হে নবী ! তোমার রবের চূড়ান্ত ফায়সালা আসা পর্যন্ত সবর করো। তুমি তো আমারই দৃষ্টি পথে (পৃষ্ঠপোষকতায়) রয়েছো।”–(সূরা তুর ঃ ৪৮)

৪. "মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব।"–(সূরা রূম ঃ ৪৭)

খ. রসূলের নেতৃত্ব ঃ এ আন্দোলনের নেতা ছিলেন স্বয়ং আল্লাহর রসূল। তিনি তো সেই মহান নেতা, যার নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ দাতা স্বয়ং আল্লাহ। তিনি তাঁর অনুগ্রহ, অহী, আল কুরআন ও পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে তাঁকে নেতৃত্বের প্রশিক্ষণ দান করেন। মূলত অহী, তথা কুরআন ও সুন্নাহই হচ্ছে ইসলামী নেতৃত্বের গাইড। তার সবচাইতে বড় পাথেয় ছিলো আল্লাহর অনুগ্রহ ওয়া কা-না ফাদলুল্লাহি আলাইকা আযীমা–তোমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ বিরাট।

গ. সার্বজনীন দাওয়াত ঃ এ আন্দোলনের সম্মুখে ছিলো গোটা পৃথিবী। সমগ্র মানব জাতির প্রতি ছিলো তার আহ্বান। গোটা মানব জাতিকে সে আল্লাহর দাসত্ব ও রসূলের নেতৃত্বের প্রতি আহ্বান জানায়। তার এ আহ্বান কোনো বংশ, গোত্র, জাতি, দেশ ও সম্প্রদায়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিলো না। তা ছিলো বিশ্বময়, সার্বজনীন ঃ

"আমি তোমাকে সমগ্র মানুষের কাছে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে পাঠিয়েছি।"–(সূরা সাবা ঃ ২৮)

ঘ. জ্ঞান, ধ্যান-ধারণা ও মানসিকতার বিপ্লব ঃ এ আন্দোলন মানুষকে মূর্খতা থেকে জ্ঞানের দিকে, অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসে। এখানে জ্ঞানার্জান অবশ্য কর্তব্য। এর সূচনা হয়েছে–ইকরা (পড়ো) দিয়ে। আর প্রকৃত জ্ঞান হচ্ছে অহীর জ্ঞান। এ জ্ঞান মানুষের ধ্যান-ধারণার বিপ্লব সৃষ্টি করে ; তাওহীদ, রিসালাত ও আখিরাত ভিত্তিক এক শাশ্বত আকীদা বিশ্বাসের উপর নেতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে দেয়।

ঙ. সংগঠন ও শৃংখলা ঃ রসূলুল্লাহর (সা) আন্দোলন ছিলো খুবই সুশৃংখল, সুসংহত ও সুসংগঠিত। তিনি ছিলেন সংগঠনের নেতা। সাহাবায়ে কিরাম ছিলেন কর্মী বাহিনী। নেতার আনুগত্য ছিলো ফরয। সাংগঠনিক শৃংখলা ভংগ করা ছিলো শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

"তোমরা আনুগত্য করো আল্লাহর, রসূলের এবং তোমাদের দায়িত্বশীলদের।"–(সূরা আন নিসা ঃ ৫৯)

চ. পূর্ণাংগতা ঃ এ আন্দোলনের দাওয়াত ছিলো মানব জীবনের প্রতিটি দিক ও বিভাগে পরিব্যাপ্ত। এ আন্দোলন যে জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায়, তা গোটা মানব জীবনকে তার অধীনে সমন্বিত করে দেয়। ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে পূর্ণাংগ বিপ্লব সাধনই এ আন্দোলনের লক্ষ্য।

ছ. দীন ও দুনিয়ার সমন্বয় ঃ এ আন্দোলন মানুষের দীন ও দুনিয়ার কাজকে এক করে দিয়েছে। সে দুনিয়ার সমস্ত কাজকে দীনি বিধানের ভিত্তিতে

পরিচালিত করতে চায়। এভাবে দুনিয়ার সমস্ত কাজই দীনি কাজে পরিণত হয়ে যায়। মূলত এ সমন্বয় ছাড়া মানব জীবনে পূর্ণাংগতা আসতে পারে না।

জ. তাকওয়া ভিত্তিক পজিশন ঃ রসূলুল্লাহর আন্দোলনে আল্লাহ ভীতি তথা তাকওয়া এবং আল্লাহর প্রতি আনুগত্যই ছিলো যোগ্যতার মাপকাঠি। এদিক থেকে যিনি যতোটা অগ্রসর, আন্দোলনে তিনি ততোটা মর্যাদাসম্পন্ন। "তোমাদের অধিক তাকওয়া সম্পন্ন ব্যক্তি আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদাবান।"

ঝ. নেতৃত্বের প্রতি লোভহীনতা ঃ এখানে নেতৃত্ব এমন এক দায়িত্ব যার জন্যে আল্লাহর নিকট জবাবদিহি করতে হবে। এ জবাব দিহির ভয় লোকদেরকে নেতৃত্বের প্রতি লোভহীন করে গড়ে তোলে। নেতৃত্ব লোভীকে এ আন্দোলনে কোনো পদ দেয়া হয় না। রসূল (স) বলেছেন ঃ 'নেতৃত্ব প্রার্থীদের জন্যে কোনো পদ এখানে নেই।'

ঞ. ভ্রাতৃত্বের পরিবেশ ঃ এ আন্দোলনের কর্মীরা তাদের একই আকীদা বিশ্বাসের ফলে পরস্পরের ভাই হয়ে যায়। এ ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি হলো ঈমান আর এর বৈশিষ্ট্য হলো পরস্পরের প্রতি দয়াময়তা (রুহমা-উ বাইনাহুম)।

ট. চারিত্রিক বিপ্লব ঃ এ আন্দোলনে মানুষের মধ্যে চিন্তার বিপ্লবের সাথে সাথে চরিত্রের বিপ্লবও সৃষ্টি করে দেয়। আরবের বর্বর জিঘাংসু নিষ্ঠুর মানুষগুলোকে এ আন্দোলন সোনার মানুষ তৈরি করে রেখে দিয়েছিলো।

ঠ. সমাজ বিপ্লব ও আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও সামাজিক সুবিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সমাজ বিপ্লব সাধিত করা ছিলো এ আন্দোলনের উদ্দেশ্য।

৩২. সহকর্মীদের প্রতি সহমর্মিতা

নেতা হিসেবে নবী (সা) তার সহকর্মীদের সাথে কিরূপ আচরণ করতেন? কেমন ছিলেন তিনি আপন সহকর্মীদের প্রতি ? কুরআন বলে তাদের প্রতি তিনি ছিলেন ঃ

১. রাউফুর রাহীম (দয়ার সাগর)।-(সূরা তাওবা ঃ ১২৮)

২. তাদের অসুবিধায় তিনি হতেন চরম মর্মাহত। (ঐ)

৩. তাদের সুখ ও কল্যাণের পরম লোভী ছিলেন তিনি।(ঐ)

৪. তাদের প্রতি ছিলেন তিনি পরম অমায়িক। (আলে ইমরান ঃ ১৫৯)

৫. তাদের দান করতেন যথার্থ মর্যাদা আর ভালোবাসতেন গভীরভাবে। (আল কাহাফ ঃ ১২, আনফাল ঃ ৬২-৬৪, শোয়ারা ঃ ২১৫)

৬. তাদের সাথে তিনি কখনো গর্ব-অহংকার করতেন না, তিনি ছিলেন অত্যন্ত বিনয়ী আদর্শ মানুষ।

৭. নবী হওয়া সত্ত্বেও তিনি সাথিদের সাথে পরামর্শ করে কাজ করতেন।

৮. তিনি তার নিজের প্রতি কৃত সকলের সকল অপরাধ ক্ষমা করে দিতেন।

৯. তিনি প্রত্যেক সহকর্মীর সাথে তার সামর্থ ও যোগ্যতা অনুযায়ী আচরণ করতেন।

১০. তাদের শিক্ষাদান ও পরিশুদ্ধ করণে তিনি পূর্ণ দায়িত্ব পালন করেন।

১১. তিনি তাদের দোষ ত্রুটি ধরে দিতেন এবং সব সময় উপদেশ দিতেন।

১২. তিনি তাদের এমন কল্যাণকাংখী ছিলেন যে, তারা প্রত্যেকেই তাঁর সাথে একান্ত নৈকট্যের সম্পর্ক অনুভব করতেন।

পৃথিবীর ইতিহাসে কোনো নেতার সহকর্মীদেরকে তার প্রতি এতোটা ভক্ত অনুরক্ত দেখা যায়নি, যতোটা দেখা গিয়েছে মুহাম্মদ (স)-এর প্রতি তাঁর সহকর্মীদের। আর এটা ছিলো তাদের প্রতি তাঁর ঐকান্তিক আচরণেরই ফল।

ইসলামী ব্যবস্থায় মুহাম্মদ (সা)-এর নেতৃত্বের অনুগামী হওয়া অপরিহার্য। নেতৃত্বের মডেল বা নমুনা হিসেবে তাঁকেই মেনে নিতে হবে। তাঁর নেতৃত্বের শ্রেষ্ঠ ও অবিসংবাদিত। কুরআন এবং মুসলিম উম্মাহই কেবল তাঁর শ্রেষ্ঠ নেতৃত্বের স্বীকৃতি দেয়নি, দিয়েছে অমুসলিম মনীষীরাও। কেবল মাইকেল হার্টের কথাই বলতে চাই, যিনি বিশ্বের সর্বকালের সবচাইতে প্রভাবশালী একশত সেরা মনীষীর জীবনী লিখেছেন। এ তালিকায় তিনিও মুহাম্মদ (সা)-এর স্থানই এক নম্বরে দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন ঃ

> "মুহাম্মদ (সা)-এর সাফল্যের মধ্যে জাগতিক ও ধর্মীয় উভয় বিধ প্রভাবের এক অতুলনীয় সংমিশ্রণ ঘটেছে। এজন্যে সংগতভাবেই তাঁকে ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব হিসেবে চিহ্নিত করা যায়।"–(দ্যা হাণ্ড্রেড)

ব্যাস্, এখানেই আমরা শেষ করতে চাই। বিশ্বনবী (সা)-এর চরিত্র ও গুণ বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আমরা একটি সীমিত সারাংশই এখানে উল্লেখ করলাম। এ বর্ণনাগুলো কি তাঁর মহোত্তম চরিত্রের ছবি আঁকে না ? আর এ ছবি থেকেই কি বিশ্বনবী (সা)-কে সর্বগুণে সুন্দরতম মহাপুরুষ হিসেবে চেনা যায় না ? অবশ্যি তিনি সর্বগুণের সর্বাপেক্ষা অধিকারী সুন্দরতম মহাপুরুষ !!

সুতরাং কোনো মুসলিম যদি নিজেকে প্রিয় ব্যক্তিত্ব ও প্রিয় নেতৃত্বের আসনে সমাসীন করতে চান, তবে তাকে মানব ইতিহাসের সর্বোত্তম ব্যক্তিত্ব ও সর্বশ্রেষ্ঠ নেতৃত্ব মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা)-কেই সর্বাংগীন অনুসরণ করা উচিত।

সমাপ্ত

গ্রন্থসূত্র

১. আল কুরআন।

২. The Holy Quran : Translation & Commentary by A. Yusuf Ali.

৩. The Noble Quran : Translation & Commentary by Dr. Mohammad Taqiuddin Helali and Dr. Mohammad Mohsin Khan.

৪. কুরআনুল করীম ঃ ইসলামিক ফাউণ্ডেশন কর্তৃক অনূদিত।

৫. তরজমায়ে কুরআন মজীদ ঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী।

৬. সিহাহ সিত্তার হাদীস গ্রন্থাবলী।

৭. শামায়েলে তিরমিযি।

৮. মিশকাত শরীফ (হাদীস সংকলন)।

৯. অশোক মুখোপাধ্যায় ঃ সমার্থ শব্দকোষ।

১০. বাংলা কি লিখবেন, কেন লিখবেন ঃ আনন্দ বাজার পত্রিকা ব্যবহার বিধি, কোলকাতা।

১১. জামিল চৌধুরী ঃ বাংলা একাডেমী বাংলা বানান অভিধান।

১২. হিশাম আল তালিব ঃ দলিল আল তাদরীব আল কিয়াদী।

১৩. ইউসুফ ইসলাহী ঃ আদাবে যিন্দেগী।

১৪. ইমাম ইবনে কুদামা ঃ মিনহাজুল কাসেদীন।

১৫. Krishna Mohan & Meera Banerji : Developing Communication Skills.

১৬. শাইখ আলী হাজভীরী (দাতা গাঞ্জবখ্শ) ঃ কাশফুল মাহজুব

১৭. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ঃ ইসলামী আন্দোলনের নৈতিক ভিত্তি।

১৮. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ঃ ইসলামী আন্দোলন সাফল্যের শর্তাবলী।

১৯. সাইয়েদ কুতুব ঃ ইসলামী সমাজ বিপ্লবের ধারা।

২০. খলীল আহমদ হামিদী ঃ হাসানুল বান্না কী ডাইরি

২১. খুররম মুরাদ ঃ কর্মীদের পারস্পরিক সম্পর্ক।

২২. ড. শ্যাম সুন্দর কর্মকার ঃ সাংগঠনিক আচরণ, ঢাকা।

২৩. ইকবাল আহমদ ঃ সাংগঠনিক আচরণ ; বাংলা একাডেমী, ঢাকা।

২৪. আবদুস শহীদ নাসিম ঃ বাংলাদেশে রসূলুল্লাহর আদর্শ অনুকরণের অংগীকার।

২৫. নঈম সিদ্দীকি ঃ মুহসিনে ইনসানিয়াত।

২৬. শিবলী নুমানী ঃ সীরাতুন্নবী।

২৭. Michel Hurt : The Hundred.

২৮. জালালুদ্দীন সুয়ূতী ঃ খাসায়েসুল কুবরা।

২৯. মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান ঃ বাংলা কবিতার ছন্দ।

৩০. বুদ্ধ দেব বসু ঃ সাহিত্য চর্চা।
৩১. বুদ্ধ দেব বসু ঃ কালের পুতুল।
৩২. শ্রীশ চন্দ্র দাস ঃ সাহিত্য সন্দর্শন।
৩৩. জলীল আহসান নদভী ঃ যাদে রাহ
৩৪. Stephen W. Hawking : A Brief History of Time.
৩৫. মোঃ আবদুল কাদের মিয়া ঃ আধুনিক প্রশাসন ব্যবস্থা।
৩৬. খুররম মুরাদ ঃ ইসলামী কিয়াদত।
৩৭. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ঃ তাহরীক আওর কারকুন।
৩৮. সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ঃ ইসলামী অর্থনীতি।
৩৯. মোহাম্মদ আবদুল আজীজ ঃ উন্নয়ন প্রশাসন ও প্রশিক্ষণ।
৪০. সাইয়েদ হামেদ আলী ঃ ইসলাম অপ্সে কেয়া চাহ্তা হায় ?
৪১. ইউসুফ আল কারদভী ঃ হালাল ও হারাম।
৪২. ডেল কার্নেগি ঃ অমনিবাস।
৪৩. Dr. Ismail Al Farooquee : Islamization of Knowledge.
৪৪. আবু শাইখ ইসপাহানি ঃ আখলাকুন নবী
৪৫. ভবেশ রায় ঃ জ্ঞানকোষ
৪৬. আবদুস শহীদ নাসিম ঃ ইসলামের পারিবারিক জীবন
৪৭. আবদুস শহীদ নাসিম ঃ শিক্ষা সাহিত্য সংস্কৃতি
৪৮. গোলাম মুস্তফা ঃ বিশ্বনবী
৪৯. আল্লামা হাফিয ইবনুল কায়্যিম ঃ যাদুল মা'আদ
৫০. ড. হাসান জামান ঃ সমাজ সংস্কৃতি সাহিত্য